১১

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

একাদশ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

একাদশ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

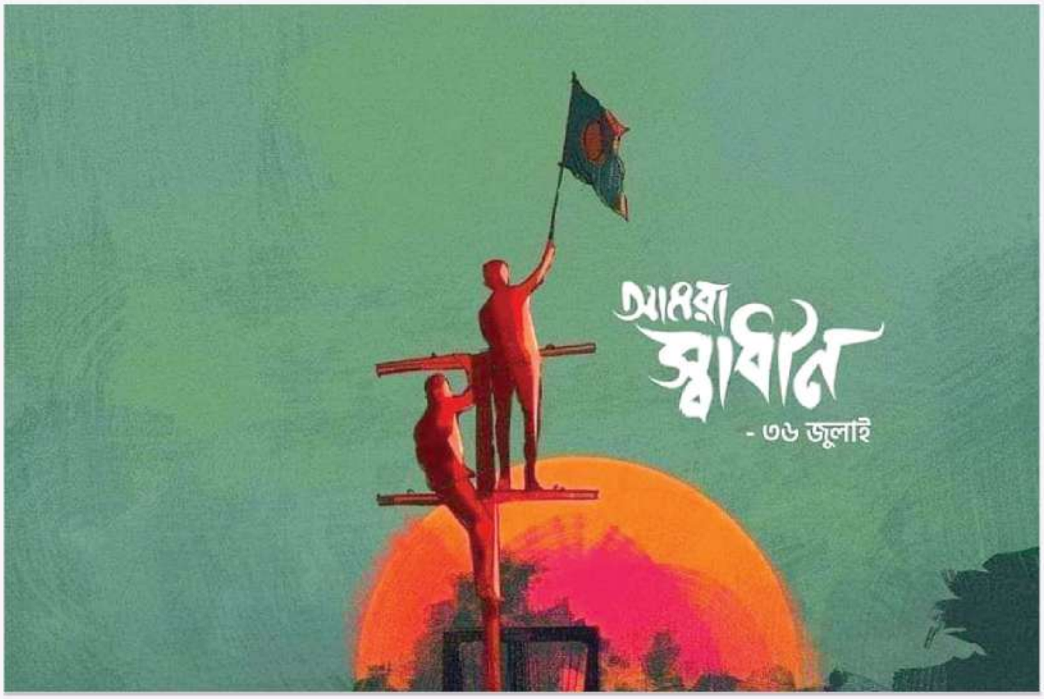
আমরা
স্বাধীন
- ৩৬ জুলাই

৯
দফা
রোমান-
বিপ্লব...
কথা
তাহলে কথা

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবর্তীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	১১তম খন্ড	
৭১৮	শহীদ আল আমিন হোসাইন	০৭-১০
৭১৯	শহীদ মো: শহিদ হোসেন	১১-১৪
৭২০	শহীদ এস এম শরফুদ্দিন	১৫-২০
৭২১	শহীদ মো: শফিকুল ইসলাম	২১-২৩
৭২২	শহীদ আবদুল্লাহ আল রোমান	২৪-২৮
৭২৩	শহীদ মো: বাবুল	২৯-৩১
৭২৪	শহীদ মো: আল আমিন ইসলাম (সেলিম)	৩২-৩৫
৭২৫	শহীদ মো: জালাল উদ্দিন	৩৬-৩৮
৭২৬	শহীদ মো: শেখ রাকিব	৩৯-৪৪
৭২৭	শহীদ মো: বাবুল মিয়া	৪৫- ৫১
৭২৮	শহীদ মো: রাসেল	৫২-৫৬
৭২৯	শহীদ মো: মোস্তফা জামান সমুদ্র	৫৭-৫৯
৭৩০	শহীদ মো: তাহমীদ আবদুল্লাহ অয়ন	৬০-৬৪
৭৩১	শহীদ মো: ইসমাইল	৬৫-৬৭
৭৩২	শহীদ মো: শাকিল	৬৮- ৭২
৭৩৩	শহীদ মো: আবদুল্লাহ আল আবীর	৭৩-৭৫
৭৩৪	শহীদ মো: সোহেল	৭৬- ৮০
৭৩৫	শহীদ মো: ওয়াসিম আহমদ	৮১-৮৩
৭৩৬	শহীদ মো: জসিম ফকির	৮৪-৮৭
৭৩৭	শহীদ মো: শাহজাহান মিয়া	৮৮-৯২
৭৩৮	শহীদ মো: তানজির খান মুন্না	৯৩-৯৬
৭৩৯	শহীদ মো: আবদুল্লাহ ইবনে শহীদ	৯৭-১০০
৭৪০	শহীদ মো: হৃদয় আহমেদ শিহাব	১০১-১০৬

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৭৪১	শহীদ মো: নয়ন মিয়া	১০৭-১১০
৭৪২	শহীদ মো: শাহীনূর আলম	১১১-১১৪
৭৪৩	শহীদ মো: আকরাম খান রাব্বি	১১৫-১১৮
৭৪৪	শহীদ মো: মজিদ হোসেন	১১৯-১২২
৭৪৫	শহীদ শেখ মো: শফিকুল ইসলাম (শামিম)	১২৩-১২৬
৭৪৬	শহীদ মো: সানজিদ হোসেন মৃধা	১২৭-১৩১
৭৪৭	শহীদ মেহেরুন্নেসা তানহা	১৩২-১৩৫
৭৪৮	শহীদ মো: কবিরুল ইসলাম	১৩৬-১৩৯
৭৪৯	শহীদ মো: ইয়াকুব আলী	১৪০-১৪৪
৭৫০	শহীদ মো: কারিমুল ইসলাম	১৪৫-১৪৯
৭৫১	শহীদ আবদুল্লাহ বিন জিহাদ	১৫০-১৫২
৭৫২	শহীদ মো: আকাশ	১৫৩-১৬২
৭৫৩	শহীদ মো: শুভ	১৬৩-১৬৫
৭৫৪	শহীদ মো: আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী	১৬৬-১৭২
৭৫৫	শহীদ গঙ্গা চরন রাজবংশী	১৭৩-১৭৮
৭৫৬	শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম	১৭৯-১৮২
৭৫৭	শহীদ মো: কালাম	১৮৩-১৮৯
৭৫৮	শহীদ মো: সিফাত হোসেন	১৯০-১৯৫
৭৫৯	শহীদ মো: রাব্বি মাতব্বর (গোলাম রাব্বি)	১৯৬-২০০
৭৬০	শহীদ মো: মাহবুবুর রহমান সোহেল	২০১-২০৫
৭৬১	শহীদ মো: আমির হোসেন	২০৬-২০৯
৭৬২	শহীদ মো: আলী হোসেন	২১০-২১৫

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১৪৪
সিলেট বিভাগ ৩৪
ঢাকা বিভাগ ১৬১
রাজশাহী বিভাগ ৫৫
বরিশাল বিভাগ ৮৭
খুলনা বিভাগ ৬৫
চট্টগ্রাম বিভাগ ১১৭
রংপুর বিভাগ ৫৫
ময়মনসিংহ বিভাগ ৮২
মোট : ৮০০
০৫
পঞ্চগড়
০৪
ঠাকুরগাও
০৪
নিলফামারী
১০
লালমনিরহাট
০৪
কুড়িগ্রাম
০৯
দিনাজপুর
১৭
রংপুর
রংপুর
৫৫
গাইবান্ধা
০৪
জয়পুরহাট
০৭
নওগাঁ
১৫
বগুড়া
০১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী
৫৫
০২
রাজশাহী
০৮
নাটোর
১০
সিরাজগঞ্জ
০৭
পাবনা
১৮
শেরপুর
১৬
জামালপুর
৮২
ময়মনসিংহ
১২
নেত্রকোনা
৩৫
ময়মনসিংহ
০১
সুনামগঞ্জ
১৫
সিলেট
সিলেট
৩৪
০১
মৌলভীবাজার
১৬
হবিগঞ্জ
১০
কিশোরগঞ্জ
১১
টাঙ্গাইল
২৫
গাজীপুর
১৬১
ঢাকা
১৯
নরসিংদী
৩১
ঢাকা
জেলা
০৩
মানিকগঞ্জ
০১
রাজবাড়ী
১৪৪
ঢাকা
সিটি
২১
নারায়ণগঞ্জ
০৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১২
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২
চুয়াডাঙ্গা
০২
ঝিনাইদহ
০৮
মাগুরা
০৭
ফরিদপুর
১০
মুন্সিগঞ্জ
৩০
কুমিল্লা
০১
খাগড়াছড়ি
২০
চাঁদপুর
০৬
শরীয়তপুর
১১
মাদারীপুর
২৬
যশোর
নড়াইল
০৫
গোপালগঞ্জ
০৮
লক্ষীপুর
১২
ফেনী
২৩
বরিশাল
২৩
নোয়াখালী
রাঙ্গামাটি
খুলনা
৬৫
০৪
সাতক্ষীরা
০৬
খুলনা
০৪
পিরোজপুর
বরিশাল
৮৭
০৫
ঝালকাঠি
২৫
ভোলা
০৪
বাগেরহাট
২২
পটুয়াখালী
০৮
বরগুনা
১৩
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম
১১৭
বান্দরবন
কক্সবাজার

শহীদ আল আমিন হোসাইন

ক্রমিক : ৭১৮

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৬১

শহীদ পরিচিতি

আল আমিন হোসাইনের বাড়ি যশোরের চৌগাছা উপজেলার আফরা গ্রামে। আল আমিন হোসাইন যশোরের সন্তান হলেও কাজ করতেন সেলসম্যান হিসেবে রেনাটা কোম্পানীতে। তার কর্মস্থল ছিল বরগুনা জেলার আমতলী। তার বাবার নাম আনোয়ার হোসেন। তিনি কৃষিকাজ করেন। মা আশুরা বেগম গৃহিনী। আল আমিন যশোর এম এম কলেজে মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচারী সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে একে একে সমস্ত বিরোধী দল ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করতে থাকে। শুরুতে ভারতের সহায়তায় পিলখানায় হত্যাকান্ড ঘটিয়ে ৭৬ জন সেনা অফিসারসহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। সাবেক দূর্নীতিবাজ স্বৈরাচারী সরকার শেখ মুজিব ও তার হিংস্র রক্ষী বাহিনীকে যারা দমন করেছিল সেইসব বিপ্লবী সেনাদের মধ্য থেকে ৫ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। বিরোধীদল বিএনপিকে মামলা-হামলার ভয় দেখিয়ে এবং অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়ে নিষ্ক্রীয় করে ফেলে। বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে আটক করে এবং তার বড় সন্তানকে পিটিয়ে আহত করে। তিনি বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন। খালেদার অপর সন্তান আওয়ামী নির্যাতনের ফলে স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে শেখ হাসিনার অবৈধ কাজের শক্ত প্রতিবাদ করতে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি অক্ষম হয়ে পড়ে। হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে ভারতীয় হাইকমিশনারের মাধ্যমে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। এরশাদের দলকে ধীরে ধীরে স্বৈরাচার সরকার পোষা বিরোধী দল বানিয়ে ফেলে। দেশবাসী এ দলটিকে হাসিনা সরকারের দোসর হিসেবে ঘৃণা করা শুরু করে দেয়। আওয়ামীলীগ এবং তার প্রশ্রয়দাতা ভারত বুঝতে পেরেছিল এদেশের সম্পদ লুন্ঠনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় এই দলের উপরে নির্মম নির্যাতন। জেল, গুম, খুন, ক্রসফায়ার, ধর্ষণ, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়াসহ এমন কোন নির্যাতন ছিলোনা যা এই দলের নেতা-কর্মীদের উপরে চালানো হয়নি! মিথ্যা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে জামায়াত নেতাদের ৫ জনকে একের পর এক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এসব নেতাদের প্রাণভিক্ষা চাইতে বলা হয়েছিল। শেখ হাসিনা প্রস্তাব দিয়েছিল, প্রাণ ভিক্ষা চাইলে হয়তো ক্ষমা করে দেয়া যেতে পারে! জামায়াত নেতারা জালিমের কাছে আনুগত্য স্বীকার না করে শাহাদাতকে বেছে নেন।

২০০৯ সালে সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমদের সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসার পরে আওয়ামী মদ্যপ-লম্পট উপদেষ্টারা স্বপ্ন দেখাতো অমুক অমুক সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা ভারতকে প্রদান করলে বাংলাদেশ চার বছরের মধ্যে কানাডা-সিংগাপুরকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু ৫ বছরের মধ্যে জনতা তাদের জমাকৃত সম্পদ ও দেশের সম্পদ হারাতে দেখে বুঝতে পারে দেশটা রাক্ষসের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগ স্বাভাবিক নির্বাচনে আবার ক্ষমতায় আসতে পারবেনা বুঝতে পেরে ২০১৪ সালে রাতের ভোটের নির্বাচনের আয়োজন করে। ভোটাররা কেন্দ্রে গিয়ে দেখে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গিয়েছে। প্রতিবাদকারীদের জেল-জুলুম, গুম-খুনের মাধ্যমে এক পর্যায়ে দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হতে হয়। আলেম সমাজ উপলব্ধি করেন সর্বত্র ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনঠাসা করে ফেলা হচ্ছে। লম্পট ও নাস্তিকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হচ্ছে। এসময় সরকারী প্রশ্রয়ে নবী (স) কে অপমান করে লেখালেখির কারণে শুরু হয় হেফাজতে ইসলামের ইসলাম রক্ষার আন্দোলন। ২০১৪ সালে হেফাজতে ইসলামীর সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর পাশে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির সমর্থন দিয়ে এগিয়ে আসে। হেফাজত কর্মীরা সরকারকে দাবী মানাতে ঢাকার শাপলা চত্বরে অবস্থান নেয়। তাদের দাবী ছিল নাস্তিক লেখকদের বিচার করা হোক। শেখ হাসিনা দাবী না মেনে গণহত্যার নির্দেশ দেয়। রাতভর চলে হেফাজত কর্মীদের গুলি চালিয়ে হত্যা। শতাধিক নিহত হয়। গণহত্যার সংবাদ প্রচার করায় দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দেয় সরকার। বন্ধ করে দেয়া হয় অসংখ্য নিউজ মিডিয়া। সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা আওয়ামী লীগের চাটুকারিতা করা শুরু করে দেয়। ইসলাম ও ইসলাম পন্থীদের নির্মূলে তারা আওয়ামী সহযোগী হয়ে ওঠে। ২০১৮ সালে আবারো পাতানো নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনা। এমনকি ২০২৪ সালেও। ছাত্র-জনতা অপেক্ষায় ছিল পরিবর্তনের। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনটি দমন করতে শেখ হাসিনা অতীতের মতো

গনহত্যার নির্দেশ প্রদান করে। ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে। তাদের ইচ্ছা ছিল সাধারণ ছাত্র-জনতাকে রাজপথে জামায়াত-শিবির অভিযোগ তুলে নির্মমভাবে খুন করবে। জুলাই মাস জুড়ে সরকারী বাহিনীর হাতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ এবং শত শত মানুষ নিহত হলেও আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ। ছাত্র-জনতা আক্রমনাত্মক হয়ে উঠেনি। ১ আগস্টে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ হওয়ায় গণহত্যার কথা জেনে যায় মানুষ। ৪ আগস্ট দেশব্যাপী প্রতিরোধ শুরু হয়। এই প্রতিরোধের ফলে পরদিন ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা তার অপর দূর্নীতিবাজ ছোটবোন শেখ রেহানাকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার আগে তার খুনি বিভিন্ন বাহিনী যেমন- পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, বিজিবি প্রভৃতিকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যায়। একারণে ৫ আগস্ট হাসিনার পলায়নে সারাদেশে ছাত্র-জনতা খুশিতে বিজয় মিছিলে বেরিয়ে এলে স্বৈরাচারী সরকারকে যারা ১৫ বছর টিকিয়ে রেখেছিল সেসব খুনি বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। রক্তাক্ত হয় রাজপথ। খুন হয় জনতার একাংশ। আহত জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা বিভিন্ন জেলায় খুনি হাসিনার সন্ত্রাসী ও চাটুকারদের আস্তানায় হামলা চালায়। এসব অফিস থেকে গত ১৬ বছর ধরে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করা হতো। বিরোধীদের ধরে এনে নির্মমভাবে পেটানো হতো। ছাত্র-জনতা আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন অফিসে আগুন দেয়। বরগুনা জেলার আমতলী পৌরসভার আওয়ামীলীগ মনোনিত মেয়র মতিয়ার রহমানের বাসায়ও আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। তার ভবনে ভাড়া থাকতেন রেনাটা কোম্পানীতে সেলসম্যান হিসেবে কর্মরত আল আমিন হোসাইন। মূলত আওয়ামী লীগের শাসনের সময় ছাত্র ও ব্যাচেলরদের ম্যাসে আওয়ামী পুলিশ রাত-বিরাতে হামলা চালাতো। মুখে সামান্য দাড়ি থাকলে কিংবা ইসলামী লেবাসের কাউকে পেলে আটক করতো। একারণে অনেক সাধারণ ছাত্র আওয়ামীলীগ নেতাদের ভবনে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদবোধ করতো। আল আমিন হোসাইনও সম্ভবত নিরাপত্তার কারনে এই ভবনে ভাড়া থাকতেন।

ঘটনা সম্পর্কে তার ছোট ভাই মো. রাসেল হোসেন জানান, গত ৫ আগস্ট কাজ শেষে তিনি সেখানকার বাসার দ্বিতীয় তলায় ঘুমিয়ে ছিলেন। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে আন্দোলনকারীরা বাসার নিচতলায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্বিতীয় তলায়। ঘুমিয়ে থাকা আল আমিনসহ তার কয়েকজন সহকর্মীর শরীরেও আগুন লেগে যায়। তখন তারা শরীরে আগুন নিয়েই ২য় তলা থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়েন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে নিয়ে যান। পরদিন ৬ আগস্ট তাকে ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। শরীরের ৩৬ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে শুক্রবার ১৬ আগস্ট ভোর সাড়ে ৫টায় আইসিইউতে তিনি মারা যান। ১৭ আগস্ট চন্দরপুর পারিবারিক কবরস্থানে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

পত্রিকার নিউজ লিংক :

https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/quota-protest/news-606111

অর্থনৈতিক অবস্থা

নিহতের বাবা জনাব আনোয়ার হোসেন বাবু কৃষিকাজ করেন। আল আমিনের ছোট ভাই রাসেল একটি দোকানে সময় দেন। তাদের ৪ শতাংশ জমি আছে।

The Daily Star বাংলা

আন্তর্জাতিক মতামত স্বাস্থ্য খেলা বাণিজ্য বিনোদন জীবনযাপন সাহিত্য শিক্ষা প্রযুক্তি

ছাত্র আন্দোলনে আহত আরও ৪ জনের মৃত্যু

স্টার ফাইল ফটো

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংঘাত-সহিসংতায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক আইনজীবীসহ আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

টিস্যুতে সুরক্ষায় শাইন টিস্যু হোল্ডার Shine

নিহতরা হলেন—কুমিল্লা সদর উপজেলার আইনজীবী আবুল কালাম (৫৫), চুয়াডাঙ্গার রাজমিস্ত্রী উজ্জল হোসেন (৩০), নোয়াখালীর দোকান কর্মচারী আসিফ (২৬) ও বরগুনার ওষুধ কোম্পানির বিক্রয়কর্মী আল আমিন হোসেন (২৭)।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: আল আমিন হোসাইন (২৭)
পেশা	: কর্মচারী (রেনাটা কোম্পানী), মাস্টার্সের ছাত্র, যশোর এম এম কলেজ
পিতা	: আনোয়ার হোসাইন
মাতা	: আশুরা বেগম
পরিবারের তথ্য	: ভাই-১ রাসেল (২৫) মুদি দোকানদার, ভাই-২ ফয়েজ (১৩) ৬ষ্ঠ শ্রেণি
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: আফরা (চন্দরপুর), ডাকঘর: সলুয়া বাজার, থানা: চৌগাছা, জেলা: যশোর
ঘটনার স্থান	: আমতলী পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমানের বাসা, বরগুনা
আক্রমণকারী	: বিক্ষুব্ধ জনতা
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, বিকাল ৩ টা
আঘাতের ধরন	: আগুনে পড়ে যাওয়া
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: শেখ হাসিনা বার্ন হাসপাতাল, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চন্দরপুর কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

২. ছোট ভাইকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা

শহীদ মোঃ শহীদ হোসেন

ক্রমিক ৭১৯

আইডি ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭৭

শহীদ পরিচিতি

মোঃ শহীদ হোসেনের বাড়ি জামালপুর জেলায়। তার বাবার নাম আব্দুর রহমান এবং মায়ের নাম সুন্দরী বেগম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে গত ২৭ জুলাই ঢাকার উত্তরা এয়ারপোর্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

কোটাপ্রথা নিয়ে এবারের আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় দফা আন্দোলন। মূল আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে আন্দোলন থেমে গিয়েছিল। পরে কয়েক বছর বিরতির পরে আদালতের এক রায়ের পরে দ্বিতীয় দফা আন্দোলন শুরু হয় গত জুন ২০২৪ থেকে। এরপর তা খুব শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভা থেকে ছাত্রলীগের নির্মম হামলার কারণে ক্রমান্বয়ে সহিংস রূপ নেয়। এ অবস্থায় আন্দোলনকারীদের দমাতে সরকার সব ধরনের ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয় ১৭ জুলাই। ফলে বন্ধ থাকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অনলাইনের সকল কার্যক্রম। ১৮ জুলাই ছাত্রদের শান্তি পূর্ণ কোটা বিরোধী সমাবেশে ছাত্রলীগ ও পুলিশ, অতর্কিত আক্রমণ করে। ফলে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আহত ও নিহত হয়। প্রতিবাদে পরদিন আবার ১৯ জুলাই জুমার নামাজের পরে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র-জনতা রাজপথে অবস্থান নেয়। স্কুল-কলেজের ড্রেস পরে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকেরাও রাজপথে নেমে আসে। সবাই ভেবেছিল শেখ হাসিনা জনদরদী। তিনি বিষয়টি সহজভাবে সমাধান করবেন। কিন্তু তিনি রাজাকারের নাতি বলে কটাক্ষ করলেন। ১৮ জুলাই স্বৈরাচারি সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী আগের দিনের চেয়েও অত্যন্ত নির্মমভাবে লাঠিচার্জ, টিয়ারসেল নিক্ষেপ, ছররা গুলি, হ্যান্ডগ্রেনেড, হেলিকপ্টার থেকে গুলি ও উঁচু ভবন থেকে স্নাইপার রাইফেলের মাধ্যমে ঝাপিয়ে পড়ে। ঢাকার উত্তরা, মিরপুর, বাড্ডা-রামপুরা, যাত্রাবাড়ি, সাভার ছিল যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, মাদারিপুর, ফেনী, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, রংপুরসহ সর্বত্র ছাত্র-জনতা গুলিবিদ্ধ হয় বিপুলভাবে। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেসব অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার করা হয় তার সবই সরকারি দলীয় বাহিনী অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করে। ট্যাংক নিয়ে রাজপথ দখলে নেয় পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব। আওয়ামীলীগ

প্রত্যেক হাসপাতালে নির্দেশ দিল, গুলিতে আহত কোন ছাত্রকে চিকিৎসা দেয়া যাবেনা। গুলিতে নিহত হলে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হাসপাতাল গুলো নিজেদের রক্ষার স্বার্থে প্রকাশ্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া থেকে বিরত থাকে। অনেক হাসপাতালে ছাত্রদের বলপ্রয়োগ করে চিকিৎসা সেবা দিতে বাধ্য করাতে হয়।

এর আগে দেশপ্রেমিক ছাত্ররা কোটার বিষয়টি নিস্পত্তি করতে অনুরোধ জানানোয় খুনি হাসিনা তাদেরকে দম্ভ করে রাজাকার বলে কটাক্ষ করেছিল। এর প্রেক্ষিতে তাৎক্ষনিক ছাত্ররা মিছিল বের করেছিল। তারা স্লোগান দিল- **'তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার'** সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে চলে তীব্র প্রতিবাদ। শেখ হাসিনার চাটুকার ও প্রকৃত রাজাকারের নাতি বিকৃত লেখক জাফর ইকবাল ছাত্রদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। একারণে পরদিন থেকে সকল প্রকাশনী ধীরে ধীরে তার লেখা না ছাপানোর পক্ষে বিবৃতি দিতে থাকে।

মূলত রাজাকার শব্দটি ১৬ বছরের অবৈধ শাসনে আওয়ামী লিগের অন্যতম অস্ত্র ছিলো। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ কারী দেশপ্রেমিক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে এমন শব্দ দিয়ে অপবাধ দিতো এবং নির্মম নির্যাতন চালাতো। হাসিনার সাথে আপোষ না করায় তাদের অনেক নেতাকর্মীকে গুম, খুন, জেলে নিক্ষেপ করা সহ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিলো। এই শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে প্রতিবাদীদের নির্যাতন করে যেতো। অনেক তরুণের স্বপ্ন **'রাজাকার'** অভিযোগ তুলে নষ্ট করে দিত আওয়ামীলীগ। শহীদ

হোসেন ছিলেন একজন প্রতিবাদী যুবক। তার স্বপ্ন ছিলো দেশের সেবা করা। তার দুঃখী মায়ের মুখে হাসি ফোঁটানো। শহীদ বুঝতে পেরেছিলেন এ সরকার অবৈধ কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে অদক্ষ, চাটুকার, দলীয় কর্মীদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দিয়ে তার মতো সাধারণ ছাত্রকে বঞ্চিত করবে। শহীদ হোসেন চাইলে ছাত্রলীগের বাহিনীতে যোগ দিয়ে সরকারি চাকরি পেতে পারতেন। কিংবা অর্থের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী, যুবলীগের সাবেক ধর্ষক ও সন্ত্রাসী মোজাম্মেল হকের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা সনদ কিনে নিয়ে সরকারী চাকরীতে যুক্ত হতে। কিন্তু তিনি একজন বিবেকবান ছাত্র ছিলেন। তার পারিবারিক শিক্ষা তাকে অন্যায়ের সাথে যুক্ত হতে দেয়নি। কোটা আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে যে সকল বীর তরুণ দক্ষ হাতে ভূমিকা রেখেছিলেন শহীদ হোসেন তার অন্যতম। ১৯ জুলাই এর পরবর্তী দিনগুলো ছিলো অত্যন্ত ভয়াবহ। ঘরে ঘরে গিয়ে ছাত্রদের আটক করা হচ্ছিল। আন্দোলন কারী সন্দেহ হলে টোকাই লীগ নামে খ্যাত ছাত্রলীগের বর্বর হামলার স্বীকার হতে হতো। অসংখ্য ছাত্রজনতা প্রতিদিনই গ্রেফতার, আহত, ও নিহত হতে থাকে। ২৭ জুলাই একটি কালোদিন। এ দিন দেশ হারায় শহীদ হোসেনের মত একজন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক নাগরিককে যার স্বপ্ন ছিলো দেশগড়ার।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাকে প্রাণ দিতে হয়। এ দিন বিকাল ৪ টায় তিনি উত্তরা এয়ারপোর্ট এলাকায় কোটা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা কালে আওয়ামী পুলিশ দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘন্টা খানেক এর মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন। পুলিশি নির্যাতনের মধ্যে শহীদ হোসেনের লাশ দ্রুত কবরস্থ করতে হয়। পরদিন ২৮ জুলাই নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা:

শহীদ হোসেন এর গ্রামে ভিটেবাড়ি ছাড়াও ৫ শতাংশ জমি আছে। তাছাড়া আর কোন সম্পত্তি নাই। ছোট ভাই শিহাব সৌদি আরবে স্বল্প বেতনে চাকুরী করে।

পরিবারের বক্তব্য

নিহতের বিধবা মা বলেন, আমি আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই। আমার সন্তানকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিলো।

শহীদের বোন বলেন, আমার ছোট ভাইকে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে আমরা উপকৃত হবো।

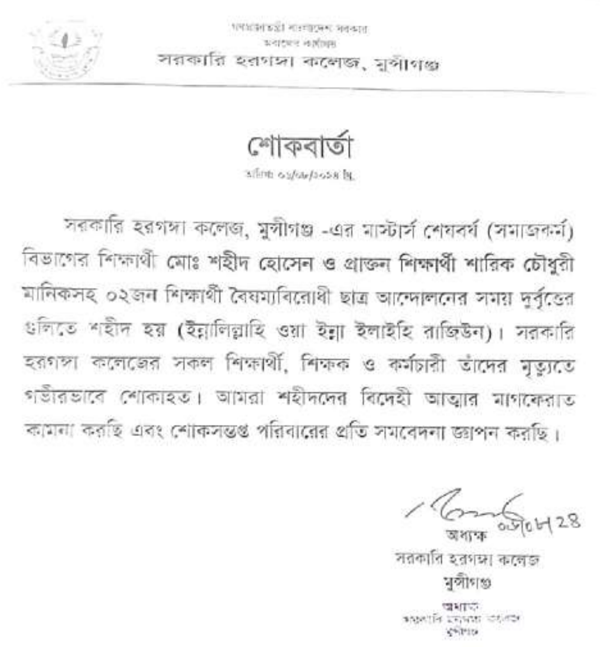

সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ

শোকবার্তা

সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ -এর মাস্টার্স শেষবর্ষ (সমাজকর্ম) বিভাগের শিক্ষার্থী মোঃ শহীদ হোসেন ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী শারিক চৌধুরী মানিকসহ ০২জন শিক্ষার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দুর্বৃত্তের গুলিতে শহীদ হয় (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সরকারি হরগঙ্গা কলেজের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারী তাঁদের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অধ্যক্ষ
সরকারি হরগঙ্গা কলেজ
মুন্সীগঞ্জ

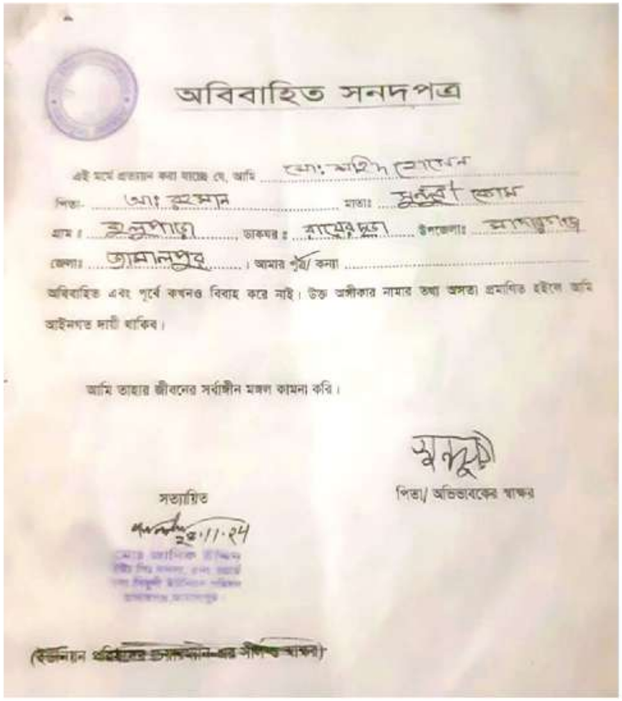

অবিবাহিত সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি মোঃ শহীদ হোসেন
পিতা- আঃ রহমান মাতাঃ সুন্দরী বেগম
গ্রাম: [illegible] ডাকঘর: [illegible] উপজেলা: [illegible]
জেলা: জামালপুর। আমার পুত্র/ কন্যা
অবিবাহিত এবং পূর্বে কখনও বিবাহ করে নাই। উক্ত অঙ্গীকার নামার তথ্য অসত্য প্রমাণিত হইলে আমি আইনগত দায়ী থাকিব।

আমি তাহার জীবনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

পিতা/ অভিভাবকের স্বাক্ষর

সত্যায়িত

[illegible]

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: শহীদ হোসেন
পেশা	: ছাত্র
বাবা	: আব্দুর রহমান (মৃত)
মা	: সুন্দরী বেগম
বোন	: ফাতেমা (বিবাহিত)
ভাই	: শিহাব (১৯), প্রবাসী
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: মদন গোপাল, ইউনিয়ন: রায়ের ছড়া, থানা: মাদারগঞ্জ, জামালপুর
ঘটনার স্থান	: উত্তরা এয়ারপোর্ট
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ২৭ জুলাই, ২০২৪, বিকাল ৪ টা (আনুমানিক)
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২৭ জুলাই ২০২৪, উত্তরা এয়ারপোর্ট বিকাল ৫টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: জামালপুর

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা করা

২. শহীদের ছোট ভাইয়ের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা

শহীদ এস এম সারফুদ্দিন
ক্রমিক : ৭২০
আইডি : ঢাকা সিটি : ১১৯

যে পিতা স্বাধীনতা দেখে ফিরলেন না

শহীদ পরিচিতি

নিশব্দ চিৎকারে লেখা এক নাম এস. এম. সারফুদ্দিন। তাঁর পরিচয় কোনো ঠান্ডা তথ্য নয়, কোনো খাতায় লেখা রেজিস্ট্রি নম্বর নয়। তিনি এক জীবন্ত ইতিহাস, এক অনুভবযোগ্য ভালোবাসা। বাবা শরীফ মিয়ার ঘরে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি বংশালের এক চিরচেনা মুখ ছিলেন, এক ছায়াদানকারী বৃক্ষ; যাঁর নিচে একটি ছোট পরিবার প্রতিদিন একটু করে বেঁচে থাকত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চলা একজন মানুষ, যিনি ছিলেন শুধুই সংসারের আয় উপার্জনকারী নন, তিনি ছিলেন হাসিমুখে দায়ভার নেওয়া একজন পিতা, একজন স্বামী, একজন বন্ধু, একজন সাহসিকতার প্রতীক।

২০০৬ সালে জীবিকার টানে বিদেশ পাড়ি দেন সারফুদ্দিন। কাঁধে আশার পুঁটলি, পিঠে প্রিয়জনদের স্বপ্ন। কিন্তু ২০১১ সালে এক দুর্ঘটনায় সবকিছু থমকে যায়। শরীর আর আগের মতো চলে না, চলার গতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু স্ত্রী যেতে দেননি, ভালোবেসে বেছে নিয়েছেন নিজভূমে ফিরে আসার জীবন। কী আশ্চর্য এক ভালোবাসা! যেখানে প্রবাসের আরাম ছেড়ে তিনি বেছে নিয়েছেন দেশের ঘাম, পরিবারের গন্ধ, সন্তানদের হাসি। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটের ভাড়ায় চলা সংসার, তবুও অভাবের অন্ধকারে আলো জ্বালানোর চেষ্টা চলত প্রতিদিন। দুই মেয়ে, এক ছেলে আর প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে গড়া ছিল সেই জগৎ, যেখানে আহ্লাদ ছিল সীমিত, কিন্তু ভালোবাসার কোনো পরিমাপ ছিল না।

৫ আগস্ট ২০২৪। যেদিন ঢাকার রাজপথে ফুঁসে উঠেছিল "ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক!" স্লোগান, সেদিন সারফুদ্দিন দাঁড়িয়েছিলেন সেই ঢেউয়ের মাঝে। প্রবীণ এক সংগ্রামী হয়ে তিনি হাঁটছিলেন স্বাধীনতার নতুন সকালের দিকে, চোখে ছিল দীপ্তির ছায়া, পায়ে ছিল দৃঢ়তার ভাষা। "মানুষ সম্পত্তি ফেলে এসেছে, কিন্তু প্রতিবাদ ছাড়েনি" এই কথাটা তিনি বলে গিয়েছিলেন সেদিন দুপুরে পরিবারের সঙ্গে খেতে খেতে। মাগরিবের পর আবার বের হয়েছিলেন, যেন মিছিলের গর্জনে নিজের শেষ নিঃশ্বাস মিশিয়ে দিতে চান। তিনি জানতেন না, এই যাত্রা হবে তাঁর জীবনের শেষ বিদায়।

রাজপথের কোলাহলে হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষটি ফিরে আসেননি আর কখনো। তিনি রয়ে গেছেন একটি রক্তাক্ত ইতিহাসের ভেতর, একটি জাতির ঘুম ভাঙানোর শব্দের ভেতর। সারফুদ্দিন এখন আর শুধু একজন ব্যক্তি নন। তিনি একটি প্রতীক, একটি কাঁপতে থাকা হৃদয়ের গল্প। শহীদদের রক্ত দিয়ে লেখা যে বিপ্লব, তার প্রথম অক্ষর যেন এস. এম. সারফুদ্দিন। তাঁকে ভুলে যাওয়া মানে নিজের শেকড় অস্বীকার করা। তাঁর মৃত্যু শুধু দেহের নয়, একটি বর্ণময় জীবনের মাইলফলক। তাঁর যাত্রা শেষ নয়, তিনি আমাদের পথচলার আলোর মতো, যিনি বলেন, "ভয় পেও না, সত্যের পথেই চলো।" এখনো যেন বাতাসে ভাসে তাঁর কণ্ঠস্বর নির্ভীক, কোমল, অথচ শাণিত যে কণ্ঠে ঘরের খবর থাকত, আর দেশের স্বপ্নও।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতার ভোর আর গুলির সন্ধ্যা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। এক অদ্ভুত দিন, যেন ইতিহাস নিজেই নিজের মুখ উল্টে ফেলে বলেছিল, "আজ জন্ম হবে কোনো এক নতুন দেশের, নতুন চেতনার।" সকালে সূর্য উঠেছিল যেমন করে উঠে প্রতিদিন, কিন্তু আলো ছিল ভিন্ন। সে আলোয় ছিল বিদ্রোহের দীপ্তি, মানুষের চোখে ছিল একরাশ অবিশ্বাস, আর বুকভরা আশার ধুকপুকানি। ঢাকা শহর যেন ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল এক বিশাল জনসাগরে। পতাকা ওড়ছিল মানুষের হাতে, গান উঠছিল আকাশে, স্লোগানে কাঁপছিল শহীদ মিনার, টিএসসি, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অলিগলি।

সারফুদ্দিন ছিলেন সেই স্রোতের একজন। কোনো নেতার অনুগামী নন, ছিলেন নিজের বিবেকের সৈনিক। তিনি বলছিলেন, "মানুষ শুধু আনন্দ করছে না, তারা নিজেদের জীবনের নিশ্চয়তা ফেলে রেখেছে এই মাটিতে। কারণ তারা বুঝে গেছে, এটা আর ছাত্রদের আন্দোলন না, এটা এক জাতির আত্মপরিচয়ের লড়াই।" এই উপলব্ধি নিয়ে তিনি হেঁটে বেড়িয়েছিলেন শহরের প্রতিটি কোণে, যেখানে জনগণ একসঙ্গে শ্বাস নিচ্ছিল, যেন এই একই দিনে সবাই একটিই হৃদয়ের স্পন্দনে বেঁধে গিয়েছিল।

কিন্তু দুপুরের পর হাওয়া বদলাতে শুরু করে। সরকারি ভবনগুলো থেকে আসে ছায়ার মতো খবর বিরোধী পক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে, ক্ষমতা হারিয়েছে, কিন্তু তারা ফিরবে। সেই ফেরা হবে নিঃশব্দে, ছদ্মবেশে, প্রতিশোধের মুখোশ পরে।

আর সারফুদ্দিন? তিনি তখন নামাজে যাওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। পরিবারের কারো চোখে তখনও আতঙ্ক নেই, কারণ টেলিভিশনে তখনো চলছে বিজয়ের খবর "স্বাধীনতার মিছিল চলছেই!" ছোট ছেলে তাকিয়ে ছিল পর্দায়, যেখানে আনন্দ দেখা যাচ্ছিল, অথচ ঠিক সেই সময় বাস্তবতাটি বদলে যাচ্ছিল রাজপথে।

মাগরিবের আলো তখনো পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। ঠিক তখনই গর্জে ওঠে প্রথম গুলি। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়। টিয়ারশেলের ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে যায় সেই মানুষের মুখ, যিনি সেদিন সকালের আলোয় বলেছিলেন, "এই আন্দোলন জাতির।" সারফুদ্দিন পড়ে যান রক্তাক্ত রাজপথে, তাঁর চোখের সামনে ভেঙে পড়ে সেই স্বপ্ন, যা তিনি বুকে নিয়ে এসেছিলেন শহীদ মিনার থেকে।

আর ঘরে? সন্তানরা তখনো জানে না, তাদের বাবা, যিনি বলতেন "ভয় পেও না, সত্যের পথেই চলো" তিনি আর ফিরবেন না। টেলিভিশনের পর্দায় স্বাধীনতার খবর চলছিল, কিন্তু জীবনের পর্দায় নেমেছিল এক গভীর শোকের পরিণতি।

এভাবে এক স্বাধীনতার ভোরের গল্প শেষ হয় গুলির সন্ধ্যায়। আর শহরের বাতাসে মিলিয়ে যায় সারফুদ্দিনের নিঃশ্বাস একজন মানুষ, যিনি নিজের শেষ মুহূর্তেও দাঁড়িয়েছিলেন সত্যের পাশে, ইতিহাসের শিরায় শিরায় গেঁথে দিয়ে গেছেন এক শহীদের নাম।

যেভাবে শহীদ হন

ঘটনার শুরু হয়েছিল এক সাধারণ সন্ধ্যায়। যেখানে একজন বাবা নামাজ শেষে একটু হেঁটে আসবেন, একটু আকাশ দেখবেন, হয়তো কোনো মিছিল দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসবেন। কিন্তু সেই সন্ধ্যা আর ফিরতে দেয়নি সারফুদ্দিনকে। এশার নামাজ শেষ করে তিনি বেরিয়েছিলেন মসজিদের দিকে। আকাশে তখন রাতের প্রথম তারা, কিন্তু মাটিতে নেমে আসছিল সংঘর্ষের আঁধার। পল্টন, প্রেসক্লাব, মিরপুর সবখানে ছড়িয়ে পড়ছিলো উত্তেজনা, মানুষ ছুটছিলো, পুলিশ তাণ্ডব চালাচ্ছিলো, টিয়ারশেলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। সারফুদ্দিন সেই উত্তাল সময়ের মাঝেই আটকে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনই বাসা থেকে ফোন আসে ছেলে কাঁপা কণ্ঠে জানায়, "মা'র শরীর ভালো না, ওষুধ আনো।" বাবা ছুটে যান, হাতের কাছে যেটুকু পাওয়া যায় তা নিয়ে মামার হাতে ওষুধ দিয়ে নিজে আবার রাস্তায় বের হন। কেউ জানত না, ওই ফেরা হবে তার জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত। তখনই বাসার ভেতরে তিনটি গুলির শব্দ শোনা যায় একটি, দুটি, তৃতীয়টি যেন স্থির করে দেয় ইতিহাসের পরিণতি। মা প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো বিজয়ের আতশবাজি। বাড়ির ছোট মেয়েটা হাসছিল তখনো, টিভিতে চলছিলো "সরকার পতন" নিয়ে বিশেষ খবর। কিছুক্ষণ পর এক অচেনা লোক এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, "শরফুদ্দিন নামে কেউ আছেন? উনি গুলি খেয়েছেন।"

এই একটুখানি বাক্যে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় একটি সংসারের পাথরের মতো শান্ত দালান। ছোট মেয়ে স্যান্ডেল ফেলে দৌড়ে নামেন সিঁড়ি, চোখে জল, কণ্ঠে কেবল একটাই শব্দ "বাবা..."। রাস্তার পাশে, যেখানে জ্যাম ফেঁসে ছিল, সেখানে পড়ে ছিলেন সারফুদ্দিন শরীর রক্তে রঞ্জিত, চোখ অর্ধনিমীলিত, কণ্ঠ নীরব।

এলাকার কিছু চেনা মুখ তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে যায় নিকটস্থ হাসপাতালে। সবার মুখে তখন একটাই আশংকা "বেঁচে আছেন তো?" কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার এক ঝলক দেখে শুধু বলেন, "তিনিও আর নেই।"

এই 'তিনিও' শব্দটা যেন এক নিষ্ঠুর রসিকতা সারফুদ্দিন শুধু কোনো 'আরো একজন' নন, তিনি ছিলেন এক পরিবারের ছায়া, এক প্রতিবাদের প্রতীক। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে যেন এই আন্দোলন নিজের সবচেয়ে ভারী মূল্যটা বুঝে নেয় রক্ত দিয়ে লেখা হয় সে পাতার নিচের শেষ চিহ্ন।

সেই রাতে ঘরে আলো ছিল, কিন্তু উষ্ণতা ছিল না। মা স্তব্ধ, ছেলে দেয়ালে মাথা ঠুকছে, মেয়েরা বিছানায় কাঁপছে। শহরের বিজয়ের হর্ণ বাজছিল, কিন্তু শহীদের ঘরে বাজছিল শূন্যতার এক দীর্ঘ রাত্রিকাল। তাঁর মৃত্যু হয়ে উঠল একটি জাতীয় আত্মত্যাগের প্রতীক। যেখানে আনন্দ আর অনন্ত শোক একে অপরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল, নীরব, অথচ চিরকালিক।

পরিবার ও পরবর্তী বাস্তবতা

আজ সারফুদ্দিনের পরিবার বেঁচে আছে, কিন্তু জীবন নয় এক মৃত্যুর ছায়ায় আবদ্ধ হয়ে তারা কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যেন একটি দোতলা বাসার সব দরজা-জানালা খুলে গেছে, বাতাস ঢুকছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও উষ্ণতা নেই, আশ্রয় নেই। স্ত্রী আজও বিছানা থেকে পুরোপুরি উঠতে পারেন না। চোখে পানি নেই, কেবল এক নিরব, জমে থাকা শোক। ছোট মেয়ে, বিদ্যালয়ে ঢুকেছিল, সব ফেলে রেখে আজ মায়ের পাশে বসে থাকে সারাদিন। চোখের নিচে কালি, মনে ঘূর্ণি, মুখে নীরবতা। তার হাতে আজ আর খাতা-কলম নয়, মায়ের ওষুধ, বাবার শেষ ছবি, আর ছোট ভাইয়ের স্কুলের ব্যাগ। ছোট ছেলেটি, যে সবে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছে, বাবার মৃত্যু মানে বোঝে না পুরোপুরি। তাদের জীবনের আশ্রয় ছিল যে ছোট্ট ভাড়া ফ্ল্যাটটি সেই ফ্ল্যাটের আয়ই এখন একমাত্র উপার্জনের আশা। আর সেই আয়ের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন সারফুদ্দিন। তিনি ছিলেন যে মানুষটা ঠিক সময়মতো বিল দিতেন, চাল-ডাল কিনে আনতেন, দেরিতে বাড়ি ফিরলেও মেয়ে-মায়ের খোঁজ রাখতেন, সেই মানুষটি আজ কেবল একটি ফ্রেমে বন্দি দেওয়ালে ঝুলছে, চোখ দুটি যেন জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা কেমন আছো?"

পরিবারের কাছে সবচেয়ে কষ্টদায়ক মুহূর্ত ছিল এই তারা জানতই না যে গুলি শরফুদ্দিনের গায়ে লেগেছে। কেউ দেখতে পায়নি তাঁর শেষ নিশ্বাস, কেউ ছুঁয়ে দিতে পারেনি ঠান্ডা হয়ে যাওয়া হাত। কোনো শেষ বিদায় নেই, কোনো দাফনপূর্ব ওসিয়ত নেই; শুধু একদিন হঠাৎ জানতে পারা, বাবা আর নেই। সেই না-পারার যন্ত্রণাই আজ ঘিরে আছে প্রতিটি ঘরের দেয়াল।

এই মৃত্যু শুধুমাত্র এক হৃদয়বিদারক ঘটনা নয়, এটি একটি অসমাপ্ত সংসার। একটি পরিবার যেটা লড়াই করেছিল অল্পে খুশি থাকতে, সেটাই আজ হারিয়ে ফেলেছে জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। মেয়েটি এখন বলে, "যদি জানতাম, সেদিন বাবাকে নামতে দিতাম না।" কিন্তু ইতিহাস তো কোনো আগাম নোটিশ দেয় না। কোনো দিনপঞ্জিতে লেখা থাকে না, আজ রক্ত লাগবে। সারফুদ্দিন সেই রক্ত দিয়েছেন যে রক্তে হয়তো স্বাধীনতার কোনোরকম রেখা টানা হয়েছে, কিন্তু সেই রেখা তাঁদের ঘরে কেবল শোক নিয়ে এসেছে।

এখন এই পরিবার শুধু বেঁচে আছে। কারণ, তাঁদের প্রতিটি শিরায় বইছে সেই মানুষটির চিহ্ন, যিনি একদিন ঘর চালিয়েছিলেন ভালোবাসা দিয়ে, আর জীবন দিয়েছিলেন ন্যায়বোধে। তাঁরা আজও প্রতিবছর ৫ আগস্টের অপেক্ষা করেন, যেন সে দিন বাবা আসবেন, একবার শুধু বলবেন, "ভয় পেও না, আমি আছি।" কিন্তু জানেন, আসবে না কেউ। আসবে কেবল স্মৃতির দীর্ঘস্বর, এক বাবার নাম, এক শহীদের গল্প।

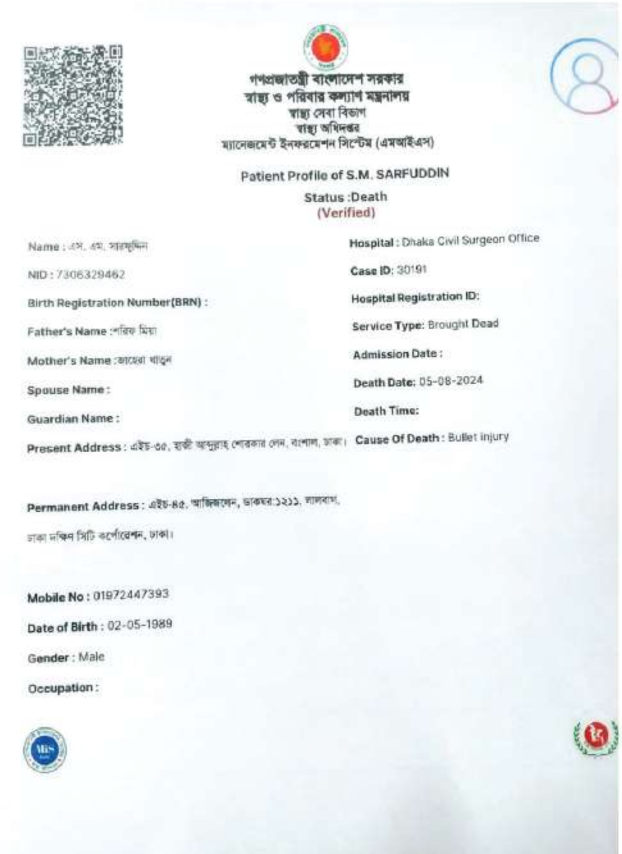

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

Patient Profile of S.M. SARFUDDIN

Status :Death
(Verified)

Name : এস. এম. সারফুদ্দিন
NID : 7306329462
Birth Registration Number(BRN) :
Father's Name : শরিফ মিয়া
Mother's Name : জায়েরা খাতুন
Spouse Name :
Guardian Name :
Present Address : এইচ-৩৫, হাজী আব্দুল্লাহ্ শোরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।

Hospital : Dhaka Civil Surgeon Office
Case ID: 30191
Hospital Registration ID:
Service Type: Brought Dead
Admission Date :
Death Date: 05-08-2024
Death Time:
Cause Of Death : Bullet injury

Permanent Address : এইচ-৪৫, আজিমলেন, ডাকঘর:১২১১, লালবাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

Mobile No : 01972447393
Date of Birth : 02-05-1989
Gender : Male
Occupation :

প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকার

এস. এম. সারফুদ্দিন শুধু একজন শহীদ নন; তিনি ছিলেন হেঁটে যাওয়া এক প্রতিবাদপাঠ, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই যিনি গড়ে তুলেছিলেন ন্যায়, দায়িত্ব আর অন্ধকারকে ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে কেবল এক শোকবার্তা নয়, বরং জাতির সামনে ছুঁড়ে দেওয়া এক প্রশ্নপত্র, যার প্রতিটি প্রশ্নই গঠিত মানবিকতা, কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় আত্মার ভিতর থেকে।

তাঁর মৃত্যুর পর, দেশের প্রতি তাঁর রেখে যাওয়া শেষ চাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর পরিবারের ন্যায্য নিরাপত্তা। আর তাই, এখন এই রাষ্ট্রের সামনে তিনটি অনিবার্য প্রস্তাব।

প্রথমত, তাঁর দুই সন্তানের শিক্ষাজীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। বাবার শিক্ষা ছিল রাস্তায়, শ্লোগানে, রক্তমাখা বিশ্বাসে। সন্তানদের শিক্ষা হবে বইয়ের পাতায়, কলমের সঙ্গী হয়ে, কিন্তু সেই মূল্যবোধে দাঁড়িয়ে থাকবে যেটা বাবা রেখে গেছেন। যেন তাঁরা শুধু বাবাকে না, ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে সামনে। এক সন্তান পড়াশোনা থামিয়ে দিয়েছে, আরেকজন স্কুলের পাঠে মন দিতে পারে না এ এক মিথ্যা বিচার হবে যদি তাদের ভবিষ্যৎ বাবার রক্তের মূল্যের সমান কিছু না পায়।

দ্বিতীয়ত, তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব ও পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে। সেটা হতে পারে একটি সরকারি অনুদান, বা এক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প, যার মাধ্যমে তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেন আর কারো করুণা নয়, বরং সম্মানের ভিতর দিয়ে বাঁচার মতো জীবন। এমন প্রকল্প হতে পারে তাঁদের জন্য এক নতুন গৃহ, এক ছোট দোকান, কিংবা একটি সেলাই কেন্দ্র যা সেই পতিত পৃথিবীর ভেতর একটু আলো জ্বালিয়ে রাখবে। শরফুদ্দিন উত্তরাধিকার রেখে গেছেন একটা দেশের কাছে, একটা ইতিহাসের কাছে। তাঁর উত্তরাধিকার কেবল তাঁর রক্তের ভেতরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেটা ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষার দাবিতে, চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তায়, এবং সেই সম্মানে যেটা একজন মানুষকে মানুষ করে তোলে মৃত্যুর পরেও। এই প্রস্তাবনা শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয় এটা আমাদের বিবেকের জন্য, আমাদের রাষ্ট্রের অন্তঃস্থলে থাকা একটি নিরব প্রশ্নের জবাব "তোমরা কি নিজদের শহীদদের দেখেছো? না শুধু ব্যবহার করেছো?"

আজ সময় এসেছে সেই উত্তর দিয়ে দেওয়ার। যত দিন আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়াবো না, ততদিন আমরাও ইতিহাসের সামনে দাঁড়াতে পারব না।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: এস. এম সারফুদ্দিন
পিতা	: শরীফ মিয়া
মাতা	: জাহেরা খাতুন
স্ত্রী	: নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক (অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী)
সন্তান	: দুই, এক মেয়ে ও এক ছেলে (মেয়ে, পড়াশোনা বন্ধ রেখে মায়ের সেবায় নিয়োজিত, ছেলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি
জন্ম	: ২ মে, ১৯৬৯ (জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী), জন্মস্থান ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ৪৫, আজিজগঞ্জ, লালবাগ, ডাকঘর: ১২১১, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
বর্তমান ঠিকানা	: হাউজ-৩৫, হাজী আবদুর রহিম শোকার সেনা, বংশাল, ঢাকা
পেশা	: পেশা অনির্ধারিত, তবে একমাত্র আয় ছিল একটি ভাড়া দেওয়া ফ্ল্যাট থেকে
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ (ভেরিফায়েড ডেথ সার্টিফিকেট অনুযায়ী)
শহীদ হওয়ার সময়	: এশার নামাজের পর, রাতের বেলায়
শহীদ হওয়ার স্থান	: নিজ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন
মৃত্যুর কারণ	: গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু (Brought Dead-Cause: Bullet Injury, সরকারি নথি অনুসারে)
চিকিৎসা সেবা ও ভেরিফিকেশন	: ঢাকা সিভিল সার্জন অফিস, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দ্বারা মৃত্যু নিশ্চিত
দাফন ও জানাজা	: স্থানীয় এলাকাবাসীর সহায়তায় সম্পন্ন হয়
শহীদের কবরের অবস্থান	: আজিমপুর কবরস্থান

শহীদ শফিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ৭২১

আইডি ঢাকা বিভাগ : ১৩৫

শহীদ পরিচিতি

শফিকুল ইসলাম ১৯৯২ সালে ১ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আবু বক্কর ও মাতার নাম মোছা: সাহেদা বেগম। শফিকুল ইসলাম পেশায় দিনমজুর ছিলেন। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের দিন ঘাতক পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শেখ হাসিনা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নির্দয় নারী শাসক। মৌমাছির চাকের মধ্যে রানী মৌমাছি যেভাবে পুরুষ মৌমাছিগুলোকে নিজের প্রয়োজন শেষে নির্দয়ভাবে হত্যা করে এবং তার মত বেড়ে ওঠা নারী মৌমাছিদের ক্ষমতা হারানোর আশংকায় বেঁচে থাকতে দিতে চায়না হাসিনাও এমনই ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা রেন্টু তার 'আমার ফাঁসি চাই' বইতে এই পিশাচ নারী সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন সেসব অতিরিক্ত ও বাড়াবাড়ি মনে হলেও গত ১৫ বছরের স্বৈরশাসনে দেশবাসী উপলব্ধী করেছে উক্ত বইয়ের তথ্য অতিরঞ্জিত নয় বরং শতভাগ সত্য! শেখ হাসিনা নিজের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে বেছে নিয়েছিল অদক্ষ, মাতাল, দূর্নীতিপরায়ন, নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের। এদের অনেকে ভারতের হাতে প্রশিক্ষিত ছিল। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে সকল বিভাগ থেকে দেশপ্রেমিক ও সৎ ব্যক্তিদের সরিয়ে দিয়ে আওয়ামীলীগের দূর্নীতিবাজ ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের পদায়ন করা হয়। ফলে সর্বত্র অব্যবস্থাপনা দেখা দেয়। লুট হতে থাকে দেশের সম্পদ। এসব কর্মকর্তারা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করতে থাকে। প্রথম আলো পত্রিকার ২ ডিসেম্বর ২০২৪ সালের তথ্য মতে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিদেশে পাচার করা হয়েছে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বা ২৮ লাখ কোটি টাকা। প্রতি বছরে গড়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। আওয়ামীলীগ সরকারের রাজনীতিবিদ, আওয়ামীলীগ সমর্থিত ব্যবসায়ী ও সরকারী আমলারা এই অর্থ পাচার করেছিলেন। টাকা গুলো পাচার করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, আরব আমিরাত, হংকং, মালয়শিয়া ও ভারতে।

পাচারের টাকায় গাড়ি, বাড়ি তৈরী করা হয়েছে। দুবাইয়ে বাংলাদেশীদের বাড়ির সংখ্যা ৫৩২ টি। বাড়ির ক্ষেত্রে ২য় অবস্থানে আছে মালয়শিয়া। প্রথম আলো আরো জানায়, ঘুষ নেয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগের নেতারা নিয়েছেন ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা এবং আওয়ামীলীগের নিয়োগকৃত আমলারা ঘুষ নিয়েছেন ৯৮ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও শেয়ারবাজার থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং প্রকল্প থেকে লুটপাট করা হয়েছে পৌনে ৩ লাখ কোটি টাকা। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের মাধ্যমে ফাঁসির দন্ড প্রাপ্ত আওয়ামীলীগের জঘন্য ধরণের খুনি আসামীদের ছেড়ে দেয়া শুরু করেন। ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত প্রথম ৫ বছরে ২৮ জন খুনি আসামী ছাড়া পেয়ে যায়। দেশটা হয়ে যায় অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। দেশের মানুষ প্রতিবাদ করা ভুলে যেতে থাকে। কারণ প্রতিবাদী দেশপ্রেমিকেরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনা। গ্রেফতার, গুম, খুন, অথবা আপষ রফা করে জীবন কাটাতে হয়। অনেককে দেশ থেকে ভিন্ন দেশে পালিয়ে যেতে হয়েছে। একসময় জঘন্য দেশের উদাহরণ হিসেবে মগের মুল্লুকের কথা বলা হলেও আওয়ামীলীগের অত্যাচারের মাত্রা দেখে জনতা ভাবতে বাধ্য হয় হাসিনা মুল্লুক নিঃসন্দেহে মগের মুল্লুকের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শফিকুল ইসলাম ছিলেন সাধারণ দরিদ্র জনতার প্রতিচ্ছবি। দিন এনে দিন খাওয়া পুরুষ। সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করে পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেয়ার চিন্তা ছাড়া তাকে আর কোন কিছু ভাবাতে পারেনা। জুলাই মাস জুড়ে ঘর থেকে যতবারই বের হয়েছিলেন ততবারই রাস্তায় পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়েছিল। তিনি দেখেছেন তার সামনে অনেক ছাত্র-জনতার মোবাইল ফোন চেক করে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে। সরকারি সাধারণ ছুটি, কারফিউ এবং ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ হওয়ায় তার কর্মক্ষেত্রে বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ৪ আগস্ট ছাত্ররা ইট ও লাঠি দিয়ে অস্ত্রধারী আওয়ামীলীগের খুনি সন্ত্রাসী, ঘাতক পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাবকে প্রতিরোধ করা শুরু করে। সারাদেশে ১৩০ জনের মত ছাত্র-জনতা ও কিছু আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী নিহত হয়। এর ফলশ্রুতিতে শেখ হাসিনা আতংকিত হয়ে পড়ে। ছাত্র নেতারা ৯ দফা থেকে ১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা দেয়। ৫ আগস্ট মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকার পরেও জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সকল স্তরের কর্মীর পাশাপাশি সাধারণ ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। সড়কে সরকার দলীয়দের গুলির মুখে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করলেও সবাই গণভবন অভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকে। দুপুর ১ টায় খবরে প্রকাশ হয় খুনি হাসিনা ছোট বোনকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন। সংবাদটি আনন্দের ছিল। জনতা মিস্টি বিতরণ করে, ঈদ মুবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর স্লোগানে সারাদেশের রাজপথ প্রকম্পিত হতে থাকে। হাজার কোটি টাকা করে ব্যয় করা ফ্যাসিবাদের উৎস সাবেক স্বৈরাচারী শাসক শেখ মুজিবের মূর্তি ও ম্যুরাল ভাঙ্গতে থাকে জনতা। মূর্তিতে ঘৃণার সাথে থুথু ও জুতা নিক্ষেপ করে। শফিকুল তাঁর বন্ধুদের সাথে হাসিনার পলায়নের খবরে আনন্দে রাজপথে বেরিয়ে আসেন। আনন্দ মিছিলে যুক্ত হন। কিন্তু উনি জানতেননা ওটাই ছিল তার শেষ আনন্দ-উল্লাস। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার নির্দেশ ছিল গণহত্যা পরিচালনা করার। হিংস্র আওয়ামী পুলিশ বাহিনী সাভার এলাকায় শফিকুল ইসলামের মাথায় গুলি করে। ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শফিকুলের সন্তান আয়েশা একজন গার্মেন্টস কর্মী। রফিকুল ইসলাম ভ্যান চালক এবং অপর সন্তান রবিউল জোগালীর কাজ করেন। তারা সাভারে ভাড়া বাসায় থাকেন।

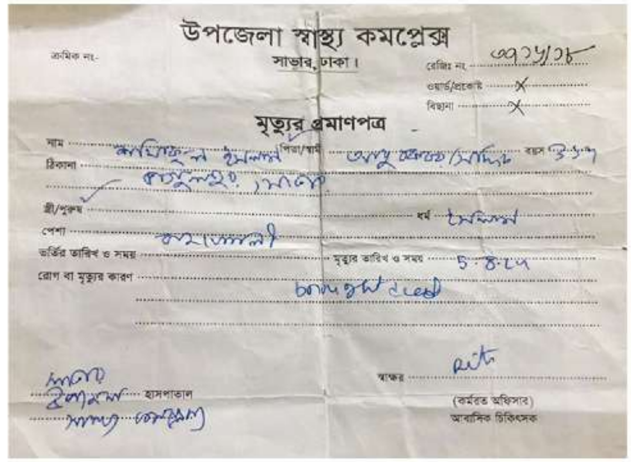

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক নং-
রেজিঃ নং
ওয়ার্ড/প্রকোষ্ঠ ×
বিছানা ×

মৃত্যুর প্রমাণপত্র

নাম ... পিতা/স্বামী ... বয়স ...
ঠিকানা ...
স্ত্রী/পুরুষ ... ধর্ম ...
পেশা ...
ভর্তির তারিখ ও সময় ... মৃত্যুর তারিখ ও সময় 5.8.24
রোগ বা মৃত্যুর কারণ ... brought dead

... হাসপাতাল
স্বাক্ষর ...
(কর্মরত অফিসার)
আবাসিক চিকিৎসক

সাভার তালবাগ কবরস্থান
সাভার, ঢাকা।
সাভার তালবাগ কবরস্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কল্পে
ক্রমিক নং- 3017
দানের রশিদ
তারিখ ঃ
জনাব ঃ মো: শফিকুল ইসলাম
ঠিকানা ঃ
পরিমাণ ঃ 3000/-
কথায় ঃ তিন হাজার টাকা মাত্র
ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল।
সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর-
আদায়কারীর স্বাক্ষর-

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: শফিকুল ইসলাম
জন্ম	: ১ ডিসেম্বর ১৯৯২
পেশা	: দিনমজুর
পিতা	: মৃত: আবু বক্কর
মাতা	: মোসা: সাহেদা বেগম
সন্তানদের তথ্য	: ১. আয়েশা আক্তার, গার্মেন্টস কর্মী ২. রফিকুল ইসলাম, ভ্যান চালক, ৩. রবিউল ইসলাম, জোগালী
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: ১৩০/১০, গ্রাম: ভাগলপুর ,দক্ষিন দরিয়াপুর, ডাকঘর: সাভার, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: সাভার, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, বিকাল ৪ টা (আনুমানিক)
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: সাভার তালবাগ কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ আবদুল্লাহ আল রোমান

ক্রমিক : ৭২২

আইডি ঢাকা বিভাগ : ১৩৬

শহীদ পরিচিতি

আবদুল্লাহ আল রোমান ২০ জুলাই ২০০৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং মায়ের নাম রোজিনা। রোমান ১০ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম নবকিশলয় স্কুল। রোমানের বাবা আনোয়ার হোসেন পোলার আইস্ক্রিম কোম্পানীর কর্মকর্তার গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে কর্মরত।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪। সোমবার। কয়েকদিন বিরতির পর ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ দিয়েছিল হাসিনা সরকার। এই দিনেই হাসিনা সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে ছাত্র-জনতার কর্মসূচি ছিল 'লং মার্চ টু ঢাকা'। তাই আগের রাত থেকেই রাজধানীর সড়ক ছিল সুনশান নিরবতা। সকালটাও ছিল মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টিস্নাত। রাজধানীর সড়ক ছিল যানবাহন শূণ্য। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কি হতে যাচ্ছে? আগের মতো এদিন সকাল থেকেই সড়কে তেমন পুলিশ কিংবা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ছিল না। কখনো বা সড়কে একত্রে পুলিশের কিছু গাড়ি টহল দিচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবন ঘিরে সকাল বেলায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। তবে সকল ভয়-ভীতি, আতঙ্ক, বৃষ্টি উপেক্ষা করে উৎসুক ছাত্র-জনতা একে একে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন লং মার্চ টু ঢাকায় যোগ দিতে। মোবাইল ইন্টারনেটের পর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও বন্ধ করে দেয়ায় যোগাযোগ দূরুহ হয়ে পরে। এরই মধ্যে রাজধানীর উত্তরা, রামপুরা, বাড্ডা, বনশ্রী, পলাশী, শাহবাগ, চাঁনখার পুল, যাত্রাবাড়ী-শনির আখড়া, মোহাম্মদপুর, মিরপুর এলাকার রাস্তায় নেমে আসেন ছাত্র-জনতা। শাহবাগ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। শাহবাগকে ঘিরে এক দিকে ইন্টার কন্টিনেন্টাল মোড়, কাটাবন মোড়, মৎস্যভবন মোড়, শিক্ষা ভবন মোড়, চাঁনখারপুল মোড়, পলাশী, নীলক্ষেত এলাকা সেনাবাহিনী-পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা তৈরি করা হয়। চাঁনখার পুল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় এবং গুলি ছুড়ে। এতে কয়েকজন গুলিবিদ্ধও হন। উত্তরায় কয়েক হাজার ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে শাহবাগের দিকে রওয়ানা হলে সেনাবাহিনী তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে স্বাগত জানায়। রামপুরায় শিক্ষার্থীরা ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সামনে থেকে সড়কে আসতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে এবং শিক্ষার্থীদের সড়কে নেমে আসার সুযোগ করে দেয়। যাত্রাবাড়ী-শনিরআখড়া, মিরপুর, মোহাম্মদপুর এলাকা ছাত্র-জনতা দখলে নিয়ে তারাও শাহবাগের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে যাত্রা শুরু করেন।

হাটি হাটি পায়ে রাজধানীর চতুর্দিক থেকে শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে এগুতে থাকেন শাহবাগের দিকে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশের সকল বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা শাহবাগে প্রবেশ করতে থাকে এবং শাহবাগে অবস্থান নিতে থাকে। পৌনে ১টার দিকেই সংবাদ আসে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা বুঝে ফেলেন তাদের বিজয় হয়ে গেছে। বেলা আড়াইটার দিকে খবর আসে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এই সংবাদ শোনার পরপরই উল্লাসে ফেটে পড়ে শাহবাগ থেকে শুরু করে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, উত্তরা, রামপুরা, যাত্রাবাড়ীসহ সারাদেশের সকল জেলা-উপজেলার ছাত্র-জনতা। সরেজমিনে শাহবাগ এলাকায় দেখা যায়, শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সী নারী-পূরুষ সকলেই ছুটে এসেছেন শাহবাগের দিকে। কারো হাতে লাঠি তো, কারো হাতে জাতীয় পতাকা। কেউ আবার সেই পতাকা বেধেছেন মাথায়ও। সবার মুখে মুখে শ্লোগান, এই মাত্র খবর এলো খুনী হাসিনা পালিয়ে গেল, এই মাত্র খবর এলো ছাত্র-জনতার বিজয় হলো, এই মাত্র খবর হলো স্বৈরাচারের পতন হলো। এছাড়া সবাই আওয়ামী লীগ, আওয়ামী সরকার, শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ অন্যান্য নেতাদের নাম ধরে ধরে ভূয়া ভূয়া স্লোগান দিতে থাকেন।

আগেরদিন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে ডাক আসে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই কর্মসূচি ঠেকাতে রাতেই জারি করা হয় কারফিউ। মোতায়েন করা হয় সেনাবাহিনী। ৫ আগস্ট সেই

কারফিউ ভেঙ্গে রাজধানীর অলিগলিতে অবস্থান নেন ছাত্র-জনতা। তাদেরকে মূল সড়কে উঠতে বাধা দেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। দুপুরে বেলা দুইটার সময় গণমাধ্যমে খবর বের হয় পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকার রাজপথসহ সারাদেশে নেমে পড়েন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা। তারা একে অপরকে ঘিরে ধরে বিজয় উল্লাস করতে থাকেন। নানা স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জড়ো হন শাহবাগে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের দিকে যাত্রা করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা। গণভবনের পাশাপাশি জাতীয় সংসদ ভবনেও অবস্থান নেন তারা। এই আন্দোলনে প্রায় আট শতাধিক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আহত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর আওয়ামী লীগ সরকারের সব মন্ত্রী-এমপিসহ অনেক নেতাকর্মী আত্মগোপনে চলে যায়। বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ। উচ্চ আদালতের রায়কে কেন্দ্র করে কোটা সংস্কারে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নেমেছিল শিক্ষার্থীরা। আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও ছাত্র সংগঠন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বলপ্রয়োগে সেই আন্দোলন এক পর্যায়ে রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সেই আন্দোলনকে দমাতে ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। প্রাণ হারায় শিক্ষার্থীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ। কিন্তু তারপরও দমানো যায়নি ছাত্র-জনতাকে।

৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। দেশের জনগণ সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে অত্যাচারী শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ অপশাসনামলে। আর দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। এই ফ্যাসিবাদী সরকার গুম খুন হত্যা, নির্যাতন এবং মানুষের অধিকার হরণ করে দেশে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। বাতি নিভিয়ে রাতের আঁধারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। দেশের সেনাবাহিনীর জেনারেল, উচ্চশিক্ষিত অ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টারসহ হাজার হাজার মেধাবী নাগরিকদেরকে তারা গুম করে আয়নাঘরে বন্দী রেখেছিল। ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে জুডিশিয়াল কিলিং করেছে। মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারিয়েছিল। বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দেশের সংস্কৃতিকেও তারা ধ্বংস করেছে। ছাত্ররা যখন তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করে কোটা বাতিলের দাবিতে তখন তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালিয়েছে, খুন করে পুলিশের গাড়ির ওপর থেকে টেনে হিঁচড়ে ফেলে দিয়েছে। এদেশের মানুষ তাদের কাছে কখনোই নিরাপদ ছিল না। স্বজন হারানো মানুষের আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। হাসপাতালগুলোতে আহত আর নিহতদের রোনাজারিতে বিবেকবান প্রতিটি মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হয়েছিল। কোথাও মানুষ স্বস্তিতে কথা বলার সুযোগ পায়নি, প্রতিবাদ করলেই দমন পীড়ন চলত। মানুষের অধিকার হরণ করার ইতিহাসে স্বৈরাচারী হাসিনার সরকার ছিল কুখ্যাত। তাই ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের বিপ্লব ছিল অনিবার্য। ৫ আগস্টের খবর আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। বিবিসির খবরের শিরোনাম করা হয়েছে, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা প্রাসাদ (গণভবন) দখলে নিয়েছে।'আল জাজিরা বলেছে, 'একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন। তার সরকারি আবাস গণভবনে হাজারো মানুষ ঢুকে পড়েছে।' কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটি সেনাপ্রধানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হবে।' এএফপির খবরেও বোনকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবর প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি বলেছে, 'নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে তিনি দেশ ছেড়েছেন।'স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এএফপি বলেছে, 'হাজারো মানুষ গণভবনে ঢুকে পড়েছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকে ধরে রাখতে গোটা জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। খুনি লুটেরা দুর্বৃত্ত নতুন করে যেন ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। জুলাই আন্দোলনের শহীদ এবং আহতদের ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর দেশ পথ হারিয়েছিল আর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশ আবার পথের দিশা ফিরে পেয়েছে। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের শহীদদের পরিবার ও আহতদের বক্তব্য শুনলে পাষাণ হৃদয় নরম হয় ও অজান্তে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। এ গণ-অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। আল্লাহর সাহায্যে এ কৃতিত্ব ছাত্র-জনতার। শেখ হাসিনা অহংকার করে বলেছিল, তিনি কখনো পালিয়ে যান না! কিন্তু জান বাঁচানোর জন্য তিনি চোরের মতো পালিয়ে যান। ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবও দলের কর্মীদের কোন নির্দেশনা না দিয়ে একই রকম পাকিস্তানে চলে যান।

সুরক্ষিত এবং কঠিন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, 'গণভবন'। এই গর্ত থেকে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে দেশের বাইরে। দেশের কোথাও তার স্থান হলো না। অত্যাচারী হাসিনার ভবিষ্যৎ দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। দীর্ঘ ১৫ বছরে গুম, খুন, ধর্ষণ মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করেছিল। দেশের মানুষ গত ৫ আগস্ট স্বৈরাচারকে সমূলে উৎখাত করেছে। এখন দেশে গণতন্ত্র ও দেশের মানুষকে পূর্ণভাবে মুক্ত করতে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজন আরেকটি বিপ্লবের। যা এই জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করবে। ৭ই নভেম্বর একনায়কতন্ত্র, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে যেভাবে এদেশের মানুষ সম্মিলিতভাবে গর্জে উঠেছিল একইভাবে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতা সকল আধিপত্যবাদী শক্তির মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলে ছাত্র-জনতা খুশিতে রাজপথে নেমে

আসে। এদিন সন্ধ্যার সময় আনন্দ মিছিলে যুক্ত হতে রোমান বাসা থেকে বের হয়ে আসেন। সারাদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী পুলিশ নির্দয়ভাবে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করলেও রোমান ভেবেছিলেন সন্ধ্যার মধ্যে আওয়ামী লীগের খুনি সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাবে অথবা আত্মসমর্পন করবে। কিন্তু তা হলোনা। হঠাৎ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে বুকে, কপালে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

কবর থেকে লাশ উত্তোলন

৫ ই আগস্ট বিজয় মিছিলে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দশম শ্রেণীর ছাত্র রোমান নিহত হন। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পরে তাঁর পরিবার মামলা দিলে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কবর থেকে লাশ উত্তোলন করা হয় ময়না তদন্তের জন্য

পরিবারের মামলা

রোমানের পরিবার মামলা করায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতা গোলাম দস্তগীর গাজীকে ৩ দিনের রিমাণ্ডে নিয়েছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হায়দার আলীর আদালতে ৭ দিনের রিমাণ্ড আবেদন করলে আদালত ৩ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান। এর আগে গত বছরের ২৫ আগস্ট একই মামলায় সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীকে রিমান্ডে নিয়েছিল রূপগঞ্জ থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ মোহসীনের আদালত ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গত ৫ আগস্ট সশস্ত্র হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় দশম শ্রেণির ছাত্র রোমান। এ ঘটনায় গত ২১ আগস্ট রূপগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের খালা রিনা বেগম। ওই মামলায় গোলাম দস্তগীর গাজীও আসামি। গত ২৫ আগস্ট রাজধানীর একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার হন গোলাম দস্তগীর গাজী। তিনি নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন। তাকে এর আগে একাধিক মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমাণ্ডে নিয়েছে পুলিশ। গত ২১ আগস্ট দশম শ্রেণির ছাত্র রোমান মিয়াকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে দায়ের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, গোলাম দস্তগীর গাজীসহ ৪৫ জনকে আসামি করা হয়। গত ৫ আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত রোমান মিয়ার খালা রিনা বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় মামলাটি করেন

অর্থনৈতিক অবস্থা

রোমানের বাবা পোলার আইসক্রিম কোম্পানীর কর্মকর্তার গাড়ি চালান। তিনি সন্তানদের নিয়ে ছনপাড়া ৮ নং ওয়ার্ডে সরকারী খাস জমিতে বাসা নিয়ে থাকেন। তাদের নিজস্ব কোন সম্পদ নেই।

পরিবারের বক্তব্য

মা রোজিনা বলেন, রোমান আমার প্রথম সন্তান। তার পড়ালেখার যাতে কোন সমস্যা না হয় সেজন্য আমার পরের সন্তানদের আরো দেরি করে নিয়েছি। রোমান শুধু আমার সন্তান নয়, সে আমার বন্ধু ছিল। রোমান ওর ভাইদের সাথে নিয়ে ঘুরতো। রোমান না থাকায় তার ভাইয়েরা এখন অসহায় বোধ করে। প্রায় সময় কবরস্থানে চলে যায়। ওর ছোট ভাই যার বয়স মাত্র ৩ বছর সে প্রশ্ন করে, 'মা, কেন তুমি গেইট লাগিয়ে দিলেনা? কেন ভাইয়াকে মিছিলে যাইতে দিছো?' বাবাকে প্রশ্ন করে, 'কেন তুমি বাসায় ছিলেনা? কেন রোমান ভাইকে গুলি করে মাইরালাইছে?' রোমানের ৫ বছরের ভাইটা রোমানের খুনি কে তা খোঁজে। সন্তানদের শাসন করলে তারা কবরস্থানে চলে যায়। কোথাও না পেলে কবরস্থানে এসে তাদের খুঁজে পাই। ওরা রোমানকে খুব মিস করে।

নিউজ লিংক

https://www.facebook.com/61561074656660/videos/577619417976921
https://www.facebook.com/hathazaridarpan24/videos/1884585658617741

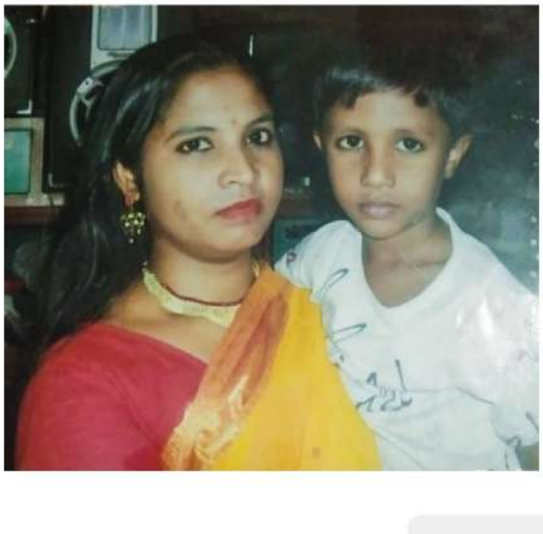

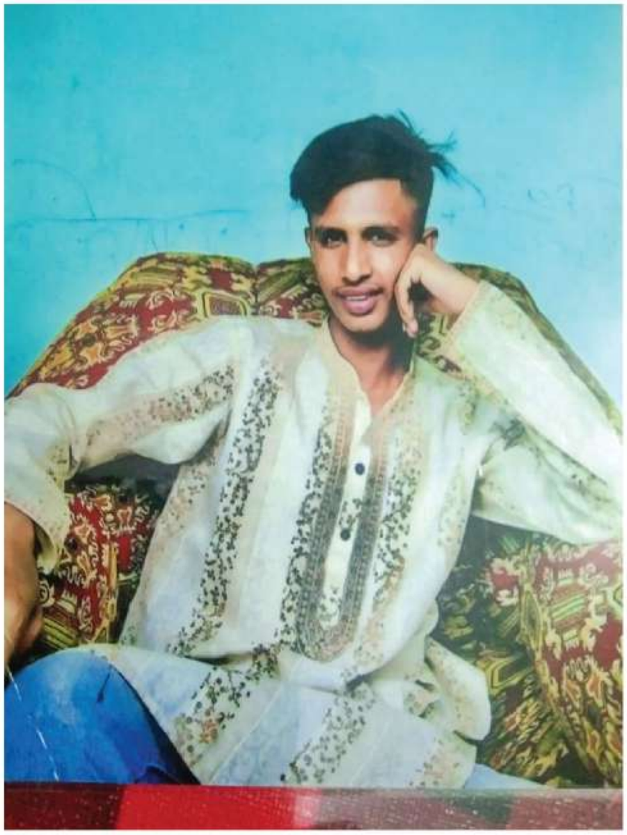

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: আবদুল্লাহ আল রোমান
জন্ম	: ২০ জুলাই ২০০৭
পেশা	: ছাত্র, দশম, নবকিশলয় স্কুল
পিতা	: মো: আনোয়ার হোসেন
মাতা	: রোজিনা
ভাইদের নাম	: আবদুল্লাহ (৬), আহমেদ (৫), মোহাম্মদ (৩)
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: ছনপাড়া, ডেমরা, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: ছনপাড়া, ডেমরা, হলুদ মরিছের মিলের সামনে
আক্রমণকারী	: আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, সন্ধ্যা
আঘাতের ধরন	: বুকে, কপালে ও মাথায় গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, ছনপাড়া, ডেমরা, হলুদ মরিছের মিলের সামনে
শহীদের কবরের অবস্থান	: ৩ নং ওয়ার্ড, ছনপাড়া কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

২. রোমানের বাবাকে সরকারী চাকুরী প্রদান করা যেতে পারে

শহীদ বাবুল

ক্রমিক : ৭২৩

আইডি ঢাকা সিটি : ১২০

জন্ম ও পরিচিতি

বাবুল মিয়া ১৯৮০ সালের ২ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আবুল কাশেম এবং মায়ের নাম রাহেলা বেগম। বাবুল মিয়া পেশায় ড্রাইভার ছিলেন। তিনি উত্তরা ব্যাংকের একজন কর্মকর্তার গাড়ি চালাতেন। বাবুল মিয়ার ৩ সন্তান, দুই মেয়ে ও এক ছেলে। তাদের মধ্যে বড় মেয়ে লিজা আক্তার বিবাহিত, ছোট মেয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে, আর ছেলে শুভ হাফেজি পড়ে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল করে, যার ফলে জুলাইয়ের শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন পুনরায় জোরদার হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভের পর, ১৫ জুলাই আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর উত্তেজনা বেড়ে যায়। পরবর্তী দিনগুলোতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, যার মধ্যে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি, সেইসাথে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র, যুব ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের সাথে সহিংস সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষের ফলে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়, যার মধ্যে রয়েছে আন্দোলনকারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, দলীয় সদস্য, পথচারী ও শিশুরাও। আগস্টের শুরুর দিকে এই সহিংসতার ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় এক হাজার পর্যন্ত অনুমান করা হয় এবং আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। এতো ব্যাপক প্রাণহানি সত্ত্বেও হাসিনা সরকার এই গণহত্যার দায় অস্বীকার করে এবং সহিংসতার জন্য অন্যান্য কারণকে দায়ী করে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলনের সূচনা ২০১৮ সালে হলেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তখন চাকরিতে কোটা তুলে দিয়েছিল সরকার। এ বছরের ৫ জুন হাইকোর্টের এক রায়ে কোটা পুনর্বহাল হলে "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের" ব্যানারে শুরু হয় নতুন আন্দোলন। শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে ২ জুলাই থেকে মিছিল-সমাবেশ শুরু করে। শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগকে কেন্দ্র করেই চলছিল শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি। প্রায় প্রতিদিন শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিল তারা। ধীরে ধীরে আন্দোলনের পরিসরও বাড়তে থাকে পুরো দেশজুড়ে। তবে বিক্ষোভের অনলে ঘি ঢালেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। ১জুলাই ২০২৪ থেকে ৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'র ব্যানারে সংগঠিত হয় এবং সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ২০১৮ সালের সরকারি বিজ্ঞপ্তি পুনঃবহালের দাবিতে টিএসসি এলাকায় একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

পরের কয়েকদিন দেশের অন্যান্য অংশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের ক্যাম্পাস ও এর আশপাশে মিছিল-সমাবেশ করে। ৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ৫ জুন হাইকোর্টের রায় বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিন ৬ জুলাই শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির ডাক দেয়।

৭ জুলাই এ সারা দেশে **'বাংলা ব্লকেড'** কর্মসূচি পালন করা হয়। ব্যাপক বিক্ষোভে অচল হয়ে যায় রাজধানী। পরের দিনও **'বাংলা ব্লকেড'** কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

৯ জুলাই সারা দেশে সড়ক ও রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সকাল-সন্ধ্যা ব্লকেড অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

১০ জুলাই এ কোটা পুনর্বহাল করে হাইকোর্টের আদেশের ওপর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চার সপ্তাহের স্থিতাবস্থা, ৭ই আগস্ট পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ। ১৪ জুলাই কোটা পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে হাই কোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়। পরবর্তীতে ব্যার্থ বিদেশ সফর শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে কটাক্ষ করে। সারাদেশে শিক্ষার্থীরা ফুসে উঠে। তাৎক্ষনিক ছাত্র-ছাত্রীরা রাজপথে নেমে এসে প্রতিবাদে মুখর হয়। তারা স্লোগান দেয়- 'তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার'।

১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগসহ সরকার সমর্থকরা।

১৬ জুলাই সারা দেশে দিনভর ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সরকার সমর্থকরা। এতে ব্যাপক আহত ও নিহতের ঘটনা ঘটে। রংপুরে আন্দোলনকারী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের বুলেটে নিহত হন।

বিকেলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আন্দোলন যাবে, আন্দোলন আসবে। কিন্তু ছাত্রলীগ থাকবে। ১৭ জুলাই আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাদের বের করে দেয় প্রতিবাদী সাধারণ ছাত্ররা। এছাড়া নিহতদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গায়েবানা জানাজা করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষও ঘটে।

এদিন বিক্ষোভের কেন্দ্রের ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন শেখ হাসিনা। শীর্ষ আদালতের রায় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি। রাতেই যাত্রাবাড়ী এলাকায় সংঘাতের সূত্রপাত হয়। যাত্রাবাড়ীতে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোলপ্লাজা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ওই রাত থেকে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে সরকার। ১৮ জুলাইতে দেশব্যাপী ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে লাঠিচার্জ ও গুলি করা হয়। অনেক ছাত্র আহত ও নিহত হয়। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দিতে সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। নিহতদের পরিবারকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এসময়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকাসহ সারা দেশ ছিল প্রায় অচল। রাজধানী ছাড়াও দেশের ৪৭টি জেলায় দিনভর বিক্ষোভ, অবরোধ, পালটাপালটি ধাওয়া, পুলিশের হামলা-গুলি ও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় নিহত ও আহত হয়েছেন অনেকেই। ফলে সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। এদিন রাতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বাবুল মিয়া ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার গাড়ি ড্রাইভিং করে উত্তরায় অবস্থিত উত্তরা ব্যাংকে আসেন। এদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা রাজপথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল। দুপুরে খুনি হাসিনার নির্দেশে পুলিশ তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বাবুল মিয়া জোহরের নামাজ পড়ে মসজিদের বাইরে বের হন। এবি ব্যাংকের সামনে আসার পরে গুলিবিদ্ধ হন। তার চোখে ও বুকে গুলি লাগে। গুলিতে চোখ গলে যায়। উত্তরা মায়াবী হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় রাত ২টায় মৃত্যুবরণ করেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

বাবুল মিয়া একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে সংসারের হাল ধরেছেন তার স্ত্রী। বর্তমানে তিনি মানুষের বাড়িতে কাজ করছেন। নদী ভাঙ্গনের কারণে তাদের গ্রামে কোন জমি নেই।

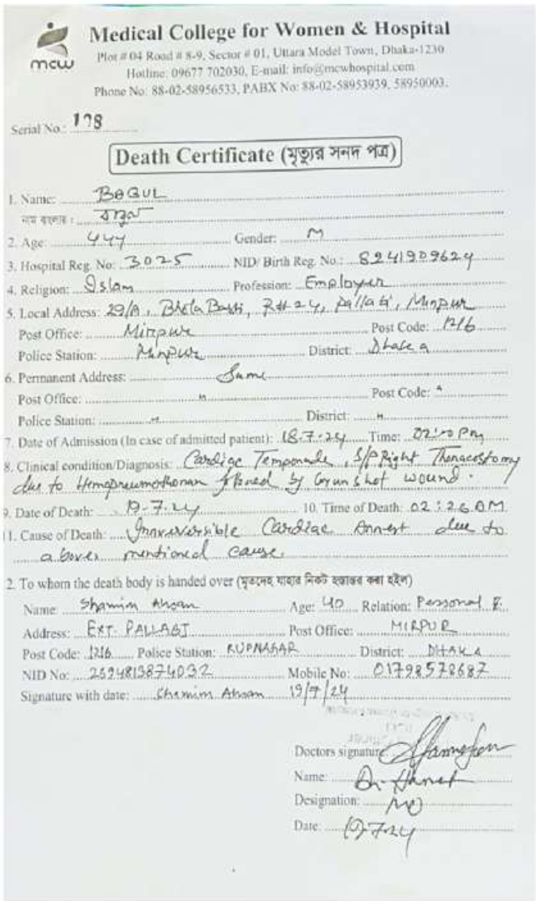

Medical College for Women & Hospital
Plot # 04 Road # 8-9, Sector # 01, Uttara Model Town, Dhaka-1230
Hotline: 09677 702030, E-mail: info@mcwhospital.com
Phone No: 88-02-58956533, PABX No: 88-02-58953939, 58950003.

Serial No.: 178

Death Certificate (মৃত্যুর সনদ পত্র)

1. Name: BaBUL
নাম বাংলায়: বাবুল
2. Age: 44 Gender: M
3. Hospital Reg. No: 3025 NID/ Birth Reg. No.: 8241909624
4. Religion: Islam Profession: Employee
5. Local Address: 29/A, Bhola Basti, R#24, Pallabi, Mirpur
Post Office: Mirpur Post Code: 1216
Police Station: Mirpur District: Dhaka
6. Permanent Address: Same
Post Office: " Post Code: "
Police Station: " District: "
7. Date of Admission (In case of admitted patient): 18.7.24 Time: 02:10 Pm
8. Clinical condition/Diagnosis: Cardiac Tamponade, S/P Right Thoracostomy due to Hemopneumothorax followed by Gunshot wound.
9. Date of Death: 19.7.24 10. Time of Death: 02:26 AM
11. Cause of Death: Irreversible Cardiac Arrest due to above mentioned cause.
12. To whom the death body is handed over (মৃতদেহ যাহার নিকট হস্তান্তর করা হইল)
Name: Shamim Ahsan Age: 40 Relation: Personal E.
Address: EXT. PALLABI Post Office: MIRPUR
Post Code: 1216 Police Station: RUPNAGAR District: DHAKA
NID No: 2694813874032 Mobile No: 01798578687
Signature with date: Shamim Ahsan 19/7/24

Doctors signature:
Name: Dr. Ahmed
Designation: MO
Date: 19.7.24

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: বাবুল
জন্ম	: ২ মার্চ ১৯৮০
পেশা	: ড্রাইভার
পিতা	: আবুল কাশেম
মাতা	: রাহেলা বেগম
সন্তানদের নাম	: লিজা আক্তার (বিবাহিত), মোঃ শুভ (১৪ পারা হিফজ), নুরজাহান, ৮ম শ্রেণি
বর্তমান ঠিকানা	: ২৯/এ, ভোলা বস্তি, এইচ ২৪, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: নাদের মিয়ার হাট, ইলিশা, ভোলা সদর, ভোলা
ঘটনার স্থান	: উত্তরা এবি ব্যাংক
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: দুপুর ১ টা ৪০
আঘাতের ধরন	: চোখে ও বুকে গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯ জুলাই, রাত ২টা, মায়াবী হাসপাতাল
শহীদের কবরের অবস্থান	: দুয়ারি পাড়া কবরস্থান, পল্লবী, ১নং গেইট

প্রস্তাবনা : ১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ আল আমিন ইসলাম

ক্রমিক ৭২৪

আইডি রংপুর বিভাগ : ৫৩

শহীদ পরিচিতি

মোঃ আল আমিন ইসলাম ১৯৯৯ সালে ১ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ ওয়াজেদ আলী এবং মায়ের নাম সেলিনা খাতুন। তার স্ত্রীর নাম সুমাইয়া আক্তার। একমাত্র সন্তান ২ বছর ৭ মাস বয়সী।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৬ বছরে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে, তার চূড়ান্ত রূপ হলো ৩৬ দিনের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন। ২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন হলো বাংলাদেশে সব ধরনের সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটাভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে সংগঠিত একটি আন্দোলন। ২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর কোটা পদ্ধতির সংস্কার আন্দোলন আবার নতুনভাবে আলোচনায় আসে। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছিল। ঐ পরিপত্রের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নবম গ্রেড এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল কোটা বাতিল করা হয়েছিল।

জুলাই মাস জুড়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগসহ সরকারী বাহিনী ব্যপক নির্যাতনসহ হত্যাকান্ড চালায়। এতে আন্দোলন আরো জোরালো হতে থাকে, সর্বত্র প্রতিবাদ আসতে থাকে। প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে দেয়। শেখ হাসিনা তার সব সময়ের অপকর্মের সহযোগী বামপন্থী দল গুলো নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং এর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বিশেষজ্ঞদের মতো ছাত্র-জনতাও বুঝতে পারে খুনি হাসিনা ক্ষমতায় টিকে থাকতে ও আন্দোলন দমাতে অত্যন্ত নির্মম গণহত্যা চালাতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশার মানুষ আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে। তারা বুঝতে পারে স্বৈরাচারকে হঠাতে এবারই শেষ সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া করলে জাতিকে আজীবন ভারতীয় দালাল সরকারের গোলামী করে যেতে হবে। ইসলামী ছাত্র শিবির সাধারণ জনতার সাথে মিশে আন্দোলনকে সারাদেশে জমিয়ে রাখে। তারা ছাত্র নেতাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। আল জাজিরার সাংবাদিক জুলকার নাইন সায়ের জুলাই বিপ্লবে ছাত্র শিবিরের সাহসী নেতৃত্বের প্রশংসা করে তখনকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন তার লেখায়। ৪ আগস্ট ছাত্র নেতারা ৬ আগস্ট গণভবন ঘেরাও ঘোষণা করেন। কিন্তু শিবির নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করলেন ৫ আগস্ট গণহত্যা চালানো হতে পারে। একারণে মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচীর তারিখ ৬ তারিখের পরিবর্তে ৫ আগস্ট ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও জুলাই মাস জুড়ে সরকারী বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হলেও ছাত্র-জনতা ৪ আগস্ট প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জেলায়-মহানগরীতে সরকারী গুন্ডাবাহিনী ইটের আঘাতে পিছু হটে। এই প্রতিরোধ হাসিনার মসনদ কাঁপিয়ে তোলে। জাতিসংঘ থেকে নিষেধাজ্ঞার হুশিয়ারি পাওয়ায় সেনাবাহিনীর একাংশ সরকারকে সহযোগিতা করবেনা বলে জানিয়ে দেয়। পরদিন ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ও তার দূর্নীতিবাজ বোন শেখ রেহানা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

হাসিনার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে ছাত্র-জনতার পাশাপাশি আল আমিন আনন্দে রাজপথে বেরিয়ে আসেন। যেখানেই যাকে পান আনন্দে কোলাকুলি করেন। মিষ্টির দোকান গুলো খালি হতে থাকে। হাজার কোটি টাকায় নির্মিত দাম্ভিক ও সাবেক স্বৈরাচার মুজিবের মূর্তি ও ম্যুরাল ঘৃণার সাথে ভাঙ্গতে থাকে জনতা। আল আমিন এসব দৃশ্য দেখে হতবিহ্বল। খুশিতে আত্মহারা। তার সাথে ছিলেন ছোট ভাই শাকিল ইসলাম। তারা সাভার থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলির মুখে পড়েন। গুলির কারনে ছোটভাইকে হারিয়ে ফেলেন। এসময় আল আমিন গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তার শ্বশুরকে ফোন দিয়ে আহত হওয়ার কথা জানান। শ্বশুর আল আমিন ইসলামের বাবাকে ফোন করে জানান। আল আমিনের বাবা ওয়াজেদ আলী শাকিলকে উদ্ধার করার নির্দেশ দেন। পথচারীরা আল আমিন ইসলামকে এনাম মেডিকেলে দিয়ে আসে। শাকিল বড় ভাইকে এনাম মেডিকেলে এসে লাশ হিসেবে খুঁজে পান।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আল আমিন ইসলাম বংশালে একটি বেসরকারী কোম্পানীতে চাকরী করতেন। তার বাবা মোঃ ওয়াজেদ আলী কৃষি কাজ করেন। আল আমিনের স্ত্রী সুমাইয়া একাদশ শ্রেণিতে লেখাপড়া করে। আল আমিন ও সুমাইয়ার সংসারে ২ বছর ৭ মাস বয়সী একটি পুত্র সন্তান আছে।

সংশোধিত/Corrected

ZTIZA

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Maricha Union Parishad
Birganj, Dinajpur
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
13/08/2024	19992711217104327	13/08/2024

Date of Birth : 01/02/1999 Sex : Male
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: মো: আল-আমিন ইসলাম	Name	: Al Amin
মাতা	: মোছা: সেলিনা খাতুন	Mother	: Selina
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মো: ওয়াজেদ আলী	Father	: Oyazed
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

01.09.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আল আমিন ইসলাম
জন্ম	: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
পেশা	: বেসরকারী চাকরীজীবী
পিতা	: মোঃ ওয়াজেদ আলী
মাতা	: সেলিনা খাতুন
স্ত্রী	: সুমাইয়া
সন্তান	: হুজাইফা (২.৭ মাস)
স্থায়ী ঠিকানা	: ডাবড়া, জিনেশ্বরী, মাস্টারের মোড়ের উত্তর পাশে, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: শোভাপুর, রাজফুলবাড়ি, রাজফুল বাড়িয়া, সাভার, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: এনাম মেডিকেল কলেজের সামনে রাস্তায়, সাভার
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদের কবরের অবস্থান	: ডাবড়া কবরস্থান
প্রস্তাবনা	: ১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ জালাল উদ্দিন

ক্রমিক : ৭২৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ : ১৩৭

শহীদ পরিচিতি

মো: জালাল উদ্দিন ১৯৮৩ সালের ১০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোহছন রাড়ী এবং মায়ের নাম ফাতেমা বেগম। তিনি ছিলেন বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম মোছাঃ মলি। তার দুই ছেলে রয়েছে। তাদের নাম হলো মো: সিজান এবং মো: শিহাব। দুই সন্তান পড়ালেখা করে। স্ত্রী গৃহিণী। পরিবারের একমাত্র উপার্জন ব্যক্তি মোঃ জালাল উদ্দিন ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্রজনতার গণঅভুত্থানের সময় আওয়ামী সরকার দমনপীড়ন ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। বিতর্কিত কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল ও ব্যাপক গণঅসন্তোষের জের ধরে এই গণহত্যা অভিযান পরিচালনা করে আওয়ামী লীগ সরকারের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেমন- পুলিশ, র‌্যাব, সেনাবাহিনীর একাংশ আর ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং বা 'র'। ২০২৪ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল করে, যার ফলে জুলাইয়ের শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন পুনরায় জোরদার হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভের পর, ১৫ জুলাই আন্দোলনকারীদের উপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। রক্তাক্ত হয় ছাত্র-ছাত্রীরা। হাসপাতালে গিয়ে আবারও আহতদের উপরে হামলা করে ছাত্রলীগ। পরবর্তী দিনগুলোতে অর্থাৎ জুলাই মাস জুড়ে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সরকারী বাহিনীর হামলা, গুলি, গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে অসংখ্য মানুষ আহত ও নিহত হয়। আটক হয় হাজার হাজার। আগস্টের শুরুর দিকে এসে দেখা যায় এই সহিংসতার ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে, প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় আটশতাধিক পর্যন্ত অনুমান করা হয় এবং আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার।

দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য জাতির মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

২০ জুলাই থেকে সারাদেশে কারফিউয়ের মধ্যে ঢাকা, সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভ কারীদের সংঘাত চলে। আওয়ামীলীগ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রাজপথে হাজির হয়। অপরদিকে সাধারণ ছাত্র-জনতা ছিল খালি হাতে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিপ্লব বিরল একটি ঘটনা। অর্থাৎ ভারতের অনুগত রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বিনাশ করতে যুদ্ধাস্ত্র হাতে অপরদিকে নাগরিকেরা ছিল সম্পূর্ণ খালি হাতে। সরকারী বাহিনীর আক্রমণে বহু বিক্ষোভকারী হতাহত হন। আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রির সঙ্গে কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন সমন্বয়কারীর বৈঠক হয় এদিন। আন্দোলনকারীরা আট দফা দাবি পেশ করেন। এই বৈঠক নিয়ে সমন্বয়কদের মধ্যে মতভেদের খবর আসে। শিবিরের সহযোগিতায় পরে ৯ দফা দাবি পেশ করা হয়। এই নয় দফা সরকারকে কাঁপিয়ে দেয়।

জালাল উদ্দিন ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ঘটনার দিন জালাল উদ্দিন মাগরিবের নামাজ পড়ে বাজার করার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। কয়েকদিন ধরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকার কারনে আন্দোলনকারীদের দমন-পীড়ন প্রেক্ষাপটে দোকান-পাট, বাজার অনেকটা বন্ধ ছিলো। বাজার ও ঔষুধ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি বাসা থেকে বের হন। এছাড়াও তার রসমালাই ও ছানাবিক্রির দোকানটি ঠিক আছে কিনা দেখে আসা খুব প্রয়োজন। ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের কবলে পড়লে তিনি পথে বসবেন। অপরদিকে শেখ হাসিনার নির্দেশ ছিলো কারফিউতে দেখা মাত্র গুলি করার। পুলিশ, বিজিবি, র‌্যাব এবং আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র হাতে ওতপেতে বসে ছিলো রাজপথে। জালাল উদ্দিন কে দেখা মাত্র তারা গুলি ছোড়ে। তিনি ঐসময় মানিকনগর বিশ্বরোডে তার দোকান ঠিক আছে কিনা দেখার চেষ্টা করছিলেন। পুলিশের নিক্ষিপ্ত গুলি তার গায়ে এসে বিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরন করেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

গ্রামে ভিটেবাড়ি সংক্রান্ত ২ শতাংশ জমি আছে। শহীদ জালাল উদ্দিন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি ছিলেন। তিনি রসমালাই এবং সানা বিক্রি করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, তার মৃত্যুতে পরিবার এখন অসহায় অবস্থায় মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছে।

সংশোধিত/Corrected

ZTTEM

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Sakhipur Union Parishad
Bhedarganj, Shariatpur
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
30/07/2024	19838611486129042	30/07/2024

Date of Birth : 10/01/1983 Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ জালাল উদ্দিন	Name	: Md Jalal Uddin
মাতা	: ফাতেমা বেগম	Mother	: Fatema Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোহছন রাড়ী	Father	: Mohson Rari
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

26.9.2024
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Kabir Hossain
Secretary
Sakhipur Union Parishad
Sakhipur, Shariatpur
Mobile: 01721071609

26.07.24
Seal & Signature
Registrar
Kamruzzaman Manik Sardar
Chairman
Sakhipur Union Parishad
Sakhipur, Shariatpur.
Mob: 01733-014540

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: জালাল উদ্দিন
জন্ম	: ১০/০১/১৯৮৩
পেশা	: ব্যবসা
পিতা	: মোহছন রাড়ী
মাতা	: ফাতেমা বেগম
স্ত্রী	: মোছা: মলি
সন্তান	: ১. মোঃ সিজান (১২), ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মানিকনগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা ২. মো: শিহাব (৭)
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: আনু সরকার কান্দি, ওয়ার্ড নং ০৯, আনন্দ বাজার জামে মসজিদ কবরস্থান, সখিপুর, শরিয়তপুর
ঘটনার স্থান	: মানিকনগর, বিশ্বরোড, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: সন্ধ্যা ৭ টা
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০ জুলাই, সন্ধ্যা ৭ টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: আনন্দ বাজার জামে মসজিদ কবরস্থান

প্রস্তাবনা : ১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ শেখ রাকিব

ক্রমিক ৭২৬

আইডি ঢাকা বিভাগ : ১৩৮

অবিস্মরণীয় ইতিহাসের স্মরণীয় নক্ষত্র, জীবন যার ঈমান দীপ্ত

শহীদ পরিচিতি

শেখ রাকিব ২০০৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিভাগের নবাবগঞ্জ জেলার চুরাইন থানার কামারখোলা গ্রামের বাসিন্দা বাবা মিজানুর রহমান ওরফে হুমায়ুন কবির ও মা সুইটি আক্তারের ঘরে ২য় সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যরে ক্লেশ দূর করার জন্য বাবা মিজানুর রহমান ওরফে হুমায়ুন কবির বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু ভাগ্য সহায় না হওয়ায় দেশে কোনো অর্থ পাঠাতে ব্যর্থ হন। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় মা সুইটি আক্তার তার ছেলেদেরকে দাদীর কাছে রেখে কাজের সন্ধানে গাজীপুরে আসেন এবং গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। বড় ছেলে শেখ সাকিব এর বয়স তখন ১২ বছর। মায়ের কষ্ট সহ্য না করতে পেরে ১২ বছরের সাকিব তখন সংসারের হাল ধরেন। শেখ রাকিব খুব কাছে থেকে বড় ভাই এর এই কঠিন সংগ্রাম খেয়াল করেন। ছোট থেকে তাই চেষ্টা করতেন যতটা পারা যায় ভাই এর বোঝা কমাতে। ছোট্ট সাকিবের পক্ষে গাজীপুরে থেকে এতগুলো মুখে অন্ন তুলে দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই মা ও ছোট দুই ভাইকে পাঠিয়ে দেন নানার বাড়িতে। সেখানেই শেখ রাকিবের শৈশবের কিছু অংশ এবং কৈশোর কাটে।

৮ম শ্রেণী পাস করার পর পরিবারের হাল ধরার জন্য পড়ালেখা বাদ দিয়ে গাজীপুরে ভাইয়ের কাছে চলে আসেন। পরবর্তীতে তার সঙ্গে বাহরাইন যাওয়ার জন্য যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে এক ওয়েল্ডিং এর দোকানে কাজ শুরু করেন। সেখানে কাজ শিখে ২০২৪ সালে তার বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল। অনেক বেশি পড়ালেখা করতে না পারলেও তার অন্তরে ছিল পড়াশোনার প্রতি তীব্র ভালোবাসা। ছোট থেকে দারিদ্রতার তীব্র ক্লেশ দেখে বড় হওয়া রাকিব অত্যন্ত নরম হৃদয় ও শান্তশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বাবার সাথে বাহরাইনে গিয়ে নিজেদের দুঃখ দারিদ্রতা দূর করার কথা থাকলেও দেশের দুঃসময়ে তিনি ঘরে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি, নেমেছিলেন ছাত্র জনতার পক্ষে।

ঘটনার বিবরণ

স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে প্রশাসনের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্ত পর্যায়গুলো কলুষিত করার চেষ্টা করে। ভারতীয় দাস তৈরী করতে ধীরে ধীরে শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসাসহ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তবায়ন শুরু করে করোনা কালীন সময়ে ফুটে উঠে চরম অব্যবস্থাপনা। পূর্ববর্তী সময়ে প্রশ্ন ফাঁস, মুজিবকে দেবতা বানিয়ে সিলেবাস প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থায় সেক্যুলার নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে বই রচনা, ছাত্রলীগ কর্তৃক শিক্ষার পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটানো শেখ হাসিনার নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে। হাসপাতালগুলোতে রিকুইজিশন এবং টেন্ডারবাজির নামে টাকা লুট করে। উদাহরণস্বরূপ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের আইসিও বিভাগের একটি পর্দার দাম যেখানে ৩৭ লক্ষ টাকা আওয়ামীলীগের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও তার পুত্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেশবাসীকে ভারতে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করে।

স্বৈরাচার তার ডানা মেলে প্রশাসনেও পুলিশের অনেক বড় বড় অফিসার প্রকাশ্যে হাসিনার দোসর হিসেবে কাজ করা শুরু করে। এমনই একজন অফিসার 'তিন অপশন' খ্যাত কুষ্টিয়ার তৎকালীন এসপি এস এম তানভীর আরাফাত তার বক্তব্যে বিরোধী পক্ষগুলোকে 'তিনটি অপশন' দেন । তানভীর আরাফাত বলেন, 'এক. উল্টাপাল্টা করবা হাত ভেঙে দেব, জেল খাটতে হবে। দুই. একেবারে চুপ করে থাকবেন, দেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। তিন আপনার যদি বাংলাদেশ পছন্দ না হয়, তাহলে ইউ আর ওয়েলকাম টু গো ইউর পেয়ারা পাকিস্তান। 'এ বক্তব্য তখন তুমুল আলোচনায় আনে এসপি তানভীর এক সমাবেশে 'বালিশ ছাড়া শোওয়াইয়া দেব' বলেও ঘোষণা দেন, যেটা স্পষ্ট বিচারবহির্ভূত হত্যার হুমকি হাসিনা তার পুলিশ ও র‍্যাব টিমের মাধ্যমে গুম, খুন বাস্তবায়ন করতে থাকে। হাজার হাজার আওয়ামী বিরোধী গ্রেফতার হয় এবং চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।

২০২৪ সালে বাংলাদেশে কোটা আন্দোলন নতুন করে আলোচনায় আসে। তবে, ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলনটি ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। ২০১৮ সালের কোটা আন্দোলন ছিল সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের জন্য একটি বৃহৎ ছাত্র বিক্ষোভ, যা তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি করে। সেই আন্দোলন সফলভাবে কোটা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে, সরকারি চাকরিতে কোটা ৫৬% থেকে কমিয়ে ৩০% করা হয়। ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন বাংলাদেশে একটি ব্যাপক এবং শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, যা মূলত মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুরু হয়। ৫ জুন ২০২৪ তারিখে হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করলে এই আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ ও সমাবেশ শুরু করে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা কোটা পদ্ধতি পূর্ণরূপে বাতিল এবং ২০১৮ সালের কোটা সংস্কারের আদেশ পুনঃবহালের দাবি জানায়। ২-৬ জুলাই পর্যন্ত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীরা বিশেষত 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' শীর্ষক ব্যানারে বিক্ষোভ এবং মিছিল করে। ৪ জুলাই, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ৭-৮ জুলাই আন্দোলনকারীরা শহরের বিভিন্ন সড়কে সমাবেশ ডাকে। আন্দোলনকারীরা সরকারের কাছে একটি নতুন আইন প্রণয়নের দাবি জানায়, যাতে সব অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করা হয়। ১০ জুলাই সরকার আপিল বিভাগের আদেশ অনুসরণ করে কোটা বিষয়ে চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিলেও, আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি না পাওয়ার কারণে আন্দোলন আরো জোরালো হয়। এভাবে, কোটা আন্দোলন ২০২৪ এ এক কঠিন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির

সৃষ্টি করে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে পরিবর্তন দাবি করছে। ১২ জুলাই ২০২৪ তারিখে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে এবং ঢাকার বাইরে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। শিক্ষার্থীরা সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে এবং কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল বা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এদিন, সাবেক আইনমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি আন্দোলন চলতে থাকে, তবে সরকার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। তবে, বিক্ষোভকারীরা তা উপেক্ষা করে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, আন্দোলনকারীরা সরকারের কাছে এক দফা দাবি জানাচ্ছে–কোটা পদ্ধতির পুরোপুরি সংস্কার, এবং বিশেষ করে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা যাতে সমস্ত অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে, রাজশাহীতে শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করে তাদের বিক্ষোভ চালিয়ে যায়। সেইদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে এবং অভিযোগ করেন যে, **"মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।"** আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল কোটা পদ্ধতির সংস্কার, যা তাদের চোখে বৈষম্যহীন এবং যৌক্তিক হতে হবে। ১৪ জুলাই ২০২৪-এ, আন্দোলনকারীরা সব গ্রেডে কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে গণপদযাত্রা করে এবং রাষ্ট্রপতি বরাবর একটি স্মারকলিপি জমা দেন। কিন্তু, ওইদিন সন্ধ্যায় ততকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বিতর্কিত মন্তব্য আন্দোলনকারীদের প্রতি ছিল অত্যন্ত সমালোচিত। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে, তিনি আন্দোলনকারীদের **'রাজাকার'** বলে মন্তব্য করেন, যা ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে।

এই মন্তব্যের পর, রাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আরো জোরালো হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা **'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।'** দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এটি আন্দোলনের এক নতুন স্তরে পৌঁছায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে, এবং তাদের দাবির প্রতি আরও দৃঢ় অবস্থান গড়ে তোলে। এই পরিস্থিতি আন্দোলনকে আরো উত্তপ্ত করে তোলে, এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি একটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

২০২৪ সালের ১৫ জুলাই বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপরে ছাত্রলীগ অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ব্যপক সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সহিংস সংঘর্ষে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র, যুব ও স্বেচ্ছাসেবক শাখার সদস্যরা অংশগ্রহণ করে, যা আন্দোলনকারীদের ওপর অত্যন্ত সহিংসতা সৃষ্টি করে। সংঘর্ষের পরের দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনকারীরা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগসহ আওয়ামীলীগ সরকারের শোষণ-উৎপীড়ন বন্ধ করার দাবি জানাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ জুলাই বাংলাদেশের একযোগে ক্র্যাকডাউন শুরু হয় রাজধানী ঢাকাতে। পুলিশ, বিজিবিসহ আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যুদ্ধাস্ত্র সহকারে হেলিকপ্টারে করে সাধারণ নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপরে তীব্র বেগে গোলাগুলি শুরু করে। এই ঘটনা সারাদেশে সংঘটিত হয়। ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কের সামনেও ঘটে। আওয়ামীলীগ বাহিনীর তান্ডব রাকিব তার কাজের জায়গা থেকে দেখতে পান। তিনি এই নির্যাতন দেখে সহ্য করতে না পেরে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের সাথে রাস্তায় নেমে পড়েন। সে সময় সামনে থেকে আসা পুলিশের গুলিতে তিনি আহত হন। তার বন্ধু ও আশেপাশের আন্দোলনকারীরা তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেন এবং কুর্মিটোলা হসপিটালে নিয়ে যান। রাকিবের ভাই তৎক্ষণাৎ সংবাদ পেয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে লোকজনের কাছে সাহায্য চান কুর্মিটোলা হসপিটাল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। সেখানে মর্ডান হসপিটাল এর এক ডক্টর এবং এক অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার তাকে সাহায্য করেন। ঢাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাকে নিয়ে আসার। সে সময় শাকিব সরকারী বাহিনীর বর্বর হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করেন। পুলিশ তাদের এম্বুলেন্সের উপরে গোলা বারুদ নিক্ষেপ করে। দুপুরে রাকিবকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শাকিব সন্ধ্যার কিছু পরে গিয়ে উপস্থিত হন। রাকিব ততক্ষণে মারা গিয়েছিল। রাকিবের বন্ধু মর্গের বাইরেই অপেক্ষা করছিল কিন্তু হসপিটাল কর্তৃপক্ষ রাকিবের থাকার বিষয়ে নাকোচ করে দেন। যদিও পরে দেখা যায় রাকিব মর্গেই ছিল। শাকিব ফিউচার পার্কের বাসায় ড্রাইভার এর কাজ করতো বিধায় অবস্থা বেগতিক দেখে যমুনা গ্রুপের মালিক বাবুল সাহেবের স্ত্রীর কাছে ফোন দিয়ে তার সমস্যার কথা জানান। ঐ মুহুর্ত্বে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন যে তাদের মর্গে দুই জন আন্দোলনকারীর মৃতদেহ আছে।

তিনদিন ধরে রাকিবের মৃতদেহ বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পরে অবশেষে সোমবার শাকিব সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গ থেকে রাকিবের মৃতদেহ বুঝে পান। কিন্তু পুলিশের নির্দেশে মর্গ থেকে জানানো হয় যে, এক ঘন্টার মধ্যে দাফন করতে হবে। এসব কারনে লাশ নিজেদের গ্রামে নিয়ে যেতে পারেননি। রাকিবের শেষ ঠিকানা হয় গাজীপুরের কাশিমপুরের বরিশাইল্লা কবরস্থানে। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে, তবে সরকারী বাহিনীর সহিংস দমন-পীড়নের কারণে এটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ছাত্ররা একত্রিত হয়ে সারাদেশে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে থাকে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের শোষণ ও উৎপীড়ন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এর ফলে, ৪ আগস্ট ২০২৪ সারা দেশে ছাত্র জনতা রাস্তায় নামে এবং তাদের ওপর সরকারের বাহিনী গুলি চালায়, যা আন্দোলনকে আরও সহিংস করে তোলে।

রাকিবের মায়ের আর্তনাদ

আমার ছেলে হত্যার বিচার করবে কে

শেখ রাকিব

শিপন হাবীব

'আমার ছেলে যোগ দিয়েছিল ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। তার কোনো অপরাধ ছিল না, সে অপরাধীও নয়। সবার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে আন্দোলন করছিল। কিন্তু পুলিশ আমার নির্দোষ ছেলেকে নির্মমভাবে গুলি করে মেরেছে। আমার ছেলে হত্যার বিচার করবে কে? কে দেবে ক্ষতিপূরণ?' ছেলের ছবি বুকে নিয়ে আর্তনাদ করে জানতে চান শেখ রাকিবের (২৩) মা সুইটি আক্তার। বৃহস্পতিবার

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

আমার ছেলে হত্যার বিচার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দৈনিক যুগান্তরের কার্যালয়ে ছেলের একটি ছবি নিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সন্তানহারা অসহায় মা সুইটি আক্তার। তিনি বলেন, '১৯ জুলাই যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের রাস্তায় ছাত্র-জনতার মিছিলে রাকিবও যোগ দিয়েছিল। তখন বিকাল ৫টা। দুপুরের দিকে রাকিব ফোন করে বলেছিল, মা আন্দোলনে যাচ্ছি, চিন্তা করিও না—ভয় না, বীরের মতো বাঁচব।' কিন্তু বিকাল ৫টার পর পরিবারের কেউ আর রাকিবের খোঁজ পাচ্ছিলেন না। তার মোবাইল ফোনও বন্ধ ছিল।

বুক চাপড়ে মা বলেন, 'আমার সন্তানসহ লাখ লাখ ছাত্র-জনতা অধিকার আদায়ে লড়াই করেছে। সেই লড়াইয়ে পাখির মতো গুলি করে তাদের মারা হয়েছে। আমার বুক খালি করা হয়েছে। আমার শূন্য বুক কে পূরণ করবে?' এমন সব মায়ের আর্ত চিৎকারকে স্মরণ করে বাংলাদেশের তরুণ কবি সাজ্জাদ হোসাইন লিখেছেন, 'যে মায়ের চোখ, সমুদ্র শোক, কন্যার খাপ... যে মায়ের কোল, শূন্য আঁচল, তারে যাবে কীসে?'

শেখ রাকিব রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডের যমুনা-বসুন্ধরা সড়কের পাশের একটি ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে শ্রমিকের কাজ করতেন। তার গ্রামের বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জের কলাকোপা চুড়াইন গ্রামে। তার বাবার নাম মো. হুমায়ুন কবির ওরফে মিজানুর রহমান। অভাবের সংসারে রাকিব ছিলেন অন্যতম অবলম্বন। শ্রমিকের কাজ করে তিনি পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন। এখন রাকিব নেই, আর্থিক টানাপোড়েনে চলছে তাদের সংসার।

সুইটি আক্তার বলেন, '২৩ বছরের ছেলে আমার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলনে শহিদ হয়েছে। কিন্তু ছেলেকে কি এ দেশ, দেশের মানুষ মনে রাখবে? রাকিবের গলায়-বুকে একাধিক গুলি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর বন্ধু-সহপাঠীরা মিলে তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়েছে। হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই প্রাণ হারায় রাকিব। ওই দিন কিছুতেই রাকিবের লাশ পাওয়া গেল না। এক রকম জোর করেই তারা লাশ মর্গে ঢুকিয়ে ফেলে।'

তিনি বলেন, 'একদিকে ছেলের লাশ পড়ে আছে মর্গে। অন্যদিকে রাজধানীজুড়ে আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল হাসিনা সরকার।' ছেলের লাশ কিছুতেই দিচ্ছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ছেলের লাশ পেতে দিশেহারা হয়ে পড়েন রাকিব পরিবারের লোকজন। কোনো উপায় না পেয়ে অবশেষে তারা লাশ পেতে যোগাযোগ করেন যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের সঙ্গে। পারিবারিক জীবনে যে কোনো আপদ-বিপদে পড়লে—তার সঙ্গেই তারা যোগাযোগ করেন।

রাকিবের ভাই শেখ সাকিব যুগান্তরকে বলেন, 'হাসপাতাল থেকে যখন আমরা কোনোভাবেই লাশ বের করতে পারছিলাম না—তখন আমাদের এমপি অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এই সময় ম্যাডামের তার বড় মেয়ে দ্রুত কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল পরিচালক চিকিৎসক এবং ক্যান্টনমেন্ট থানা পুলিশকে বলে দেন। পরে ওই দিনই রাকিবের লাশ দ্রুত সময়ের মধ্যে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল থেকে শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নেওয়া হয়। ওই হাসপাতাল মর্গ থেকে রাকিবের লাশ হস্তান্তর করে ২২ জুলাই।'

মা সুইটি আক্তার বলেন, 'ছেলেকে সারা জীবনের মতো আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে খুনিরা। আমার মতো শত শত মা-বাবা সন্তানহারা হয়েছেন। অপেক্ষায় আছি, হয়তো কোনো এক ভোরে কোনো উপদেষ্টা বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কেউ ডেকে বলবে, শহিদ রাকিবের মা কি ঘরে আছেন—আমরা এসেছি।' নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলের হত্যাকারীকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়।' ছেলে হত্যার জন্য তিনি যথাযথ ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন।

এই আন্দোলন শেষে, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শোষণ এবং উৎপীড়নের অবসান ঘটে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়।

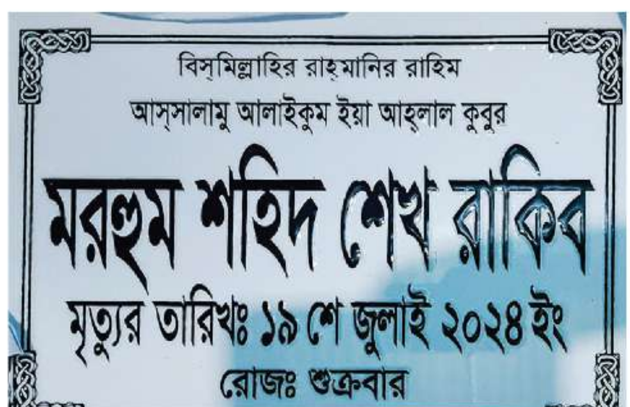

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়দের অনুভূতি :

শহীদের বাবা : 'আমার ছেলেটা আমার কলিজার টুকরা ছিল। এমন অসাধারণ সন্তানের জন্য আমি গর্ববোধ করি। আমি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি।'

শহীদের বড় ভাই : " আমার ভাই ছিল অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও ভীষণ বিনয়ী। কোনো ঝামেলার মধ্যে কখনও জড়ায়নি। ও এতো লাজুক ছিল যে আমার প্রতিবেশীরা মনে করত আমরা শুধু দুই ভাই। আমার ছোট ভাইটা একটু জেদ করে। কিন্তু রাকিব কখনো কোনো কিছুর জন্যই জিদ করেনি। আমার বাবা কিছু কারণবশত প্রবাস থেকে টাকা পাঠাতে পারতেন না এজন্য আমাকে ১২ বছর বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয় । ও আমাকে এত বুঝতো যে আমার কাছে কখনো মুখ ফুটে কোন কিছু চাইতো না এমন কি প্রয়োজনীয়

জিনিস আমি নিজেই কিনে দিতাম। ও আমাকে সাহায্য করার জন্য এবং সংসারের হাল ধরার জন্য বাবার সঙ্গে বিদেশে যেতে চেয়েছিল। আমার ছোট দুইটা বাচ্চাকে ও ভিষন ভালবাসতো। ছেলেটার সাইকেল চালানোর খুব শখ ছিল দেখে ও ওর বন্ধুর কাছে ৬০০০ টাকা ধার চেয়েছিল একটা সাইকেল কিনে দেয়ার জন্য। কিন্তু সাইকেল কিনে দেয়ার সময়টা আর পেল না। ও মারা যাওয়ার পরে ওর বন্ধুরা এসে আমাকে এইসব জানিয়েছে।

সাহায্য যদি কিছু করতে পারেন, আমাদের দেশে কামার খোলা রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ এ রাস্তাটা রাকিবের নামে করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক। নবাবগঞ্জ থানায় ডিসি অফিসে এই নিয়ে কথা হয়েছে আপনারা যদি একটু দেখতেন, আর স্যার আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আল্লাহ ভালো রাখছে।

শহীদের ছোট ভাই : ভাই আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমি কত জিদ করতাম, ভাই কোনদিন রাগ করেনি। তিনি অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। আমি আমার ভাইকে খুব মিস করি।

শহীদের বন্ধু : নিজের বন্ধু বলে বলছি না, ওর মতন মানুষ হয় না। আমাদের যে কারোর যেকোনো প্রয়োজনে ও সব সময় এগিয়ে আসতো। সব সময় কত চুপচাপ শান্ত হয়ে থাকতো, অথচ কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেনি। আমাদের জোর দাবি তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদি মর্যাদা দেয়া হোক।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Churain Union Parishad
Nawabganj, Dhaka
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration	Birth Registration Number	Date of Issuance
21/03/2024	20032616240124004	21/03/2024

Date of Birth : 02/02/2003 Sex : Male
In Word : Second of February Two Thousand Three

নাম	: শেখ রাকিব	Name	: Sheikh Rakib
মাতা	: সুইটি	Mother	: Sweeti
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ মিজানুর রহমান	Father	: Md Mizanur Rahman
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Dhaka, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: কামারখোলা চুড়াইন, চুড়াইন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা	Permanent Address	: Kamarkhola Churain, Churain, Nawabganj, Dhaka

21-03-2024

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Mohammad Ali

Seal & Signature
Registrar

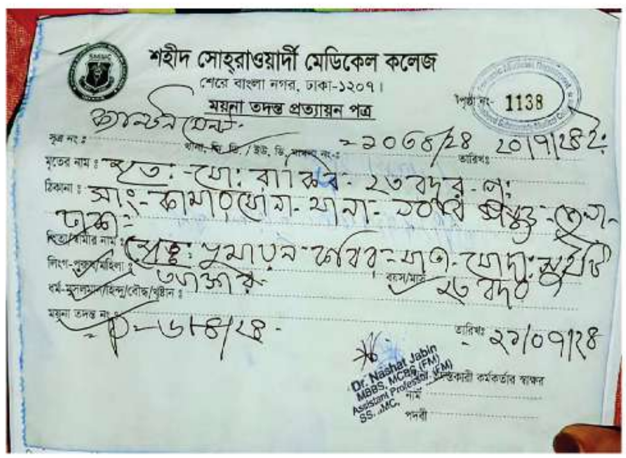

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ন পত্র
পৃষ্ঠা নং- 1138

সূত্র নং :
মৃতের নাম :
ঠিকানা :
পিতা/স্বামীর নাম :
লিংগ-পুরুষ/মহিলা :
ধর্ম-মুসলমান/হিন্দু/বৌদ্ধ/খৃষ্টান :
বয়স/মাস
ময়না তদন্ত নং :
তারিখঃ ২৭/০৭/২৪
Dr. Nashat Jabin
MBBS, MCPS (FM)
Assistant Professor (FM)
SS.MC.
তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম
পদবী

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: শেখ রাকিব
জন্ম	: ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৩
পেশা	: ওয়েল্ডিং কর্মী
মাসিক আয়	: ৮০০০
স্থায়ী ঠিকানা	: বিভাগ: ঢাকা, জেলা: নবাবগঞ্জ, থানা: চুরাইন গ্রাম: কামারখোলা
বর্তমান ঠিকানা	: জেলা: গাজীপুর, থানা: কালিয়াকৈর
অঞ্চল	: সফিপুর, মানজারমনিক, পাড়া: পশ্চিমপাড়া
পিতার নাম	: মিজানুর রহমান (ওরফে হুমায়ুন কবির)
পেশা	: প্রবাসী (বাহারাইন দেশে কর্মরত)
বয়স	: ৪৯ (০৫/০৬/৭৫)
মাতার নাম	: সুইটি
পেশা	: গৃহিণী
বয়স	: ৩৯ (১৩/০৫/৮৫)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৭ জন
ঘটনার স্থান	: যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ (গলায় গুলি করেছিল)
আহত হওয়ার সময়	: ১৭ জুলাই, দুপুর ২ ঘটিকা
নিহত হওয়ার তারিখ ও সময়	: ১৭/৭/২৪, দুপুর দুই ঘটিকা (ঘটনা স্থলে)
কবরস্থান	: গাজীপুর কাশিমপুর লস্কর চলা বরিশাইল্লা কবরস্থান
মৃত্যুর তারিখ	: ১৭/৭/২৪
মৃত্যুর স্থান	: যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে
কবরের অবস্থান	: গাজীপুর কাশিমপুর লস্কর চলা বরিশাইল্লা কবরস্থান, খুব ইচ্ছা ছিল নবাবগঞ্জ কামারখলা কবরস্থানে দেশের বাড়িতে কবর দেওয়ার, পারি নাই, নেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না
রাকিবের মৃত্যুর কারণ	: পুলিশ গলায় গুলি করছিল আমার ভাইয়ের দোষ ছিল শুধু ছাত্রদের সাথে দাঁড়িয়েছিল

এক জীবনব্যথিত সংগ্রামের কাহিনি

শহীদ বাবুল মিয়া

ক্রমিক: ৭২৭

আইডি: ঢাকা বিভাগ : ১৩৯

শহীদ পরিচিতি

২রা অক্টোবর ১৯৭৮ সালে বরগুনা জেলার তালতলী থানার ছোট বৌদি গ্রামের জাকির তাবুক পাড়ার পিতা মোহাম্মদ কাঞ্চন আলী ও মাতা রহিমা বেগমের হতদরিদ্র পরিবারে শহীদ বাবুল মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ৮ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। নিজ এলাকায় নিজেদের ভিটামাটি কিছুই ছিল না তাদের। তার বাবা বেশিদিন বাঁচেননি। তখন ছেলে সন্তান হওয়ায় পরিবারের দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে। তিনি একা হাতে ছোট দুই ভাই বোনকে মানুষ করেছেন। বোনের ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন। তার নিজেরো ২টি সন্তান আছে। তিনি জীবিকার জন্য বালুর ড্রেসারের কাজ করতেন। তিনি ছিলেন দিনমজুর, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

এমন একজন শহীদের কথা যখন ভাবি, তখন চোখের সামনে এক দৃশ্য ভেসে ওঠে, যা কখনো ভুলে যাওয়ার মতো নয়। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের এক শহীদ, যার নাম হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা হয়নি, কিন্তু তাঁর জীবন আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করবে। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ যিনি গরিব ঘরের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হিসেবে নিজের পরিবারের বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রতিটি দিন কাটাতেন। তাঁর পা ছিল ভাঙা–যেটি হয়তো তাঁর জীবনের এক বড় যন্ত্রণা, কিন্তু তিনি সেই যন্ত্রণা নিয়েই কাজ করতেন, সংসারের হাল ধরতেন। তার স্ত্রী সন্তানেরা দিনশেষে তাঁর কাছে অপেক্ষা করত। তাঁর বুকের মধ্যে এক অদম্য শক্তি ছিল–সেই শক্তি ছিল না শুধু নিজের জন্য, ছিল তাঁর পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য। সে দিনগুলো ছিল একটানা সংগ্রামের। প্রতিদিনের কঠিন জীবন সংগ্রাম তাকে মানিয়ে নিতে শিখিয়েছিল। যখন তার শরীরে শক্তি কমতে শুরু করেছিল, তখনও সে থেমে যায়নি। ভাঙা পায়ের যন্ত্রণাকে সে উপেক্ষা করেছিল, যেন তার পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য তার দেহ আর মনের মধ্যে কোনো বাধা না থাকে। তার স্বপ্ন ছিল, একদিন সে তার পরিবারকে এই শোকের, এই দারিদ্যের অন্ধকার থেকে বের করে আনবে, একদিন তার মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে। কিন্তু সে জানত না, তার জীবনের গল্প এখানেই থেমে যাবে। এই বাবুল মিয়া ছিলেন একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তার প্রতিটি কাজের মধ্যে এক ধরনের পবিত্রতা ছিল। তিনি কখনোই অন্যের প্রতি অবিচার করতেন না, কখনো নিজের সুখের জন্য অন্যের ক্ষতি করতে চাননি। তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল সৎ, সততা ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। এমনকি যখন তার পরিবার আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল, তখনো তিনি নিজের আয়ের একটি অংশ নিয়মিতভাবে সমাজসেবা ও দান-ধর্মের কাজে ব্যবহার করতেন। ধর্মীয় অনুভূতি এবং মূল্যবোধে গড়া এই পরহেজগার জীবন তাকে শুধু তার পরিবারেই নয়, সমগ্র সমাজে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে সাহায্য করেছিল। তার ধর্মীয় আনুগত্য, সততা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ।

যেদিন তিনি আন্দোলনে যোগ দিতে রাস্তায় বের হন তার চোখে ছিল এক আলোকিত আগ্রহ, এক স্বপ্ন–যে স্বপ্ন ছিল মানুষের অধিকার আদায়ের, দেশের পরিবর্তনের। তিনি জানতেন না, তার সেই পথচলা শেষ হয়ে যাবে। তিনি জানতেন না, তার বুকের মধ্যে যে অদম্য সাহস ছিল, তা শেষ মুহূর্তে গুলি হয়ে পড়বে তার শরীরে। তিনি জানতেন না, তার ক্ষতবিক্ষত শরীর, ভাঙা পা, বুকভরা স্বপ্ন কোনোদিন ফিরে আসবে না। তার চোখে ছিল মর্যাদার চোখ, ছিল নিজের দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু তিনি জানতেন না, তিনি যেই মুহূর্তে শহীদ হবেন, সেই মুহূর্তে তার পরিবার, তার সন্তানেরা এক অদৃশ্য শূন্যতায় হারিয়ে যাবে। তার মা কখনোই জানবে না, সে কেন আর ফিরে আসবে না। অথচ, তিনি যে স্বপ্ন দেখে গিয়েছিল, সেই স্বপ্ন ছিল সবার জন্য সমতা, অধিকার এবং ভালোবাসা। কিন্তু একদিন, তার এই স্বপ্নের পরিণতি হয়ে উঠল চিরতরে নিঃশেষিত এক জীবন। যখন তার রক্ত মাটিতে পড়ে, তখনও তার বুকের ভিতর কেবল একটি সুর ছিল–**"আমার দেশ, আমার মানুষ, আমার প্রিয়জনদের জন্য।"** যতটা দরিদ্র ছিলেন তিনি ততটাই ছিল তার স্বপ্নের পরিধি বড়। সেই শহীদ আজ আমাদের চোখের সামনে এক অদৃশ্য বার্তা রেখে গেছে–যে কোনো সংগ্রাম, যে কোনো আন্দোলন, যদি সত্যের জন্য হয়, তাহলে তার মর্মবেদনা, তার আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। তাঁর বুকফাটা চিৎকার, তাঁর নিরব কান্না আজও প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বাজছে, তিনি আজ আমাদের শিখিয়ে গেছেন, আসল সাহস কী, আসল ভালোবাসা কী।

অর্থনৈতিক অবস্থা

২রা অক্টোবর ১৯৭৮ সালে বরগুনা জেলার তালতলী থানার ছোট বৌদি গ্রামের জাকির তাবুক পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন শহীদ বাবুল মিয়া। তার বাবা মোহাম্মদ কাঞ্চন আলী ও মা রহিমা বেগম ছিলেন এক হতদরিদ্র পরিরাবারে বসবাসরত, যেখানে জীবনযাত্রার একমাত্র আশা ছিল কঠোর পরিশ্রম। বাবুল মিয়া ছিলেন ৮ ভাই-বোনের মধ্যে ষষ্ঠ, যার কাঁধে পড়েছিল জীবনের অশেষ ভার–তার পরিবারের ভাগ্য বদলানোর চ্যালেঞ্জ। নিজ এলাকাতে কোনো সচ্ছলতা ছিল না। ভিটেমাটি বলতে কিছুই ছিল না তাদের। বাবুলের বাবা বেশিদিন বাঁচেননি। একাকী, নির্যাতিত পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে বাবুল মিয়ার কাঁধে। জীবনের এক গভীর সংকটের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নেয়, তার পরিবারকে একদিন স্বাবলম্বী করবে। বাবুল মিয়া, নিজেকে কিছু মনে না করেই, ছোটো ভাই-বোনের প্রতি অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। বাবার হারানোর শোকেও সে স্থির থাকে, তেমনি, ছোট দুই ভাই-বোনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে থাকে প্রতিদিন। বড় ভাই বোনেরা ততদিনে নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

জীবন সংগ্রাম ছিল ভয়াবহ, কিন্তু বাবুল মিয়া কোনোদিন পিছপা হয়নি। তার জীবিকার একমাত্র মাধ্যম ছিল বালুর ড্রেসার কাজ। এই কাজ থেকে যা আয় হতো, তাতে তার পরিবারকে চালানোই কঠিন হয়ে পড়তো, কিন্তু বাবুল তার বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যায়। তার প্রতিদিনের জীবন ছিল এক কঠিন সংগ্রাম–একদিকে নিজের জীবন, আরেকদিকে তার পরিবারের দিকে তাকিয়ে, যেখানে ছোট ভাই-বোনেরা, বোনটির জন্য ভালো বিয়ে, নিজের তিনটি সন্তান–সব কিছুর দায়িত্ব তার কাঁধে ছিল।

তার নিজের জীবনকে কখনোই তুচ্ছ মনে করেনি সে, কিন্তু অন্যদের জন্য একটুও কষ্ট বয়ে নিতে দিতো না। বাবুলের সংগ্রামের দিনগুলো ছিল চিরকালীন কষ্টের–একদিকে খালি পকেট, অন্যদিকে অসীম দায়িত্বের বোঝা। অথচ, সে প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতো হাসিমুখে, তার পরিবারকে সম্মান ও ভালোবাসার সঙ্গে রক্ষা করার জন্য। তার নিজের সুখের পরিবর্তে, তার পরিবারকেই সে নিজের সুখ মনে করতো। যদিও কোনো দিন সুখের স্বাদ সে পায়নি, কিন্তু তার ছোট ভাই-বোনের হাসি, তার সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল তার জীবনের একমাত্র অনুপ্রেরণা। তার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে এখন গার্মেন্টসে কর্মরত আছে।

ঘটনার বিবরণ

বাংলাদেশ আওয়ামী শাসন আমলে আসলেই এক অত্যন্ত কঠিন বাস্তবতার মধ্যে ছিল, যেখানে জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা, এবং মানবাধিকার সব কিছুই লঙ্ঘিত হচ্ছিল। সরকার শুধু তাদের নিজের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য অপব্যবহার করেছিল রাষ্ট্রযন্ত্রকে, আর জনগণ, যারা সবসময় সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বীকার, প্রতিনিয়ত তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। প্রথমত, শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছিল। প্রশ্ন ফাঁস, পরীক্ষার পরিবেশের অধঃপতন, এবং শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রদের উপর শোষণ–এইসব এমন কিছু ঘটেছে যা কখনো কল্পনা করা হয়নি। ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় যেভাবে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা প্রমাণ করে যে সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হলো, শিক্ষামন্ত্রী এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানতেও চেয়েছেন না। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের পরিশ্রমের ফল না পেয়ে, হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা তো একেবারে নাজুক। একদিকে সরকারের উদাসীনতা, আরেকদিকে হাসপাতালের দুর্নীতি। ২০২১ সালে করোনাকালীন সময়ে যখন দেশের হাসপাতালগুলোতে ভরপুর রোগী, তখনও সরকার হাসপাতালগুলোর আসল প্রয়োজনের জায়গায় দাঁড়িয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। "রোগী না পেলেও টাকা চাই"–এ ধরনের অভিযোগ অহরহ শোনা গেছে। রাজধানী ঢাকা শহরের হাসপাতালে এক এক কেবিনের ভাড়া লাখ লাখ টাকা, অথচ চিকিৎসা সেবা নেই, বেডের জন্য রোগীদের হাহাকার। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি আজ একটি ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল। ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের নেতারা নিজেদের দখলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ছাত্রদের সাথে যে ধরনের আক্রমণ করা হয়েছে, তা ভয়াবহ। সে সময়, একজন ছাত্রকে প্রকাশ্যে পেটানো হয় শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক মতামতের জন্য। আবার, ছাত্রদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে হামলা চালানো হয়।

এভাবে দেশের প্রতিটি সেক্টরেই অরাজকতা, দুর্নীতি, এবং অবিচার চলছে। প্রশাসনের শোষণ প্রতিদিনই বেড়েই চলেছিল। পুলিশ, যারা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত,

তারা তখন সরকারের গোলাম হয়ে গিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধে সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মজার বিষয় হলো, সরকারের শীর্ষ পদে যারা আছেন, তারা এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন না। দেশে পুলিশের নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা যেন এখন এক নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরসিংদীতে ২০২৩ সালে এক নিরীহ ব্যক্তিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে, আর তার পর সরকার সেটি ঢাকতে একে একে গণমাধ্যম ও জনগণের চোখে ধুলো দেয়। সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালে কুষ্টিয়ায়, যেখানে পুলিশ একজন নিরীহ সাংবাদিককে অপহরণ করে। এই সাংবাদিকটি কোনো কিছু লেখার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালান, যা সরকার পছন্দ করেনি। তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এই ঘটনা সরকারের শাসনব্যবস্থার রক্তমাংস বের করে দেখিয়ে দেয়, যে তারা শুধু ক্ষমতাবাদী নয়, বরং জনগণের কণ্ঠকে শ্বাসরোধ করতে প্রস্তুত।

এভাবে আমাদের দেশের জনগণ এক এক করে তাদের মৌলিক অধিকার হারাচ্ছে। সরকার প্রতিটি মুহূর্তে জনগণের প্রতি তার দমন-পীড়ন এবং শোষণের শক্তি ব্যবহার করে যাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বেছে বেছে হয় গুম করে, না হয় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা হত। অনেক বিরোধী দলের নেতাকে চোখের সামনে মিথ্যা মামলা দিয়ে সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ মিথ্যাচার করেছিল। বিরোধীদলীয় নেত্রীকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করা, পুলিশ বাহিনীর দ্বারা বিরোধী দলের কর্মীদের গুলি করে হত্যা, এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া–এগুলো যেন হয়ে উঠেছিল প্রতিদিনের ঘটনা। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া, তথ্য প্রকাশের জন্যে শাস্তি প্রদান করা–এটি সরকারের প্রতিদিনের রুটিন। আমাদের দেশে আইন আর ন্যায়বিচারের কোনো মূল্য নেই; সরকারের শোষণ আর দমনপীড়নই একমাত্র রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে শুরু হওয়া কোটা আন্দোলন ছিল দেশের ছাত্র সমাজের একটি ঐতিহাসিক সংগ্রাম। মূলত সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে। তখন বাংলাদেশের সরকারি চাকরির ৫৬ শতাংশ পদ ছিল কোটা ভিত্তিক। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ পদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য, ১০ শতাংশ নারীদের জন্য, ১০ শতাংশ পিছিয়ে পড়া জেলা

জনগণের জন্য, ৫ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য এবং ১ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত ছিল। শিক্ষার্থীরা দাবি জানায়, কোটা সংস্কার করে শুধুমাত্র মেধাভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকারি চাকরিতে সকলের জন্য অভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করতে হবে।

২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে, শেখ হাসিনা সরকার কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখার ঘোষণা দেয়, যা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর পরপরই এপ্রিল ২০১৮ মাসে সারাদেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী আন্দোলনে যোগ দেয়, তারা ক্লাস বর্জন করে, মিছিল বের করে এবং মহাসড়ক অবরোধ করতে শুরু করে। আন্দোলনকারীরা তাদের দাবির প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় এবং সমাজের প্রতি ন্যায্যতার দাবি তোলে। এ আন্দোলনকে দমন করতে সরকার পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পাঠায়, যার ফলে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজধানী ঢাকার শাহবাগ মোড়ে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ ঘটে। এতে অন্তত ৭৫ জন আহত হন। ছাত্রদের উপর পুলিশি দমনপীড়ন এক চরম রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শাহবাগ মোড়সহ অন্যান্য এলাকাগুলো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা শান্তির বদলে ন্যায্যতা দাবি করছিল। এই অবস্থার মধ্যেই ১১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ততকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা ব্যবস্থার বিষয়ে এক চমকপ্রদ ঘোষণা দেন। তিনি জানান, কোটা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করা হচ্ছে এবং চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার এই ঘোষণা কোটা আন্দোলনকারীদের জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এই আন্দোলন দেশের ইতিহাসে শিক্ষার্থীদের সংগ্রামের এক অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ জুন থেকে বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনটি মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের রায় সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। হাইকোর্ট সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (নবম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রায় দেয়, যা সরকারিভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করে। ঢাকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ বাবুল মিয়া
Name: Md. Babul Mia
পিতা: মোঃ কাঞ্চন আলী
মাতা: মৃত রাহিমা বেগম
Date of Birth: 02 Oct 1978
ID NO: 2696402483821

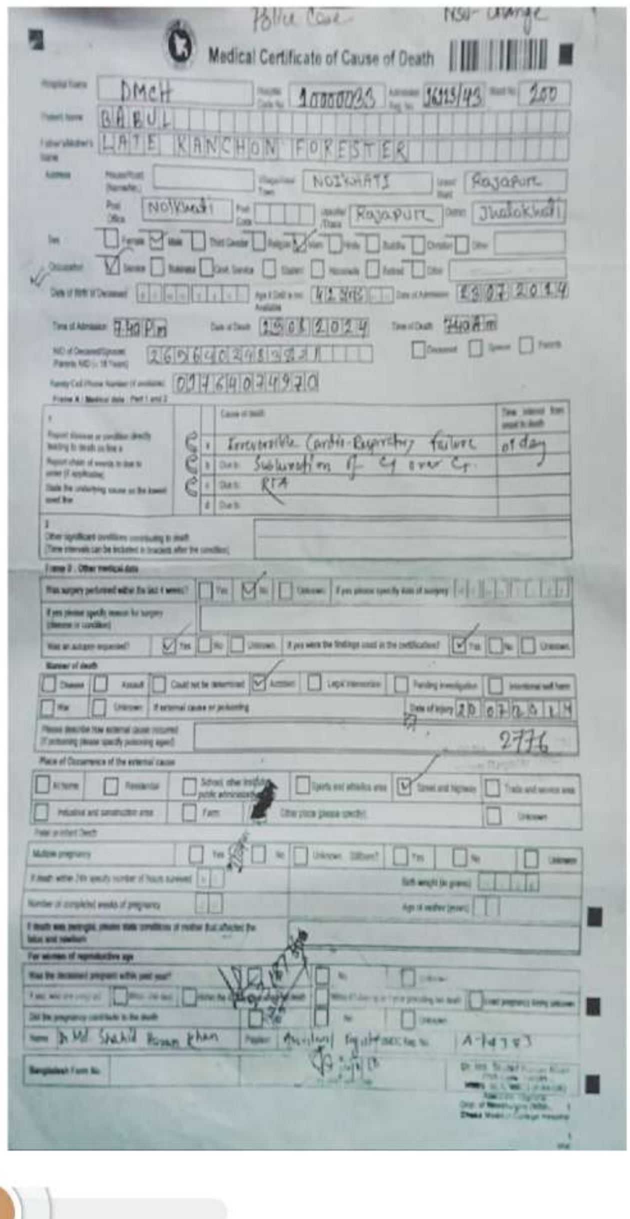

Police Case
Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH
Hospital Code No: 10000033
Admission Reg. No: 36113/43
Ward No: 200
Patient Name: BABUL
Father's/Mother's Name: LATE KANCHON FORESTER
Address: Village/Road/Town: NOIKHATI; Union/Ward: Rajapur; Post Office: Noikhati; Upazila/Thana: Rajapur; District: Jhalokhati
Sex: Male; Religion: Islam
Occupation: Service
Age: 42 yrs
Date of Admission: 23 07 2024
Time of Admission: 7.40 Pm
Date of Death: 25 07 2024
Time of Death: 4.40 Am
NID: 2696402483821
Family Cell Phone Number: 01764074970
Cause of death:
a. Irreversible Cardio-Respiratory failure — of day
b. Due to: Subluxation of C4 over C5
c. Due to: RTA

সামনে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে একটি প্রতিবাদী সমাবেশ আয়োজন করে। এরপর তারা শহীদ মিনারে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশও করে, যেখানে তাদের প্রধান দাবি ছিল, কোটা ব্যবস্থার সংস্কার এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা। এ আন্দোলনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এতে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আবারো তাদের ন্যায্য অধিকার এবং সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার হয়। তারা এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দাবি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চায় এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের আন্দোলন ছিল এক রক্তাক্ত এবং বেদনাময় অধ্যায়, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে সময়ে আন্দোলনকারীদের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এক অভূতপূর্ব যন্ত্রণা এবং সংগ্রামের চিত্র। এই আন্দোলনের এক-একটি দিন যেন বেদনাহত স্মৃতি, যা দেশের প্রতিটি পরিবার, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়ে গেছে।

২ জুলাই ২০২৪

এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এক সাধারণ আহ্বানের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের জন্য নিজেদের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামতে শুরু করে। প্রতিবাদ মিছিল এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মধ্যে প্রথমে কোনো বড় অশান্তি হয়নি, তবে সরকারের কর্তৃপক্ষ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে শুরু করে।

৫ জুলাই ২০২৪

এদিন আন্দোলনকারীদের ওপর প্রথম পুলিশি হামলা হয়, এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাস্তায় ছাত্রদের চিৎকার, শোরগোল এবং প্রতিবাদের মধ্যে পুলিশ বাহিনী গুলি চালাতে শুরু করে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই শতাধিক ছাত্র আহত হয়ে যায়। গুলি এবং লাঠিচার্জে রক্তে ভেসে যায় সড়কগুলো, শহরের প্রতিটি কোণায় ছিল শোকের ছায়া।

১০ জুলাই ২০২৪

আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত শাহবাগ, বেইলি রোড, মতিঝিল এলাকায় বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ বাহিনীর হামলা বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের ওপর আরও সহিংসতা চালানো হয়–লাঠিচার্জ, গুলি, এমনকি গাড়ি ভাঙচুর পর্যন্ত হয়। শিক্ষার্থীরা, যাদের অধিকাংশই যুবক এবং তরুণ, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলতে থাকে। মায়ের বুক ফেটে ওঠা কান্না, বাবার শূন্য চোখ, ভাইয়ের শোক–এগুলো ছিল আন্দোলনের প্রতিটি রক্তাক্ত মুহূর্তের চিত্র।

১৬ জুলাই ২০২৪

এদিনে আন্দোলনের চরম তীব্রতা দেখা যায়। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। তার মৃত্যু, শুধু রংপুর বা ঢাকা নয়, পুরো দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের জন্ম দেয়। সংবাদমাধ্যমে আবু সাঈদের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে, একে একে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীরা আরো বেশী করে রাস্তায় নেমে আসে। ছাত্ররা মিছিল, সমাবেশ, প্রতিবাদ অনুষ্ঠান শুরু করে এবং তাদের দাবি 'কোটা সংস্কার' বাস্তবায়ন করতে সরকারের প্রতি চাপ তৈরি করে।

২০ জুলাই ২০২৪

ঢাকার অভ্যন্তরে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। পুরো ঢাকা শহর জুড়ে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেদের দাবির পক্ষে বিক্ষোভ করতে থাকে। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ভেসে উঠতে থাকে। পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের ওপর আবারো অত্যাধিক বল প্রয়োগ করে–লাঠিচার্জ, গুলি, কাঁদানে গ্যাস। রাস্তায় পড়েছিল রক্তের স্রোত, মানুষ ছিল বিক্ষুব্ধ, শোকাহত, ক্ষুব্ধ। ঐদিন শহরগুলো যেন এক অদৃশ্য শূন্যতায় ঢেকে যেত, যেখানে শুধু ছিল মৃত্যু, কান্না এবং অসহায়ত্বের নিঃশব্দ আওয়াজ। ১৮ জুলাই শহীদ বাবুল মিয়া বাসা থেকে

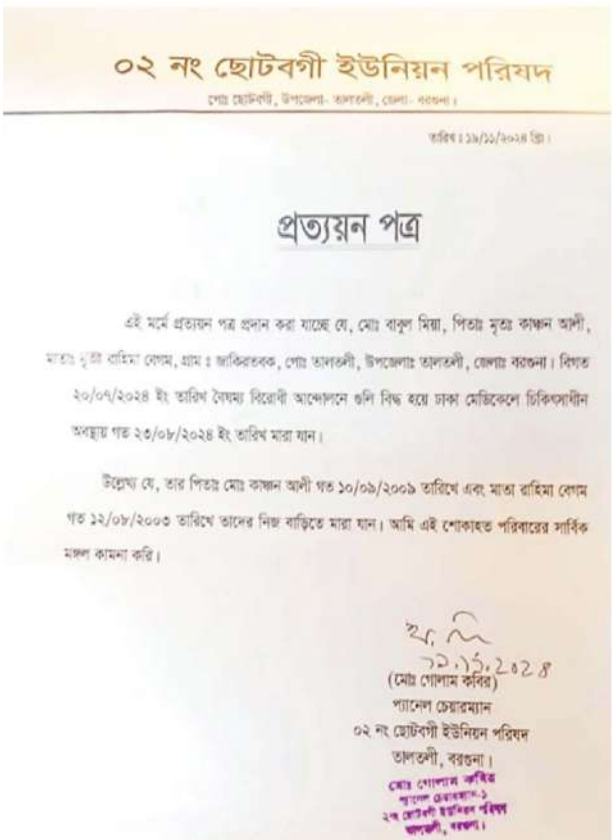

০২ নং ছোটবগী ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখ: ১৯/১১/২০২৪ খ্রি:।

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা যাচ্ছে যে, মোঃ বাবুল মিয়া, পিতাঃ মৃতঃ কাঞ্চন আলী, মাতাঃ মৃতঃ রহিমা বেগম, গ্রাম: জাকিরতবক, পোঃ তালতলী, উপজেলাঃ তালতলী, জেলাঃ বরগুনা। বিগত ২০/০৭/২০২৪ ইং তারিখ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে গুলি বিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৩/০৮/২০২৪ ইং তারিখ মারা যান।

উল্লেখ্য যে, তার পিতাঃ মোঃ কাঞ্চন আলী গত ১০/০৯/২০০৯ তারিখে এবং মাতা রহিমা বেগম গত ১২/০৮/২০০৩ তারিখে তাদের নিজ বাড়িতে মারা যান। আমি এই শোকাহত পরিবারের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

১৯.১১.২০২৪

(মোঃ গোলাম কবির)
প্যানেল চেয়ারম্যান
০২ নং ছোটবগী ইউনিয়ন পরিষদ
তালতলী, বরগুনা।

সাভারের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু সেখানে আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে আহত হন। তখন আন্দোলনকারীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাবস্থা করেন। তার কিছুদিন আগেই বালির ড্রেসারে কাজের সময় তিনি পায়ে আঘাত পান ও পঙ্গু হয়ে যান। তাই গুলি লাগার পরে তার শারিরীক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। তাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ মাস ৩ দিন পরে ২৩ আগস্ট তিনি মারা যান। কিন্তু তার মৃত্যু যেন তার সংগ্রামের শেষ নয়। বরং, তার জীবন, তার পরহেজগার মনোভাব, তার সৎ ও পবিত্র জীবনযাত্রা আজও আমাদের জন্য একটি শিক্ষা হয়ে থাকবে। বাবুল মিয়া শুধু একজন পরহেজগার মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যিনি একে অপরের জন্য সবকিছু দিয়েছিলেন, যার জীবন ছিল সমাজের সেবায় নিবেদিত। তাকে তালতলি গ্রামের গোরস্থানে কবরস্থ করা হয়।

শহীদের সম্পর্কে নিকট আত্নীয়দের অনুভূতি:

শহীদের স্ত্রী: "আমার তো আর কেউ রইলোনা বাবা। তিনি ছিলেন বটবৃক্ষের মত। তার কোন বাজে সভাব আছিলো না। পরিবার অন্ত প্রাণ ছিলেন। মানুষের একটা উপকার করেছে ছাড়া কোনোদিন ক্ষতি করেন নাই।"

শহীদের বড় ছেলে: "আমার আব্বা যতদিন ছিলেন সংসারের কঠিন কষ্ট ওত বুঝিনি। আমাকে সারাজীবন আদর্শের শিক্ষা দিয়েছেন। আজ আব্বা নেই, দুনিয়া আমার ওপর কঠিনভাবে চেপে বসেছে মনে হয়।"

শহীদের মেয়ে: "আমার আব্বা যে নাই। আমার আব্বাকে তো কেউ আর এনে দিতে পারবে না। আমারে আর কেউ মা কয়ে ডাকবে না।"

শহীদের ছোট বোন: "আমার ভাই সহজ সরল ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কারো সাতে প্যাঁচে যেতেন না। দয়ালু মানুষ ছিলেন।"

প্রতিবেশী: "উনি মানুষ ভালো ছিলেন।গরীব মানুষ ছিলেন কিন্তু তার সাথে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে একটা কাজ করা যেত।"

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: বাবুল মিয়া
জন্ম	: ০২/১০/১৯৭৮
পেশা	: বালির উত্তোলন কর্মী
মাসিক আয়	: ১৫,০০০ টাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা: বরগুনা, থানা: তালতলী, ইউনিয়ন: ছোট বগি, গ্রাম: জাকির তাবুক
বর্তমান ঠিকানা	: জেলা: বরগুনা, থানা: তালতলী, ইউনিয়ন: ছোট বগি, গ্রাম: জাকির তাবুক
পিতার নাম	: মো: কাঞ্চন আলী
পেশা	: মৃত
মাতার নাম	: রহিমা বেগম
পেশা	: মৃত
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন (স্ত্রী: রাজিয়া বেগম (৩৪)/ গৃহিণী, ছেলে: মো: হাসান/গার্মেন্টস কর্মী (১৯); মেয়ে: মোছা: তামান্না (১৪)/অষ্টম শ্রেণী)
আক্রমণের স্থান	: সাভার
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার দিন ও তারিখ	: ১৮ জুলাই
নিহত হওয়ার দিন ও তারিখ	: ২৩ আগস্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
কবরস্থান	: তালতলি

শহীদ মোঃ রাসেল

ক্রম: ৭২৮

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৪০

শহীদ পরিচিতি

বাবা মায়ের মুখ আলোকিত করে ২০০৫ সালের ১৭ জুলাই নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা থানার বাউসি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন একটি নবজাতক। তিনি ছিলেন মোঃ রাসেল। তিন ভাই বোনের মধ্যে রাসেল ছিলেন সবার ছোট। বাবা মোঃ মুন্সি মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন। এমতাবস্থায় মমতাময়ী মা কঠোর পরিশ্রম করে লালন পালন করেন তার তিন সন্তানকে। এভাবে অভাব অনটনে কোন রকমে চলে যায় তাদের সংসার। দিনে দিনে বড় হয় এই তিন ভাই বোন। বড়ভাই কওছার মিয়া পেশায় একজন শ্রমিক। রাসেল মিয়াকে ও সংসারের টানাপোড়েনের জন্য খুব অল্প বয়সে সংসারের হাল ধরতে হয়। তিনি নম্র, ভদ্র এবং পরোপকারী ছিলেন। গ্রামের সবার বিপদে আপদে আগে ছুটে যেতন।

যেভাবে শহীদ হলেন

জুলাই ২০২৪ জুড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনে সারাদেশ ছিল উত্তাল। আর এই আন্দোলনে শুরু থেকেই রাসেল মিয়া ছিলেন সরব। তিনি মুখ বুঝে বসে না থেকে আন্দোলনের শুরু থেকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তিনি ভাবতেন, সরকার যেন এই কোটা সংস্কারের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মেধাবীদের চাকরি পাওয়ার পথ সুগম করেন। পরবর্তীতে এই আন্দোলন যখন সরকার পতনের দিকে ধাবিত হলো তখন রাসেল আরো সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যুক্ত হলেন। তিনি মনে করতেন যেভাবে হোক দেশের মানুষকে স্বৈরাচারী সরকার থেকে বাঁচাতেই হবে। এরই পথ ধরে আন্দোলনে অংশ নিতে ৪ আগস্ট ২০২৪ সকাল ১০টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে যোগদান করেন প্রতিবাদী সমাবেশ। জুলাই জুড়ে খুনি হাসিনার চাটুকার ও সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে ছাত্র-জনতার একাংশ ছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। তারা এদিন খালি হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে পড়ে অনেকস্থানে পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভয়াবহতা অনুভব করে হাসিনার গডফাদারেরা একে একে দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। পরদিন ৫ আগস্ট মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচীতে জনতা রাস্তায় নেমে আসে। রাসেল নিজেও হাসিনা খেদাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দুপুর ১ টা ৫০ এর দিকে বিজয় মিছিলে যোগদান করেন রাসেল। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, বিজয়ের এ স্বাদ বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারেননি তিনি। মিছিলের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলির মুখে পড়েন রাসেল। একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয় তার চোখে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাটিতে ঢলে পড়েন এই যুবক। আশপাশের কিছু জনতা তখন আহত অবস্থায় রাসেলকে হাসপাতালে নিয়ে যান বিকাল ৪:৩০ টার দিকে। কিন্তু বিধিবাম , ঐ দিনেই রাত ১১ টার দিকে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহকালের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পড়ি জমান এই যুবক। শহীদ হলেন মো: রাসেল মিয়া, ঝরে গেলো আরো একটি তাজা প্রাণ। খালি হলো আরো একটি মাতাপিতার কোল। এইসব তাজা প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হলো ঠিকই কিন্তু সেই মুক্ত দেশের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি দেশের এই বীর সন্তানরা।

তারই জন্য কবি হয়তো লিখেছিলেন-

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রান যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

কেমন আছে শহীদ রাসেলের পরিবার

রাসেলের বাবা মুন্সি মিয়া একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি। তার উপর পরিবারের ছোট সন্তানকে হারিয়ে পাগল প্রায় মমতাময়ী মা কুলসুম আক্তার। শোকে কাতর তার বড় ভাই বোনেরা। বাড়ির সমস্ত আঙ্গিনা জুড়ে তারা রাসেলের স্মৃতি দেখতে পায়। রাসেলের শোকে তারা দিশেহারা। দুই ছেলের উপার্জনে সংসার চালাতেন কুলসুম আক্তার। ছোট ছেলেকে হারিয়ে বড় ছেলে কওসার মিয়াই একমাত্র ভরসা। পাড়াপড়শিরা তাদের বিপদে পাশে থাকার বন্ধুকে হারিয়ে শোকে কাতর। জীবন শুরু হওয়ার আগেই হারিয়ে গেলো সম্ভাবনাময় একটি নিষ্পাপ প্রাণ।

প্রতিবেশি ও স্বজনদের অনুভূতি

কর্মের কারণে পৃথিবীতে মানুষ অমর হয়। মানুষ চলে গেলেও থেকে যায় তার কর্ম। তেমনি মৃত্যুর পরেও শহীদ রাসেল মিয়া অমর। এলাকাবাসীর মুখে মুখে আজও তার সম্পর্কে বন্দনা। শহিদ রাসেল সম্পর্কে তার এক প্রতিবেশী শেখ নেয়াজ বলেন- **"খুব মানবিক, ভদ্র ও নম্র ছিলো সে। পরিবারের ছোট সন্তান হিসেবে অনেক দায়িত্বশীল ছিল সে। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করতো সে।"**

তার ফুফাতো ভাই বলেন-

" রাসেল নামাজী ছিলেন এবং সে অত্যন্ত নম্র ভদ্র একটা ছেলে ছিলেন।"

রাসেল সম্পর্কে জানতে চাইলে তার চাচাতো ভাই আরও বলেন-
"তার ভেতরে প্রবল মনুষত্ব্য ছিলো। সে অন্যের বিপদকে নিজের মনে করে সবার আগে ছুটে যেতো।"

সর্বোপরি মহৎ হৃদয়ের মানুষেরা বুঝি এমনই হয়, মহাকাল তাদেরকে অমর করে রাখে। তেমনি শহীদ রাসেল মিয়ার মতো মহৎ মানুষেরা পৃথিবীতে আসে স্বল্প সময়ের জন্য কিন্তু ফেলে রেখে যায় দীর্ঘ পদচিহ্ন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে তাঁর এই অবদান জাতি আজীবন মনে রাখবেন। মহান আল্লাহ তাঁর শাহাদাতকে কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুক (আমিন)।

প্রস্তাবনা

১. বড় ভাইয়ের চাকরির ব্যবস্থা করা
২. তাদের থাকার জন্য স্থায়ী বাড়ির ব্যবস্থা করা
৩. বাবার চিকিৎসার খরচ বহন করা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত রাসেলের শেষ উক্তি

এদের প্রতিহত করব, না হয় মরে যাব

বারহাট্টা (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পায়ে দুটি গুলি খেয়েও অনড় ছিলেন ১৯ বছরের যুবক রাসেল। পরে মাথায় গুলি করে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করে বিজিবির সদস্যরা। গত ৫ আগস্ট গাজীপুরের শ্রীপুর থানার মাওনা চৌরাস্তায় ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছে যুবকের বোন জামাই মো. শামীম মিয়া। আহত যুবককে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গাজীপুরের আল হেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারা চিকিৎসা না দিয়ে ঝামেলা আছে বলে বিদায় করে দেয়। এরপর তাকে নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে যায়। সেখানে রাত ১১ ঘটিকায় অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করে। এরপর পোস্টমর্টেম করার জন্য টাকা দাবি করে চাপ সৃষ্টি করে চিকিৎসকরা। নিহতের বোন জামাই শামীম মিয়া ডাক্তারদের বলেন সে গুলি খেয়ে শহীদ হয়েছে। পোস্টমর্টেম করব না। একপর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতৃবৃন্দ নিহতের লাশটি উদ্ধার করে গাড়িতে তুলে দেয়। রাসেল মিয়া নেত্রকোনা বারহাট্টা উপজেলা বাউসী ইউনিয়নের সুসং ডহরপাড়া গ্রামের মুন্সি মিয়া ওরফে নূরুল ইসলামের ছোট ছেলে। মুন্সি মিয়ার বাড়ি বারহাট্টায় হলেও ১৫ বছরের চেয়ে বেশি সময় ধরে তিনি ঢাকায় থাকেন। নূরুল ইসলাম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হলেও পেটের ক্ষুধা মেটাতে ঢাকায় রিকশা চালান। আর নিহত রাসেল সংসারের হাল ধরতে গার্মেন্টসে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে জানিয়েছে তার বোন জামাই শামীম মিয়া। তিনি বলেন আমি তাকে নিয়ে একসাথে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েও সে রাস্তা ছাড়েনি। এরপর তারা (বিজিবি) আমার শ্যালককে মাথায় গুলি করে। আমি তাকে হাসপাতালে নেয়ার সময় রাসেল আমার হাতটিতে শক্ত করে ধরে রেখেছিল, এছাড়া কোনো কথা বলতে পারছিল না। ৫ আগস্ট আন্দোলনে মৃত্যুর আগে প্রথমেই পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর সবাই তাকে বলে তুমি হাসপাতালে যাও। সে বলে আমি এখান থেকে যাব না। এদেরকে (বিজিবি) প্রতিহত করবো, না হয় মরে যাব। পরক্ষণেই তার চোখের উপরে মাথায় একটি গুলি লাগলে সে মাটিতে পড়ে যায়। ডহরপাড়া গ্রামের মনোয়ার হোসেন বলেন রাসেলের বাবা-মা অনেকদিন আগে থেকেই ঢাকায় থাকে। গ্রামে তার ভিটামাটি বলতে কিছুই নেই। ৬ আগস্ট সকালে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তার চাচা কামরান হোসেন দুদু মিয়ার জায়গায় রাসেলকে কবর দেয়া হয়। এভাবেই এক সময় অনেক বীরের পরিচয় মিটে যাবে বলে মনে করেন মনোয়ার হোসেন। কারণ এখন পর্যন্ত অসহায় এ পরিবারের খবর প্রশাসনের কেউ নেয়নি। বারহাট্টা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির বলেন এ মৃত্যুর ঘটনাটি আমরা শুনেছি। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পরামর্শে এ পরিবারকেও সহযোগিতা করা হবে।

রাসেল মিয়া

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Baushi Union Parishad
Barhatta, Netrokona
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 28/11/2024
Death Registration Number 20057210935019889
Date of Issuance 28/11/2024

Date of Birth : 12/07/2005
Date of Death : 05/08/2024
in Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four
Sex : Male

নাম	মোঃ রাসেল	Name	Md Rasel
মাতা	মোসাঃ কুলসুমা আক্তার	Mother	Mst Kulsuma Akter
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
পিতা	মোঃ মুন্সী মিয়া	Father	Md Munshi Mia
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	নেত্রকোণা, বাংলাদেশ	Place of Death	Netrokona, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	হত্যা	Cause of Death	Murder

28.11.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

28.11.24

28.11.24
Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

1/27/25, 7:16 PM 'এদের প্রতিহত করব, না হয় মরে যাব' | কালবেলা

দৈনিক কালবেলা

সারাদেশ

বারহাট্টা (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
প্রকাশ : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ০৩:৩১ পিএম
অনলাইন সংস্করণ

'এদের প্রতিহত করব, না হয় মরে যাব'

আন্দোলনে নিহত রাসেল মিয়া। ছবি : সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পায়ে দুটি গুলি খেয়েও অনড় ছিল ১৯ বছরের রাসেল মিয়া। পরে মাথায় গুলি লাগে তার। গত ৫ আগস্ট বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গাজীপুরের শ্রীপুর থানার মাওনা চৌরাস্তায় ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন রাসেলের বড় বোনজামাই মো. শামীম মিয়া।

আহত রাসেলকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গাজীপুরের আল হেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারা চিকিৎসা না দিয়ে ঝামেলা আছে বলে বিদায় করে দেয়। এরপর তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত ১১টায় অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করে।

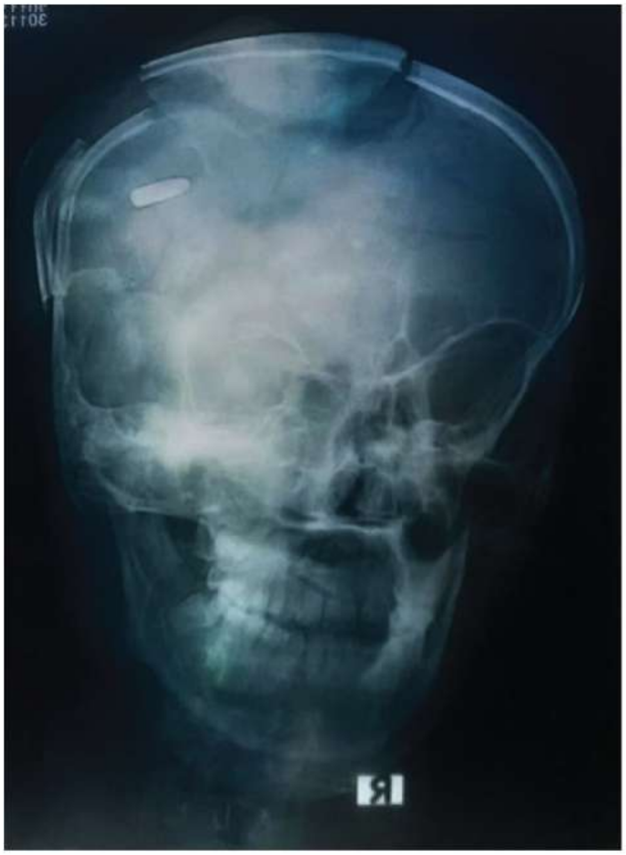

এক নজরে শহীদ মো: রাসেল

নাম	: মো: রাসেল
পেশা	: শ্রমিক, রিক্সা চালক
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১২/০৭/২০০৫
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক রাত ১১ টা
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে-সুন্দর পাড়া
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সুন্দর পাড়া, থানা/উপজেলা: বারহাট্টা, জেলা: নেত্রকোনা
কারেন্ট এড্রেস	: এমসি বাজার, মাওনা, গাজিপুর
পিতা	: মো: মুন্সি মিয়া
মাতা	: মোসা: কুলসুম আক্তার
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: নিজস্ব সম্পদ বলতে ভিটা বাড়ি ছাড়া কিছুই নেই
ভাইবোনের বিবরণ	: ২ জন আশা মনি (২১) এবং কাওসার মিয়া ২০

ডাক্তাররা জানায়-
"আপনাদের ছেলে আর বেঁচে নেই, ছেলের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, চিৎকার করে বারবার বলছিলাম ওর হার্ট চলছে।"

শহীদ মোস্তফা জামান সমুদ্র

ক্রমিক: ৭২৯

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৪১

শহীদ পরিচিতি

আজ এক অনন্যগাঁথা নিয়ে লিখতে বসেছি। আজ লিখব এক সাহসী সৈনিকের গল্প। যিনি জুলাই ২৪ এর ফ্যাসিবাদী আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন। গত ১৯ জুলাই ২০২৪ ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন মোস্তফা জামান সমুদ্র। চলতি বছর ঢাকার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ-৪.৯৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করা এই তরুণ আমাদের জন্য প্রেরনা। তাঁর জীবনের পথচলা কেবল মাত্র অধ্যায় নয় বরং একটি চেতনা। যা আমাদের মানবিক মূল্যবোধ এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করতে শেখায়। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সমুদ্র ছিলেন সবার ছোট। বড় ভাই মোর্শেদুজ্জামান পিএইচডি করে জাপানে আছেন। বোন মিরানা জামান স্বামীর সঙ্গে ফিনল্যান্ডে বসবাস করছেন। ছোট থেকে সমুদ্র স্বপ্ন দেখতেন দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। একজন সফল উদ্যোক্তা হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন। তবে সব স্বপ্ন আওয়ামী হায়েনারা চুরমার করে দিয়েছে। মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামে মনিরুজ্জামান তাজুল ও মাসুদা জামানের কোল আলোকিত করে ২০০৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন সমুদ্র। তিনি যেদিন শাহাদাত বরণ করেন ঠিক তার একদিন পরে সিদ্বেশ্বরী কলেজে তাঁর ভর্তির কথা ছিল। কিন্তু তাঁকে দাফনের জন্য নেওয়া হলো মুন্সিগঞ্জে। সমুদ্র'র পিতা বলেন, "সিদ্বেশ্বরী কলেজ থেকে ভর্তি ফরম নিয়ে এসেছিলাম। রবিবার ভর্তির কথা ছিল। কিন্তু ছেলেটা শুক্রবারেই মারা গেল"। ছেলের মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে ঢাকার রামপুরায় মহানগর প্রজেক্টের ভাঁড়া বাসা ছেড়ে পরিবার নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছেন শহীদ পরিবারটি।

শাহাদাতের স্মৃতিপট

সন্তানের শাহাদাতের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর পিতা জনাব মনিরুজ্জামান তাজুল। তিনি বলেন-

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই মোস্তফা জামান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গত ১৯ জুলাই সকালে বাসা থেকে সহপাঠীদের সঙ্গে রামপুরায় ডিআইটি রোডে নেমে আসে। বেলা ৩টায় আমি জুমার নামাজ শেষে বাসায় এসে ভাত খেতে বসি। আর সমুদ্রের মা নামাজে দাঁড়ায়। বারবার আমি সমুদ্রর ফোনে কল করছিলাম। একপর্যায়ে ওর বন্ধু আরাফাত কল রিসিভ করে জানায়, " সমুদ্র পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ডেলটা হাসপাতাল আছে। তাড়াতাড়ি এখানে আসেন।" ও সেদিন বলতে পারেনি আমার ছেলে মারা গিয়েছে। খাবার ফেলে দৌড়ে রাস্তায় গোলাগুলি উপেক্ষা করে ওর আম্মু আর আমি ডেলটা হাসপাতাল গিয়ে দেখি পাঁজরে গুলিবিদ্ধ আমার ছেলে খালি গায়ে মেঝেতে পড়ে আছে। ডাক্তাররা জানায়, আমাদের ছেলে আর বেঁচে নেই। ছেলের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। চিৎকার করে বারবার বলছিলাম ওর হার্ট চলছে। ওর শরীর এখনো গরম আছে। সর্বশেষ ওকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে বেটার লাইফ হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানেও ডাক্তাররা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দেন আমার ছেলে আর বেঁচে নেই। তারা বলেন- একটি বুলেট সমুদ্রের হাত ভেদ করে পাঁজরে ঢুকে যায়। এর ফলে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হয়ে সে মারা যায়। সেদিন রাতেই নিজ গ্রামে এনে জানাজা শেষে দাফন করি তাকে। এর আগের দিন সমুদ্র আন্দোলনে গিয়ে পায়ে ছররা গুলিবিদ্ধ হয়ে বাসায় আসে। ঘটনার দিন নিষেধ করেছিলাম বাইরে যেতে। তার পরও সকালে বন্ধুদের সঙ্গে সে রাজপথে নেমে আসে।

প্রিয়জনদের অনুভূতি

ছেলে হারানোর শোকের মধ্যেও আতঙ্ক কাটছে না শহীদ সমুদ্রর বাবা মনিরুজ্জামান তাজুলের। নতুন করে আর কোনো ঝামেলায় পড়তে চান না তাঁর পরিবার। তিনি বলেন, " ছেলে ফিরে পাব না। আমরা আর কোনো ঝামেলায় পড়তে চাই না। কারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আদরের সন্তান দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। ছেলের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি যেন দেওয়া হয়। সরকার যেন সব শহীদকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়। আমার ছেলে মোস্তফা জামান সমুদ্র বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক ছিল। সমুদ্র দেশের জন্য জীবন দিয়ে শহীদ হয়েছে। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় সপ্তম শ্রেণিতে পড়তাম। সে সময় যুদ্ধ দেখিনি। তবে ঢাকার সদরঘাটে ৮ থেকে ১০ জনের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখেছিলাম। সহ্য করতে না পেরে গ্রামের বাড়ি চলে এসেছিলাম। ১৯ জুলাইও যুদ্ধ দেখেছি। নিজের ছেলেসহ একসঙ্গে হাসপাতালে লাশের দীর্ঘ সারি দেখেছি। মা-বাবা-স্বজনদের আহাজারি দেখেছি।"

শহীদ মাতা মাসুদা জামান বলেন-

" সমুদ্র সকালে বলে যায় জুমার নামাজ পড়ে বাসায় এসে দুপুরের ভাত খাবে। আমি ভাত বেড়ে সন্তানের অপেক্ষায় থাকি। দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে ফোন করে সমুদ্রকে বাসায় খেতে আসতে বলি। সে দুই মিনিট পরে আসার কথা বলে। দুপুর গড়িয়ে যায়। সমুদ্র বাসায় আসে না। টেবিলে ভাত বেড়ে আমি নামাজ পড়তে যাই। নামাজ পড়াবস্থায় ফোন আসে সমুদ্র গুলি খেয়েছে। অশ্রুসজল এই মা এখনও চোখের পানি ফেলেন আর বলেন, আমার বাবা আর ভাত খেতে আসে না। আমি অপেক্ষায় থাকি। আমার অপেক্ষা শেষ হয় না। ওকে গুলি করা হয়েছে। আমরা বিচার চাই না। আমার ছেলে মারা গিয়েছে। আমরা তাকে ফিরে পাব না। বিচার চেয়ে আর কী লাভ হবে! "

নিউজ লিংক

1 . https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/quota-protest/news-601091

2. https://reformbangladesh.net/martyrs/‡gv¯Ídv-Rvgvb-mgy`ª/

3. https://andolon.com/martyr/‡gv¯Ídv-Rvgvb-mgy`ª/

4. https://mzamin.com/news.php?news=120661#gsc.tab=0

5. https://www.dainikamadershomoy.com/details/0193ef9b585217

6. https://crimepatrol.news/?tag=‡gv¯Ídv-Rvgvb-Ii‡d-mgy`&

7. https://skhobor.com/news/115114

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মোস্তফা জামান সমুদ্র
জন্ম	: ২০০৬
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: ঢাকা আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ব্যবসা শিক্ষা বিভাগ থেকে এসএসসি শেষ করে সিদ্দেশ্বরী কলেজে ভর্তিচ্ছু
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মধ্যপাড়া, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
পিতা	: মনিরুজ্জামান তাজুল, বয়স: ৬৮ বছর
মাতা	: মাসুদা জামান, বয়স: ৬৮ বছর, পেশা : গৃহিণী
ভাই	: মোর্শেদুজ্জামান, বর্তমানে পিএইচডি করে জাপানে আছে
বোন	: মিরানা জামান, স্বামীর সাথে ফিনল্যান্ডে বসবাস করে
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক দুপুর ৩.৩০ মিনিট
ঘটনার স্থান	: রামপুরা, বাড্ডা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: ঘাতক পেটুয়া পুলিশ বাহিনী
চিকিৎসা সেবা নেওয়া হাসপাতাল	: ১. ডেলটা হাসপাতাল ও ২. বেটার লাইফ হাসপাতাল, ঢাকা
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, ডেলটা হাসপাতাল, ঢাকা
লাশ হস্তান্তর	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শহীদের কবরের অবস্থান	: মুন্সিগঞ্জ

প্রস্তাবনা	: ১. পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা
	: ২. শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণে বাড়িতে পাঠাগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

'মা,
তুমি কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর না, আমাকেও করতে দিতে চাও না। আজকে তুমিও চল আন্দোলনে।'

শহীদ তাহমিদ আব্দুল্লাহ অয়ন

ক্রমিক: ৭৩০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৪২

শহীদ পরিচিতি

২০০৩ সালের ১৭ এপ্রিল প্রয়াত আবুল হোসেন ও মোসা: তানজিল আক্তারের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেন তাহমিদ আব্দুল্লাহ অয়ন। তিন ভাই-বোনের মধ্যে তাহমিদ সবার বড়। ছোট দুই বোন ফাতেমা তাসনিম (১৫) ও খাদিজা নুসরাত (৯) মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত। তাহমিদের বাবা আবুল হোসেন (৪৬) বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের স্কোরার ছিলেন। তিনি ২০২০ সালের জুলাই মাসে করোনা মহামারির সময় হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। চার বছর আগে বাবা মারা যাওয়ার পর তাহমিদের পড়াশোনা শেষ করার অপেক্ষায় ছিলেন মা।

শিক্ষা

তাহমিদ আব্দুল্লাহ অয়নের স্কুল জীবন কেটেছে রাজধানীর মিরপুর-১৪ এলাকায় অবস্থিত শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজে। সকল প্রতিকূলতা পার করে তাহমিদ সফলতার সাথে ২০১৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাধ্যমিক ও একই বিভাগে ২০২১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। এরপর ভর্তি হন মিরপুর-০২ রূপনগর আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি-বিইউবিটির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সি এস ই) বিভাগে। স্বপ্ন দেখতেন প্রকৌশল হয়ে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবেন। স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে ঠিকই তবে স্বৈরাচারের কবলে পড়ে নিজের প্রাণের বিনিময়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে গিয়েছেন উদ্যমী এই তরুণ। সিএসই-৫১ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন তাহমিদ। তৃতীয় সেমিস্টার শেষ করেছিলেন মাত্র। শাহাদাতের পর ক্যাম্পাস তাঁকে ভুলে যায়নি। দেশ মাতার এই তেজস্বীর নামে একটি ভবনের নামকরণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বন্ধুত্ব পরায়ণ

তাহমিদ বাল্যকাল থেকে শিশুসুলভ ও বন্ধুত্ব পরায়ণ ছিলেন। পশু-পাখিকে ভীষণ ভালবাসতেন। বিড়াল ছিল তাঁর সবচেয়ে আদরের পোষা প্রাণী। শাহাদত বরণ করার পূর্বে দুটি বিড়াল পালতেন তাহমিদ। আদর করে যাদের নাম দিয়েছিলেন ব্রাউনি বেবি ও টাইগার। তাহমিদের মৃত্যুর পর তাঁর গুছিয়ে রাখা প্যান্ট শুঁকে-শুঁকে এখনও কাঁদে বিড়ালদ্বয়।

ন্যায়ের পথে অবিচল

খুনি হাসিনা সরকার পতনের দিন গত ৫ আগস্ট ২০২৪ বিজয় মিছিলে গুলিবিদ্ধ হন তাহমিদ। ২৪ এর গণ অভ্যুত্থানে তিনি শুরু থেকেই ছিলেন সরব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই অকুতোভয় যোদ্ধা। মায়ের বকুনি, সন্ত্রাস পুলিশের লাঠিচার্জ ও ছররা গুলিও থামাতে পারেনি এই তরুণ তুর্কিকে। ছেলের নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র ভয়ে ছিলেন তাঁর মা। একদিন বের হওয়ার সময় মা'কেও আন্দোলনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নবীন এই মুক্তিযোদ্ধা। বলেছিলেন, 'মা, তুমিও আন্দোলনে চল।' উত্তরে মমতাময়ী মা তানজিল আক্তার বলেছিলেন- 'তোমার বাবা নেই। যদি আমরা মরে যাই! তোমার বোনদের কে দেখবে?' মায়ের এই প্রশ্নের জবাবে তাহমিদ বলেছিলেন, 'ওদের আল্লাহ দেখবেন, তুমি চল।' মা যেতে চাননি দেখে রাগ করে বলেছিলেন, 'মা, তুমি কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর না, আমাকেও করতে দিতে চাও না।'

যেভাবে শহীদের কাতারে নিজেকে শামিল করলেন তাহমিদ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর মিরপুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঘাতক পুলিশ ও স্থানীয় নরখাদক আওয়ামী লীগ কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছিল। এর মধ্যে গত ১৯ ও ২০ জুলাই ২০২৪ মিরপুর রণক্ষেত্র তৈরি হয়। তাহমিদের বাড়ির গলিতে কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় পুরো রাস্তা অন্ধকার করে দেয় পেটুয়া পুলিশ বাহিনী।

Remembering

Tahmid Abdullah Ayon

499 friends

See Messages ···

Worked at Student

Studied at **Department of CSE, BUBT**

Studied at **Shaheed Police Smrity College**

Went to Shaheed Police Smrity School & College

Lived in **Dhaka, Bangladesh**

From **Dhaka, Bangladesh**

আগস্টের দ্বি-জবানবন্দী

ঘটনা প্রবাহ-১: ৪ আগস্ট ২০২৪ পুলিশের ছোড়া ছররা গুলি পায়ে ঢুকে আহত হন তাহমিদ আব্দুল্লাহ অয়ন। এরপর ব্যান্ডেজ পায়ে বাসায় ঢোকেন। শোয়া থেকে উঠতে গিয়ে ব্যথায় কুঁকড়ে গেলে আঘাত পাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন তাঁর মা। জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারেন, পায়ে ছররা গুলি ঢুকেছিল। তবে স্থানীয় ক্লিনিক থেকে গুলি বের করা হয়েছে। তাহমিদের মা বলেন- 'একদিন পুলিশের লাঠিপেটায় আমার ছেলে ভীষণ আহত হয়। তবুও আমাকে কিছু জানায়নি ও।

ঘটনা প্রবহ-২: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর তিন ঘটিকা। বন্ধুদের সাথে মিরপুর এলাকায় স্বৈরাচার হাসিনা পতনের আনন্দ মিছিলে যোগ দেন তাহমিদ। বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী দালাল পুলিশ বাহিনী অতর্কিত গুলি চালায়। মিরপুর মডেল থানা থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলে বন্ধুদের থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। গুলি শুরু হওয়ার পর দৌড়ে একটি খাম্বার আড়ালে আশ্রয় নেন। এ-সময় ঘাতক পুলিশের গুলি থেমে গেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। উঠামাত্র নরপিশাচ পুলিশের বুলেট তাঁকে এফোঁড়ওফোঁড় করে। বুকের বাম ও ডানপাশে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। পথমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তাহমিদকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করেন। এরপর তাঁকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) সুবিধা না থাকায় অন্য হাসপাতালে ফেরত পাঠান হয়। পরবর্তীতে তাহমিদকে তিনি কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর বন্ধুরা হয়রান হয়ে খুঁজে না পেয়ে একপর্যায়ে মুঠোফোনে কল করেন। ওঁই ব্যক্তি ফোন ধরে বলেন- **'আপনারা দ্রুত হাসপাতালে এসে রক্ত জোগাড় করেন।**

এরপর তাহমিদের অবস্থার অবনতি হলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে মহাখালী জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে গুলি বের করেন। তবুও অবস্থার উন্নতি হয় না। বাধ্য হয়ে দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁকে চারদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১০ আগস্ট ২০২৪ দুপুর ১:১৫ মিনিটে শাহাদাতের সুধা পান করেন নব জাগরণের চির অজেয় বীর শহীদ তাহমিদ আব্দুল্লাহ অয়ন।

নিকটাত্মীয়ের অভিব্যক্তি

শহীদের প্রতিবেশী হাজেরা চৌধুরী বলেন, "তাহমিদের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত অনেক স্মৃতির সাক্ষী আমি। ওর বাবা আবুল ভাইয়ের মতো ওকেও কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে আগে বড় করে হাসি দিত। তারপর কথা বলত।"

শহীদের বন্ধু ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন- "বিশ্বাস করতে পারতেছি না, বন্ধু তুই আর নেই, আল্লাহ তোরে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। সবাই তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করবেন।"

তাহমিদের মা তানজিলা আক্তার বলেন,

'স্বামী মারা যাওয়ার পর আমার জীবন অনেক এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এরপরও সন্তানদের দিকে তাকিয়ে সাহস যোগান দেই। ওর বাবার সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল তাহমিদের। তার হঠাৎ মৃত্যুর পর পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ বেড়ে যায় আমার ছেলের। সবসময় পড়াশোনা শেষ করে সংসারের হাল ধরার তাগিদ ছিল ওর। আর্থিক অনটনের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের বড় করছি। শুধু আক্ষেপ হয়, আন্দোলনের শেষে তাহমিদ গুলিবিদ্ধ না হলে কী হতো! এত কষ্ট করেও ছেলেটা আমার বিজয় উদ্‌যাপন করতে পারল না! সেদিন দুপুরে ভাতের সঙ্গে আলুভর্তা, লালশাক আর মুড়িঘণ্ট রান্না করেছিলাম। আমার ছেলে লালশাক দিয়ে মাখাভাত কিছুটা খেয়ে বের হয়েছিল। আমাকে বলেছিল- 'মা, আমি বাকি ভাত এসে খাব।'

পারিবারিক ও আর্থিক বিবরণ

রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার এইচ ব্লকে শহীদ তাহমিদের প্রয়াত পিতার পৈতৃক বাড়ি অবস্থিত। ব্লকের চওড়া গলির দুই পাশে সারি-সারি দুটি বহুতল ভবনের মধ্যখানে একমাত্র সেকেলে একতলা বাড়ি এটি। পিতামাতার একমাত্র সবেধন নীলমণি ছিলেন তাহমিদের পিতা। সেই সূত্রেই বাড়িটি এখন তাঁদের। লোহার ফটকের দরজা ও একচিলতে সরু জায়গায় দুই পাশে সারিবদ্ধ সাতটি কক্ষ বিশিষ্ট ঘর। দুটি কক্ষে শহীদ জননী কন্যাদ্বয়কে নিয়ে থাকেন। আর পাঁচটি কক্ষ ভাড়া দিয়েছেন। বর্তমানে স্বামী-সন্তান হারানো তানজিল আক্তারের পরিবারটি এই ভাড়ার অর্থেই যাপিত জীবনের সুখ খুঁজে চলেছেন।

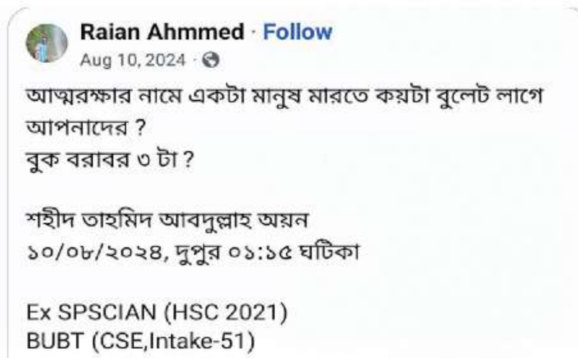

তাহমিদকে নিয়ে মিডিয়ায় প্রচারিত নিউজ লিংক সমূহ

1. https://www.prothomalo.com/bangladesh/a3xuj0d9ci
2. https://bonikbarta.com/bangladesh/D8XAA1WLiaQH3jzG
3. https://bn.wikipedia.org/wiki/QvÎ–RbZvi_Afz¨Ìv‡b_wbnZ‡`i_ZvwjKv

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: তাহমিদ আব্দুল্লাহ অয়ন
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি-বিইউবিটি
ডিপার্টমেন্ট	: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল -সিএসই
ইন্টেক	: ৫১, সেমিস্টার: তৃতীয়
জন্ম তারিখ	: ১৭ এপ্রিল ২০০৩, বয়স: ২১ বছর
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: মহল্লা: মিরপুর ০২, ব্লক: এইচ, থানা: মিরপুর, জেলা: ঢাকা
পিতা	: মৃত আবুল হোসেন (৪৬), জীবিত অবস্থায় পেশা: বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের স্কোরার
মাতা	: তানজিল আক্তার, পেশা: গৃহিণী
বোন	: ১. মোসা: ফাতেমা তাসনিম, বয়স: ১৫ বছর, পেশা: ছাত্রী, প্রতিষ্ঠান: মাদরাসা
	: ২. মোসা: খাদিজা নুসরাত, বয়স: ০৯ বছর, পেশা: ছাত্রী, প্রতিষ্ঠান: মাদরাসা
সম্পদের পরিমাণ	: পৈতৃক সাত কক্ষ বিশিষ্ট একতলা জরাজীর্ণ বাড়ি
পরিবারের মাসিক আয়	: ১৫০০০ টাকা, আয়ের উৎস: বাসা ভাড়া
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ৩:০০টা
ঘটনার স্থান	: মিরপুর-০২ থানা সংলগ্ন, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলি (তিনটি), ২টি ফুসফুস ভেদ করে বেরিয়ে যায়, ১টি বিদ্ধ অবস্থায় ছিল
আঘাতকারী	: মিরপুর থানার ঘাতক পুলিশ বাহিনী

চিকিৎসা সেবা নেওয়া হাসপাতাল সমূহ ১. কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা
২. জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৩.ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ঢামেক

শাহাদাতের তারিখ, সময় ও স্থান : ১০ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১:১৫ মিনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আইসিইউ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : মিরপুর, ঢাকা

প্রস্তাবনা
১. বোন দ্বয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে
২. জরাজীর্ণ বাড়িটির সংস্কার কিংবা পুনঃনির্মাণ করে দেওয়া যেতে পারে
৩. পরিবারের মাঝে মাসিক বা এককালীন আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে

শহীদ ইসমাইল

ক্রমিক: ৭৩১

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৪২

‘ওর ছোট একটা বোন লেখাপড়া করছে কে দেখবে এখন ওদেরকে?

শহীদ পরিচিতি

ইসমাইলের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ভৌরব উপজেলার জগন্নাথপুরে। তবে জন্ম ২০০৮ সালে রাজধানীর কামারাঙ্গীচর এলাকায়। বাবার নাম জসিম (৪০) ও মায়ের নাম তাসলিমা আক্তার (৩২)। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন এই তরুণ তুর্কী। ইসমাইলের রশ্নি নামের সাত বছরের একটি বোন আছে। তারা ভাই-বোন মিলে মায়ের সাথেই থাকতেন। সংসারের হাল ধরতে জুতার কারখানায় কাজ করতেন এই বীর যোদ্ধা। শহীদ জননী বর্তমানে বাসা-বাড়ির গৃহ কর্মী হিসেবে চাকরি করেন। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা তিনি। থেকে থেকেই কেঁদে ওঠেন। প্রায় চার মাস হতে চলল। তবুও কোথাও যেন সান্ত্বনা মেলে না। কান্না থামে না অসহায় এই শহীদ জননীর। আহাজারিতে কেঁপে ওঠে মাটি, আকাশ ও বাতাস। সন্তানের কথা মনে হলেই তিনি কান্না শুরু করেন। প্রতিবেশীরাও তার কান্না থামাতে গিয়ে ফেরেন অশ্রুসিক্ত নয়নে। স্বজনেরাও মর্মাহত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছেন। ইসমাইলের মৃত্যুর পরে তাঁর মা তাসলিমা ও ছোট বোন রশ্নি এখন ঢাকা উদ্যানে ইসমাইলের নানা-নানী ও দুই মামার সাথে বসবাস করছেন। রশ্নি স্থানীয় ফুল কলি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে।

যেভাবে শহীদ হন ইসমাইল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শামিল হয়ে গত ১৯ জুলাই ২০২৪ রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ততম নগরী মোহাম্মদপুরে 'আল্লাহ করিম' মসজিদের পাশে পুলিশের গুলিতে শহাদাত বরণ করেন বীর যোদ্ধা ইসমাইল (১৭)। সেদিন সকালে বাসা থেকে বের হয়ে কারখানায় যান ইসমাইল। বেতনের টাকা তুলে তার সম্পূর্ণই দেন মায়ের কাছে। এরপর মায়ের হাতে মাখানো ভাত খেয়ে আবারও বের হন তিনি। যাওয়ার সময় মা'কে বলেন- 'নানীর বাড়িতে যাচ্ছি।' যা মোহাম্মদপুর, ঢাকা উদ্যানের পাশে অবস্থিত।

এরপর, মানুষের বাসা-বাড়ি থেকে কাজ করে ফিরে আসেন ইসমাইলের মা। বাসায় ছেলেকে না পেয়ে ফোন দেন। কয়েকবার ফোন দিলেও রিসিভ করেন না ইসমাইল। চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েন তাসলিমা আক্তার। বাসার আশেপাশের মানুষকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আমার ছেলে কি বাড়িতে এসেছিল। প্রতিবেশীরা বলেন, আমরা কেউই-তো দেখিনি। এরপর রাত ৯ টার দিকে তার এক বন্ধু ফোন করে জানায়, ইসমাইল পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। খবর পেয়ে তাঁর মা মোহাম্মদপুরে গিয়ে অনেক খোঁজাখুজি করেও লাশ খুঁজে পান না। আশেপাশের লোকজন থেকে জানতে পারেন অনেক গুলিবিদ্ধ আহত ব্যক্তিদেরকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। পাগলের মত সন্তানকে খুঁজতে হাসপাতালে যান তিনি। এরপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন ওয়ার্ড, বিভাগ ঘুরে-ঘুরে রাত ১ টার দিকে সন্তানের লাশ সনাক্ত করেন দুঃখিনী মা। পরবর্তীতে ২০ জুলাই ২০২৪ ময়না তদন্ত শেষে করে আসরের নামাজের পর আজিমপুর কবরস্থানে শহীদ ইসমাইলকে দাফন করা হয়।

আন্দোলনের দামামা

দেশের জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ১৯৪৭-২০২৪ সবখানেই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব ছিল। ২৪ এর আন্দোলনের শহীদ ও গাজী শিক্ষার্থীদের প্রথমবারের যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সালে। তৎকালীন স্বৈরশাসক খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন থেকে তাদের যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা রাখে এ-অনুজরা। ২০২৪ এর কোটা সংস্কার আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ১৫'র শিক্ষার্থীদের। ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে আন্দোলনের দামামা বেজে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। (২ জুলাই - ৫ আগস্ট) দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষনা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠন। কর্মসূচী ভেস্তে দিতে টিয়ার শেল, রাবার বুলেট, ছড়রা গুলি, গুম, খুন, নির্যাতন, মামলা করে ছাত্র-জনতাকে হয়রানি করে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পালিত গুণ্ডা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। দেশীয় অস্ত্র ও রাইফেল নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে আওয়ামীর দাগী সন্ত্রাসীরা। দীর্ঘদিন আন্দোলন চলার ফলে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কারফিউ ঘোষণা করে তৎকালীন খুনি শাসক শেখ হাসিনা। সেই কারফিউ ভেঙে রাজধানীর অলিগলিতে অবস্থান নেয় আপামর ছাত্র-জনতা। এরপর বেলা দুইটায় গণমাধ্যমে খবর আসে, পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন রক্তখেকো হাসিনা। খবর পেয়ে ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্র-জনতা বিজয় উল্লাস, মিষ্টি বিতরণ করে।

পরিবারের অনুভূতি

শহীদ ইসমাইলের মা তাসলিমা আক্তার বলেন, 'সেদিন মেডিকেলে পুলিশের ভয়ে কান্না করতে পারি নাই। নিজের সন্তানের লাশ দেখে চুপ করে থাকতে বাধ্য করেছিল পুলিশ। ছেলেটার গলায় ওরা গুলি করেছে। যে কারণে আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।অন্তরটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ছেলেডারে নিয়ে আমার তো অনেক আশা ছিল। ছেলে কাজ করে সংসার চালাবে। আমাদের অভাব-অনটন দূর করবে। সে ইচ্ছা যে, এভাবে শেষ হয়ে যাবে, তা কে জানত। এখন আমি কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব? আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি এখন কাকে নিয়ে বাঁচবো? মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই। আমার ছেলে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিল। সংসারের অভাবের কারণে আর পড়ালেখা করতে পারেনি। পরে ইসলামপুরে জুতার কারখানায় কাজ শুরু করে। ওর বাবা সংসারের প্রতি উদাসিন ছিল। সে সংসারের কোন খরচ দিত না। সন্তানটা নিহত হওয়ার পরে হাসপাতালে পর্যন্ত যায়নি। এরপর থেকে আমাদের সাথে তার কোন যোগাযোগও নেই।

ইসমাইলের নানী ঝর্ণা জানান, ইসমাইল অনেক ভালো ছেলে ছিল। সে যে এভাবে পুলিশের গুলিতে মারা যাবে আমরা মেনেই নিতে পারছি না। যখন ওর মৃত্যুর খবর শুনেছি আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। ইসমাইল ছাড়া আমার মেয়ের পরিবারটিকে দেখার মতো কেউ নাই। ওর ছোট একটা বোন লেখাপড়া করছে। কে দেখবে এখন ওদেরকে? দেখার তো আর কেউ রইলো না। নাতিটা মারা যাবার পর মেয়ে ও নাতনীকে এই এলাকায় নিয়ে এসেছি। এক রুমের একটি বাসা ভাড়া করে দিয়েছি। আমার সংসারই চলে না, ওদের দুইজনকে কিভাবে খাওয়াব, পরাব? আমার দুইটা ছোট ছেলে। তারাই কাজ করে সংসার চালায়। আমরাই ঠিক মত খেতে পারি না। আবার এখন ওরা দুইজন এসেছে।

বর্তমান পরিস্থিতি

শহীদের পরিবার বর্তমানে রাজধানীর নবীনগর এলাকায় বসবাস করছেন। নিচ তলায় একটি একরুমের বাসায় ভাড়া আছেন পরিবারটি। রুমের মধ্যেই রান্না ঘর। ছোট এই রুমের ভাড়া সাড়ে ৩ হাজার টাকা। তেমন কোন আলো বাতাস প্রবেশের জায়গাও নেই। স্যাঁতসেঁতে একটা পরিবেশ। নেই কোন উল্লেখযোগ্য আসবাবপত্র। বাসার অবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে কি নিদারুণ কষ্টে চলছে শহীদ পরিবারটি। শহীদ ইসমাইলের মা তাসলিমা আক্তার বলেন, আমার ছেলে কারখানায় কাজ করে সব টাকাই আমারে দিত। আর আমি বাসা বাড়িতে কাজ করে যা টাকা পাইতাম তা দিয়েই আমাদের সংসার চলত। সরকার যদি আমাদের পাশে

দাঁড়ায় তাহলে মেয়েকে নিয়ে একটু ভালোভাবে বাঁচতে পারব। আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের বিচার চাই। আমার ছেলে তো দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। তাকে যেন শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়।

আমার ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে মোহাম্মদপুর থানায় ১৫ জনের নামে মামলা করেছি। কত জনের নামে এবং কার কার নামে মামলা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এর বাইরে আমার কিছু মনে নেই। আমি ওই ফাইলগুলো বের করতে চাই না। ওগুলো দেখলে আমার বুকের মধ্যে অনেক কষ্ট বেড়ে যায়। এ বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাসলিমা আক্তার। রশ্নি গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেন।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদের একমাত্র বোনকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা প্রয়োজন
৩. শহীদের মায়ের কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে
৪. মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: ইসমাইল
জন্ম	: ২০০৮ সাল, বয়স: ১৭ বছর
পেশা	: জুতার কারখানার শ্রমিক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: জগন্নাথপুর, উপজেলা: ভৈরব, জেলা: কিশোরগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নবীনগর, ঢাকা
পিতা	: মো: জসিম, পেশা: ভবঘুরে, বয়স: ৪০ বছর
মাতা	: তাসলিমা আক্তার , বয়স: ৩২ বছর, পেশা: গৃহকর্মী
বোন	: মোসা: রশ্নি আক্তার, বয়স: ০৭ বছর, পেশা: ছাত্রী, শ্রেণি: প্রথম
সম্পদের পরিমাণ	: পৈতৃক কোন জায়গা-জমি নেই
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ৩:০০টা
ঘটনার স্থান	: মোহাম্মদপুর আল্লাহ করিম মসজিদ সংলগ্ন, ঢাকা
আক্রমণকারী	: আওয়ামী মদদপুষ্ট পুলিশ বাহিনী
চিকিৎসা সেবা নেওয়া হাসপাতাল	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ঢামেক
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ঢামেক লাশ হস্তান্তর; ১৯ জুলাই ২০২৪ (লাশ আটকে রাখতে চেয়েছিল পুলিশ বাহিনী)
শহীদের কবরের অবস্থান	: আজিমপুর কবরস্থান, ঢাকা

“ছেলের লাশ আনতে গেলে আমাদেরকে মানুষ মনে করেনি যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মাহবুব। বারবার দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমন দুর্ব্যবহার করেছে আমাদের সাথে- মনে হচ্ছিল যে আমরা মানুষ নয়, আমরা যেন কুকুর।”

শহীদ মো: শাকিল

ক্রমিক : ৭৩২

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৭৮

শহীদ পরিচিতি

বুকাবুনিয়া বাংলাদেশের বরগুনা জেলার অন্তর্গত বামনা উপজেলার একটি ইউনিয়ন। অত্র ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুরা গ্রামটি যেন প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ভুমি। সৌন্দর্য বর্ধিত এই গ্রামের হাজিবাড়ি মহল্লা যেন ২৪-এর বিপ্লবী এক অভ্যুত্থানের অনন্য সাক্ষী। স্বৈরাচার পতনের এক জাগরণী ইতিহাস রচনা করেছেন গ্রামটির সাধারণ এক রিকশাচালক। যা আজ দেশ ও দেশের বাইরে তাঁকে প্রশংসনীয় করে তুলেছে। মহাবীরের যাপিত জীবন ছিল খুবই সাধারণ। পিতা-মাতা আদর করে তাঁর নাম রেখেছিলেন শাকিল। ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত কুমিল্লার প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে মৃত দুলাল ও হেলেনা দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্ম নিয়েছিলেন এই তরুণ তুর্কী।

জন্ম পরবর্তী দিনগুলো

দিনমজুর দম্পতির ঘরে একে একে জন্ম নেয় শারমিন(২৫), সাকিল(২৪), তানিয়া(১৮) ও জীবন (১৩)। দারিদ্রতা ঘুচাতে জনাব দুলাল স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে পাড়ি জমান রাজধানী শহরে। নিরলশ প্রচেষ্টা আর পরিশ্রম তাঁকে নিতিবান করে গড়ে তোলে। নতুন করে সংসার গড়তে পরিবারকে নিয়ে ওঠেন যাত্রাবাড়ী এলাকায়। সেখানেই রচিত হয় নতুন জীবনের পটভূমি। গ্যারেজ থেকে ভাড়ায় চালিত রিক্সা নিয়ে শুরু করেন জীবন যাত্রা। সংসারের উন্নতি সাধনে শহীদ জননীও যেন কম নয়। গৃহকর্মীর কাজে নিজেকে শপে দিয়ে চার সন্তানের খরচাদি যোগানে তিনিও ছিলেন সমানে সমান।

হঠাৎ জীবনে ছন্দপতন আসে। সাকিলের পিতা প্রিয়জনদেরকে ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পাড়ি দেন। ফলে সন্তানদের ভবিষ্যতের পথ বাধাগ্রস্থ হয়। জননীর একক উপার্জনে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া চালান সম্ভব না হলে একেএকে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে শারমিন, সাকিল ও তানিয়া। জীবনের বয়স তখন কয়েক মাস। অভাব অনটনে তার আর স্কুলেই যাওয়া হয়নি। বর্তমানে জীবন ১৩ বছরের এক ফুটফুটে শিশু। আর্থিক সংকুলান না থাকায় সে এখন বেলচা কারখানার শিশু শ্রমিক। সাকিলের বড় বোনের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। মেঝো বোনের বিবাহ হলেও স্বামীর সাথে বনাবনি না হওয়ায় বিচ্ছেদ হয়েছে। বর্তমানে তিনি মায়ের সাথেই রয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নদী ভাঙ্গনে ঘর-বাড়ি সর্বস্ব হারিয়েছেন হেলেনা বেগম। মাথা গোঁজার ঠাই ও দু-মুঠো ভাতের অভাবে বাল্যকালেই সাকিলের হাতে রিক্সা তুলে দেন তার জন্মদাত্রী মা। শাহাদাত বরণের পূর্বে সেই ভাঁড়ায় চালিত রিক্সাই ছিল তাঁর একমাত্র উপার্জনের সম্বল। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদেরকে নিয়ে স্থায়ি ভাবে ভাইয়ের বাসা বরগুনায় উঠেছিলেন শহীদ জননী। ফলে সেই ঠিকানাই ছিল সাকিল ও তার পরিবারের একমাত্র স্থায়ি ঠিকানা। বর্তমানে শহীদ পরিবারটি সেখানেই অবস্থান করছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের মূল প্রেক্ষাপট হলো শিক্ষার্থীদের ওপর চলমান বঞ্চনা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগের অভাব। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা, উচ্চশিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি সবই এ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে

ছিল। হাজারো শিক্ষার্থী বৈষম্যের শিকার হয়ে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে হতাশায় ভুগছিল এবং তাদের এই হতাশা থেকে শুরু হয় এক বিশাল এক অভ্যুথান। যা অল্প সময়ে স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সমান অধিকার। বিশেষ করে সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দৃঢ়ভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করে। এর ফলে সরকার ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। একদিকে সরকারের প্রতিশ্রুতি ও অব্যবস্থাপনা আর অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চনা ও হতাশা। এ দুটি বিষয়ই এ আন্দোলনকে উস্কে দেয়। এই আন্দোলনের অন্যতম ট্র্যাজেডি হলো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের আহত ও নিহত হওয়া। আন্দোলনকারীরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানালেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিপীড়ন ছিল অত্যন্ত নির্মম। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং পুরো জাতির মনে আন্দোলনের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২৪ এর বিপ্লবে এক মহা জাগরণ তৈরি করেছিল দেশের আপামর জনতা। নানা বর্ণ-পেশার মানুষেরা দলেদলে এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তেমনি এই আন্দোলনের সম্মুখ যোদ্ধা ছিলেন রিক্সা চালক সাকিল। আন্দোলনকে বেগবান করতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার নানামুখী কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন জাতীর দুর্দিনের এই রাহাবার।

১৮ জুলাই ২০২৪। মায়ের হাতের রান্না করা খাবার খেয়ে বের হন শাকিল। গ্যারেজ থেকে রিক্সা নিয়ে যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালি ও তার আশেপাশে ঘাম ঝরিয়ে ১৭০ টাকা উপার্জন করেন। এরপর বাড়িতে মায়ের কাছে টাকা দিয়ে আবারও বের হন। পথমধ্যে আন্দোলন দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না সাকিল। দুপুর দুইটায় গ্যারেজে রিক্সা রেখে ছাত্র-জনতার উপচে পড়া আন্দোলনে যোগদান করেন তিনি। কুতুবখালি বড় মাদরাসা সংলগ্ন এলাকা তখন লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ চারিদিক থেকে আওয়ামী বাহিনীর আগমন ঘটে। ঘাতক পুলিশের সাথে মিশে এলোপাথাড়ি গুলি, টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড, নিক্ষেপ করে তারা। মুহূর্তে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছাত্র-জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘাতক পুলিশের একটি গুলি তাঁকে এফোঁড়ওফোঁড় করে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুরতর জখম অবস্থায় সাকিলকে উদ্ধার করে তাঁর এক প্রতিবেশী। প্রাথমিক ভাবে আজগর আলী মেডিকেল হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে থাকে সাকিলের। হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেলে ফেরত পাঠান হয়। ঢামেকের চিকিৎসকেরা পুলিশি কেস জানিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা না দিয়ে ফেলে রাখে। চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতালের বারান্দায় শাহাদতবরণ করেন জাতীর এই পথ প্রদর্শক। রাত নয়টায় মুঠোফোনে ছবি তুলে সাকিলের বাড়িতে আসেন উদ্ধারকারী প্রতিবেশী। ছেলের এই অবস্থা দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তাঁর মা। এরপর ঢামেক প্রাঙ্গণে বড় মেয়ের জামাই ও প্রতিবেশীকে নিয়ে ছেলের লাশ আনতে যান হেলেনা বেগম। পুলিশ হুমকি ধামকি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এবং জানায় আন্দোলন থেমে গেলে লাশ ফেরত দেওয়া হবে। এরপর ১৮ জুলাই গভীর রাত পর্যন্ত ওসি মাহবুবের কাছে অনুনয় বিনয় করে শহীদ জননী। তবুও তার মন গলে না। পরদিন আবারও থানায় যান দুঃখিনী এই মা। আঁচল পেতে সন্তানের লাশ ভিক্ষা চান তিনি। তবুও পাষণ্ডের মন যেন নরম হয়না। এভাবে জুলাই ১৯, ২০, ২১ তারিখ পার হয়। শহীদের মহীয়সী মা বলেন-

"ছেলের লাশ আনতে গেলে আমাদেরকে মানুষ মনে করেনি যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মাহবুব। বারবার দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমন দুর্ব্যবহার করেছে আমাদের সাথে-মনে হচ্ছিল যে আমরা মানুষ নয়, আমরা যেন কুকুর।"

এরপর ২২ তারিখ সকালে আবারও বড় মেয়ের জামাইকে সাথে নিয়ে থানায় যান। থানার প্রধান ফটকের দায়িত্বরত পুলিশের হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেও দেশের জন্য শহীদ সাকিলের লাশের ছাড়পত্র মেলে না। বাধ্য হয়ে বাড়ির দিকে রওনা করেন সন্তান হারানো মৃতপ্রায় হেলেনা। পথমধ্যে শাকিলের এক বন্ধু জানায়- ঢাকা মেডিকেলের হিমঘরের রেফ্রিজেটর নষ্ট হওয়ায় আজকে লাশ হস্তান্তর করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই কথা জানার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: হেলেনা
Name: HALANA
পিতা: মোঃ নুর ইসলাম
মাতা: রাহিমন
Date of Birth: 05 Jun 1989
ID NO: 5108455733

শহীদের মায়ের আইডি কার্ড

সাথে সাথে তিনি আবারও ঢাকা মেডিকেলে যান। ওসি মাহবুব তবুও লাশ দিতে অস্বীকার করে। এরপর ১৮০০ টাকার বিনিময়ে বিকাল ৫.৩০ মিনিটে দেশের এই রত্নের লাশ পরিবারের মাঝে ফেরত দেয় আওয়ামি মদদপুষ্ট ঘাতক ওসি মাহবুব ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এরপর শহীদ শাকিলের মা জননী ভগ্ন হৃদয়ে সন্তানের লাশ বাড়িতে নিয়ে যান। গোসল শেষে রাত ১২.৩০ মিনিটে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয় দেশের এই বীর যোদ্ধাকে।

পরিবারের আর্থিক বিবৃতি

শহীদ শাকিলের পৈতৃক কোন সম্পদ নেই। বার বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর রিক্সা চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছিলেন তিনি। একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলের মৃত্যুতে ভাইয়ের বাসায় অসহায় জীবন যাপন করছেন হেলেনা বেগম। শহীদের ছোট ভাই বাধ্য হয়ে শ্রমিক পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। এই মুহূর্তে সংসারের হাল ধরার কেউ নেই। পিতার মৃত্যুর পর কুমিল্লা শহর থেকে বিতারিত হন সাকিল ও তার মা। ফলে বর্তমানে মামার বাড়ি ছাড়া এই দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ নেই পরিবারটির।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের মা'কে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. স্থায়ি বাসস্থানের ব্যবস্থা করলে পরিবারটির অনেক উপকার হবে
৩. শহীদের তালাকপ্রাপ্তা বোনকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে

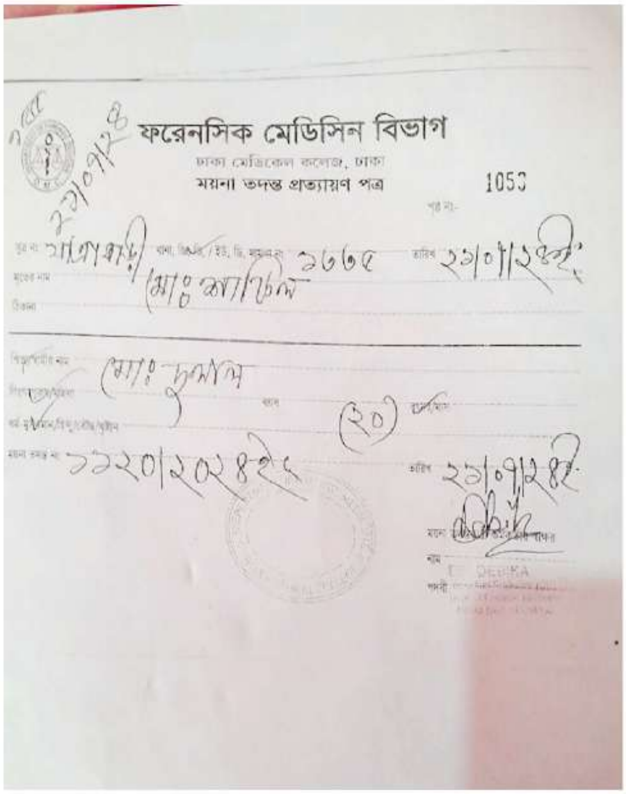

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র
1053

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: শাকিল
জন্ম	: ৩১-১২-২০০০, বয়স: ২৪ বছর
পেশা	: রিকশাচালক
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: লক্ষীপুরা, হাজিবাড়ি, ইউনিয়ন: বুকাবুনিয়া, জেলা: বরগুনা
পিতা	: মৃত মো: দুলাল
মাতা	: হেলেনা, বয়স: ৩৫ বছর, পেশা: গৃহিণী
বোন	: মোসা: শারমিন আক্তার, বয়স: ২৫ বছর, পেশা: গৃহিণী
বোন	: মোসা: তানিয়া আক্তার, বয়স: ১৮ বছর, বেকার
ভাই	: মো: জীবন, বয়স: ১৩ বছর, পেশা: বেলচা কারখানার শ্রমিক
সম্পদের পরিমাণ	: পৈতৃক কোন জায়গা-জমি নেই
আহত হওয়ার সময়	: ১৮ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ৩ টা
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী, কুতুবখালি বড় মাদরাসা সংলগ্ন, ঢাকা
আক্রমণকারী	: আওয়ামী নরপশু পুলিশ বাহিনী
চিকিৎসা সেবা নেওয়া হাসপাতাল	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৮ জুলাই ২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল লাশ হস্তান্তর, ২২ জুলাই ২০২৪ (৫ দিন লাশ আটকে রাখে যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মাহবুব)
শহীদের কবরের অবস্থান	: জুরাইন কবরস্থান

শহীদ আবদুল্লাহ আল আবীর

ক্রমিক: ৭৩৩

আইডি: বরিশাল বিভাগ ০৭৯

শহীদ পরিচিতি

বরিশালের কৃতি সন্তানদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল আবীরের নাম অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তার মৃত্যু বাংলার ফেরাউন স্বৈরাচার খুনি হাসিনার মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তিনি ২০ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মিজানুর রহমান ও মায়ের নাম পারভীন সুলতানা।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই, ২০২৪ – বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ভয়াল দিন। তার আগের দিন রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্র আন্দোলনের বহু অংশগ্রহণকারী আহত ও নিহত হয়। এই নির্মমতার প্রতিবাদে ১৯ জুলাই ঢাকা মহানগরজুড়ে ছাত্রসমাজ রাজপথে নামে। উত্তাল হয়ে ওঠে বসুন্ধরা, নর্দ্দাসহ বিভিন্ন এলাকা। রাজপথে তৈরি হয় এক ভয়াবহ রণক্ষেত্র।

এই দিনে গুলিবিদ্ধ হন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ও কর্মকর্তা শহীদ আবদুল্লাহ আল আবীর। বিকেল ৬:৩০ মিনিটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সময় নর্দ্দা এলাকায় তিনি পেটের পাশে গুলিবিদ্ধ হন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সাহসী শিক্ষার্থী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে তাঁকে সরিয়ে আনেন।

পরবর্তীতে দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, গুলিটি তাঁর কিডনিতে আঘাত করেছে, এবং জরুরি অস্ত্রোপচার ছাড়া বাঁচানো সম্ভব নয়। দীর্ঘ চার ঘণ্টার অপারেশনে একটি কিডনি অপসারণ করা হয়। এরপর তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নেওয়া হয়, চলতে থাকে রক্ত সঞ্চালন, শেষ চেষ্টা হিসেবে লাইফ সাপোর্টও দেওয়া হয়–কিন্তু ততক্ষণে সময় ফুরিয়ে গেছে। ২০ জুলাই সকাল ৮:৩০ মিনিটে শহীদ আবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবীর ভাইয়ের শাহাদাতের পর তাঁর মরদেহ পরিবহনের জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছিল না। একে একে হাসপাতালগুলো অস্বীকৃতি জানায়–তাদের ভাষায় "উপরে থেকে নিষেধাজ্ঞা আছে।" এমতাবস্থায় এগিয়ে আসেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাদের সহযোগিতায় একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। মরদেহ পরিবহনের সময়ও আশঙ্কা ছিল প্রাণনাশের। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীরা অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে তল্লাশির নামে আহতদের ওপর হামলা করছিল। তাই অ্যাম্বুলেন্সের সামনে ও পেছনে নিরাপত্তা দিয়ে এগিয়ে চলছিল ছাত্র সংগঠনের সাহসী কর্মীরা।

শেষবারের মতো আবীর ভাইকে তাঁর বরিশালের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দিতে অনেকেই ছিলেন পাশে। পুরো রাতটাই কেটেছে ভয়, কান্না আর রক্তাক্ত স্মৃতির মধ্যে।

স্মরণে শহীদ আবীর

আবদুল্লাহ আল আবীর ছিলেন কেবল একজন তরুণ শিক্ষার্থী নয়–তিনি ছিলেন সাহস, বিনয়, নেতৃত্ব আর দায়িত্ববোধের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রাণচঞ্চল, আড্ডাপ্রিয়, মজার মানুষ–যার মুখে হাসি, চোখে স্বপ্ন, আর অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অঙ্গীকার।

তিনি ১৭ ও ১৮ জুলাই সংঘটিত রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছিলেন, গর্জে উঠেছিলেন সাধারণ ছাত্রদের কণ্ঠ হয়ে। ১৯ জুলাই-এর সেই মর্মান্তিক শাহাদাত দেশবাসীকে জানিয়ে দিয়েছিল–ভয় নয়, প্রতিবাদই সত্যের পক্ষে উত্তম জবাব।

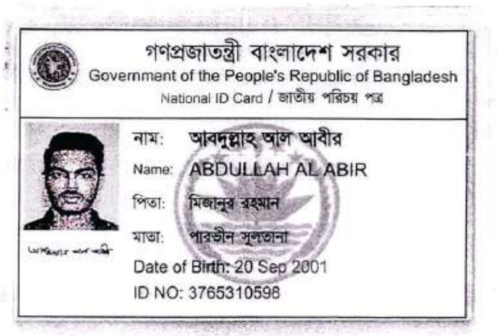
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: আবদুল্লাহ আল আবীর
Name: ABDULLAH AL ABIR
পিতা: মিজানুর রহমান
মাতা: পারভীন সুলতানা
Date of Birth: 20 Sep 2001
ID NO: 3765310598

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: আবদুল্লাহ আল আবীর
জন্ম	: ২০-০৯-২০০১
পেশা	: ছাত্র, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
পিতা	: মিজানুর রহমান (৪৮)
মাতা	: পারভিন সুলতানা (৪৫)
স্থায়ী ঠিকানা	: বাহেরচর, ক্ষুদ্রকাটি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: গোরাচাঁদ দাস রোড, বরিশাল
ঘটনার স্থান	: নর্দ্দা, বসুন্ধরা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার, সময়: সন্ধ্যা ৬.৩০ টা
আঘাতের ধরন	: পেটের দিকে গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০ জুলাই ২০২৪ শনিবার, ঢামেক
শহীদের কবরের অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান
প্রস্তাবনা	: ১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ মোঃ সোহেল

ক্রমিক ৭৩৪

আইডি ঢাকা বিভাগ ১৪৪

শহীদ পরিচিতি

মোঃ সোহেল ঢাকা শহরের বাড্ডা এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি ১৯ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার বাবার নাম জাহাঙ্গীর আলম। তিনি গাড়ি চালাতেন। মা রহিমা বেগম গৃহিনী। নুপুর আক্তার নামে তিতুমীর কলেজে পড়ুয়া তার একটি বোন আছে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচারী সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে একে একে সমস্ত বিরোধী দলকে ভারতের সহায়তায় দমন করতে থাকে। শুরুতে ভারতীয় বাহিনীর মাধ্যমে পিলখানায় হত্যাকান্ড ঘটিয়ে ৭৬ জন সেনা অফিসারসহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। সাবেক দূর্নীতিবাজ স্বৈরাচারী সরকার শেখ মুজিব ও তার হিংস্র রক্ষী বাহিনীকে যারা দমন করেছিল সেইসব বিপ্লবী সেনাদের মধ্য থেকে ৫ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। বিরোধীদল বিএনপিকে মামলা-হামলার ভয় দেখিয়ে এবং অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়ে নিস্ক্রীয় করে ফেলে। বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে আটক করে এবং তার বড় সন্তানকে পিটিয়ে আহত করে। তিনি বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন। আওয়ামীলীগ এবং তার প্রশ্রয়দাতা ভারত বুঝতে পেরেছিল এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির। একারণে জামায়াতের দেশপ্রেমিক নিরীহ নেতাদের নিয়ে ২০০১ সাল থেকে সিন্ডিকেট ধর্মী মিথ্যা ও আজগুবী প্রপাগান্ডা নিউজ করতে থাকে ভারতের অর্থে পরিচালিত প্রথম আলো পত্রিকা। তারা জামায়াত নেতাদের ভয়ংকর কার্টুন ছবি যুক্ত করে ১৯৭১ সালে জামায়াত নেতারা কোন জেলায় কে কি করেছে শিরোনামে ধারাবাহিক সংবাদ উপস্থাপন করতে থাকে। প্রথম আলোর উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশে জামায়াত তথা ইসলাম ও ইসলামী চরিত্রকে সাধারণ মানুষের মাঝে ঘৃণিতভাবে প্রচার করা। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় এই দলের উপরে নির্মম নির্যাতন। জেল, গুম, খুন, ক্রসফায়ার, ধর্ষণ, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়াসহ এমন কোন নির্যাতন ছিলোনা যা এই দলের নেতা-কর্মীদের উপরে চালানো হয়নি! মিথ্যা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে জামায়াত নেতাদের ৫ জনকে একের পর এক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এসব নেতাদের প্রাণভিক্ষা চাইতে বলা হয়েছিল। শেখ হাসিনা প্রস্তাব দিয়েছিল, প্রাণ ভিক্ষা চাইলে হয়তো ক্ষমা করে দেয়া যেতে পারে! জামায়াত নেতারা জালিমের কাছে আনুগত্য স্বীকার না করে শাহাদাতকে বেছে নেয়।

২০০৯ সালে সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমদের সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসার পরে আওয়ামী মদ্যপ-লম্পট উপদেষ্টারা স্বপ্ন দেখাতো অমুক অমুক সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা ভারতকে প্রদান

করলে বাংলাদেশ চার বছরের মধ্যে কানাডা-সিংগাপুরকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু ৫ বছরের মধ্যে জনতা তাদের জমাকৃত সম্পদ ও দেশের সম্পদ হারাতে দেখে বুঝতে পারে দেশটা রাক্ষসের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগ স্বাভাবিক নির্বাচনে আবার ক্ষমতায় আসতে পারবেনা বুঝতে পেরে ২০১৪ সালে রাতের ভোটের নির্বাচনের আয়োজন করে। ভোটাররা কেন্দ্রে গিয়ে দেখে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গিয়েছে। প্রতিবাদকারীদের জেল-জুলুম, গুম-খুনের মাধ্যমে এক পর্যায়ে দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হতে হয়। আলেম সমাজ উপলব্ধি করেন সর্বত্র ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনঠাসা করে ফেলা হচ্ছে। লম্পট ও নাস্তিকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হচ্ছে। এসময় সরকারী প্রশ্রয়ে নবী (স) কে অপমান করে লেখালেখির কারণে শুরু হয় হেফাজতে ইসলামের ইসলাম রক্ষার আন্দোলন। ২০১৪ সালে হেফাজতে ইসলামীর সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর পাশে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির সমর্থন দিয়ে এগিয়ে আসে। হেফাজত কর্মীরা সরকারকে দাবী মানাতে ঢাকার শাপলা চত্বরে অবস্থান নেয়। তাদের দাবী ছিল নাস্তিক লেখকদের বিচার করা হোক। শেখ হাসিনা দাবী না মেনে গণহত্যার নির্দেশ দেয়। রাতভর চলে হেফাজত কর্মীদের গুলি চালিয়ে হত্যা। শতাধিক নিহত হয়। গণহত্যার সংবাদ প্রচার করায় দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভিকে বন্ধ করে দেয় সরকার। বন্ধ করে দেয়া হয় অসংখ্য নিউজ মিডিয়া। সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা আওয়ামী লীগের চাটুকারিতা করা শুরু করে দেয়। ইসলাম ও ইসলাম পন্থীদের নির্মূলে তারা আওয়ামী সহযোগী হয়ে ওঠে। ২০১৮ সালে আবারো পাতানো নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনা। এমনকি ২০২৪ সালেও। ছাত্র-জনতা অপেক্ষায় ছিল পরিবর্তনের। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনটি দমন করতে শেখ হাসিনা অতীতের মতো গনহত্যার নির্দেশ প্রদান করে। শুরু থেকে সাধারণ ছাত্রদের হত্যা করা হতে থাকে। দেশবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মোঃ সোহেল একজন সচেতন ছাত্র ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্বাভাবিকভাবে দেশে চাকুরী পাওয়া সম্ভব নয়। কোটা বিরোধী সমাবেশে ছাত্র হত্যায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ১৯ জুলাই রাজপথে ছাত্রদের পাশে উপস্থিত থাকেন। তার অবস্থান ছিল লিংক রোড গুদারাঘাট এলাকা। বিকাল ৩:৩০ টার দিকে পুলিশ এর গুলি তার দুই পা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তার বন্ধুরা তখন তাকে ধরাধরি করে বাড্ডা অগত hospital এ নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়। পঙ্গু হাসপাতালে প্রায় ৫ ঘন্টা serial এ থাকার পর রাত ১০ টার দিকে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় ততক্ষণে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। প্রাথমিকভাবে তাকে পঙ্গু হাসপাতালের ২৭ নং সাধারণ বেড এ রাখা হয়। ২০ শে জুলাই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তাকে পঙ্গু হাসপাতালের ICU ward ০৮ এ শিফট করা হয়। ICU তে সে টানা ৭ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে এবং ২৬ শে জুলাই শুক্রবার লাইফ সাপোর্ট এ থাকা অবস্থায় দুপুর ২ টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন। পঙ্গু হাসপাতালের Intensive care unit এর ডাক্তার হারুন-উর-রশিদ এর ভাষ্যমতে গুলির ইনজুরি এবং বিষক্রিয়ার ফলে মোঃ সোহেল এর lungs ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ট্রমার কারণে ব্রেন এ ফ্লুইড জমে গিয়েছিল। পাশাপাশি তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল।

পরিবারের বক্তব্য

শহীদের বোনের অনুভূতি : আমার ভাই আমার যত্ন নিতেন। আমি শারিরীক ভাবে একটু অসুস্থ থাকি এইজন্য আমার ভাই আমাকে কোন টিউশনি করতে দিতো না। আমি যখন রাত জেগে পড়াশোনা করতাম ভাইয়া আমার পাশে বসে থাকতেন। পড়তে পড়তে গভীর রাত হলেও ভাইয়া আমার পড়ার টেবিলের পাশে বসে থাকতেন। আমার হাতের রান্না ভাইয়া খুব পছন্দ করতেন। প্রায় সময় বলতেন নুপু আজকে তুই রান্না কর। আমার ভাই আমাকে আদর করে নুপু বলে ডাকতেন। আজ ৬ মাস হয়ে গেল আমি আমার ভাইয়ের ডাক আর শুনতে পাইনা। আমার ভাইটা কোথাও যাওয়ার আগে রেডি হয়ে জিজ্ঞাসা করত আমাকে কেমন লাগছেরে? আমি যখন বলতাম, সুন্দর লাগছে তখন খুব খুশি হয়ে যেত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

বাবা অসুস্থ হওয়ায় কাজে যেতে পারেননা। বোন নুপুর পড়ালেখার পাশাপাশি ছোট একটি জব করেন। তাদের নিজস্ব কোন সম্পদ নেই। ঢাকায় বাসা ভাড়া করে থাকেন।

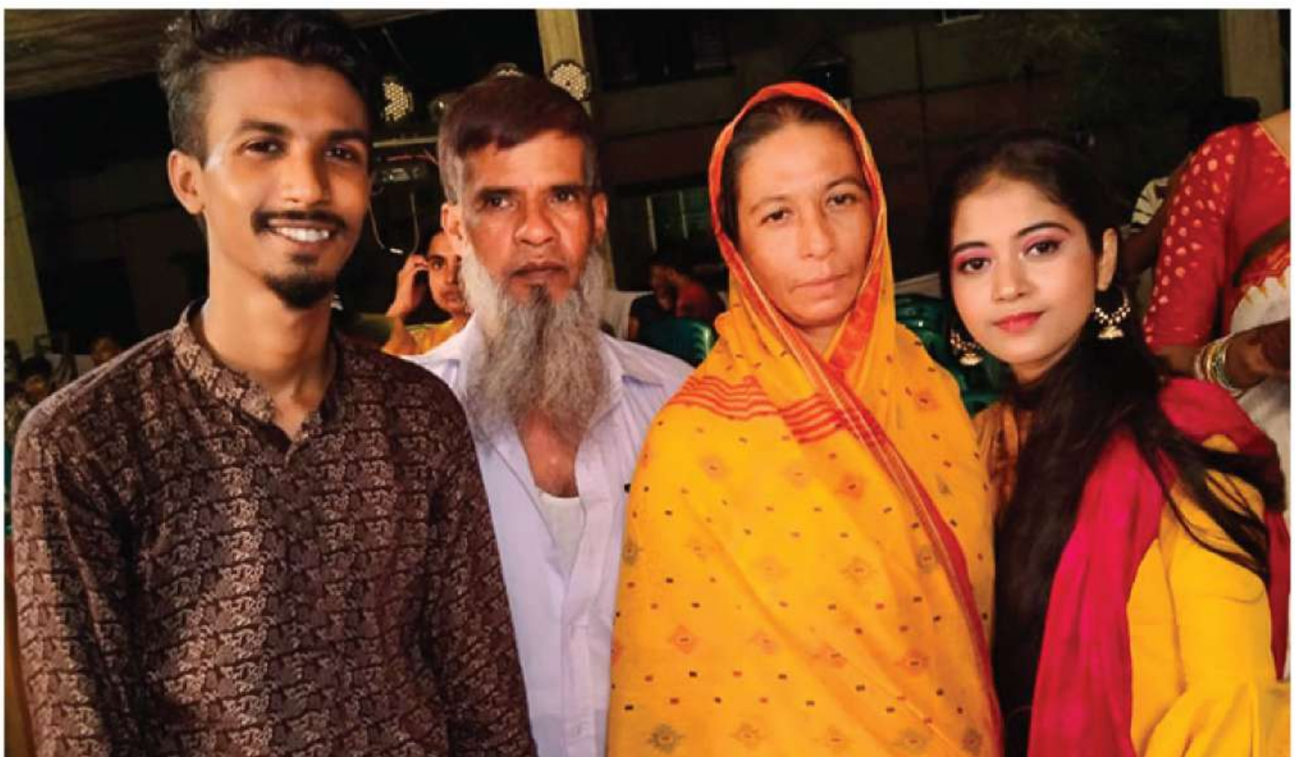

24026247

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY
গাজীপুর-১৭০৫

একাডেমিক রেকর্ড কার্ড

পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন, হ্যান্ডব্যাগ ও বই আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

BA/BSS
প্রোগ্রাম
স্কুলের নাম : স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজেস

শিক্ষার্থী আইডি নম্বর : 24-0-23-974-040
(অফিস কর্তৃক পূরণের জন্য)

শিক্ষার্থীর নাম (বাংলায়) : মো: সোহেল
(ইংরেজি বড় অক্ষরে) : MD. SOHEL
পিতার নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজি বড় অক্ষরে) : MD. Jahangir Alam
মাতার নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজি বড় অক্ষরে) : Rohima
স্টাডি সেন্টারের নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা : Mohanagor College
বর্তমান ঠিকানা :
স্থায়ী ঠিকানা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে)/জন্ম নিবন্ধন নম্বর :
জন্ম তারিখ :
শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বর :
ই-মেইল (যদি থাকে) :
শাখা (গ্রুপ) :

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর
(Online রেজিস্ট্রেশন কার্ডে প্রদত্ত স্বাক্ষরের অনুরূপ হবে)

MD. ABDUL LATIF
Deputy Regional Director
Bangladesh Open University
Regional Center, Dhaka

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: সোহেল
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: মো: জাহাঙ্গীর আলম
মাতা	: রহিমা
পরিবারের তথ্য	
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: ৪০৫, বাগান বাড়ি, গুলশান, ওয়ার্ড ৩৮, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: লিংক রোড গুদারাঘাট
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই, বিকাল ৩.৩০ টা
আঘাতের ধরন	: পায়ে গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২৬ জুলাই ২০২৪, পঙ্গু হাসপাতাল, দুপুর ২ টা
প্রস্তাবনা	১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা ২. ছোট ভাইকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা

শহীদ ওয়াসিম

ক্রমিক : ৭৩৫

আইডি : সিলেট বিভাগ ৩১

জন্ম ও পরিচিতি

শহিদ ওয়াসিম ২০০৬ সালে সিলেটের জালালাবাদ উপজেলার ইনাতাবাদ ইউনিয়নের কান্দিগাও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কনর আলী ও মাতার নাম কল্পনা আক্তার। মাত্র ৫ বছর বয়সে শহীদ ওয়াসিমের মা মারা যান। তার পিতা অন্যত্র বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। সেই থেকে একমাত্র বোনের কাছেই লালিতপালিত হন তিনি। বোনের অভাবের সংসার। একারণে অনন্যোপায় হয়ে পাড়ি জমান ঢাকা শহরে। ঢাকার বাড্ডায় ছোট একটি বাসা ভাড়া নিয়ে স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস শুরু করেন। বোনের স্বামী ওয়েল্ডিং এর কাজ করতেন এবং তিনি অন্যদের বাসায় ঝিয়ের কাজ করতেন। অভাবী বোনের সংসারে পড়াশোনা শুরু করা হয়নি ওয়াসিমের। বোনকে সহযোগিতা করতে মুদির দোকানে কাজ শুরু করেন তিনি। বিগত কয়েকবছর ধরেই তিনি এ কাজ করে আসছেন।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থান

শহিদ ওয়াসিমের মা মারা যাওয়ার পর থেকে তার বাবা তাদের কোনো খোঁজখবর নিতেন না। তাই নিজ এলাকায় থাকতে না পেরে বোনের সাথে ঢাকায় চলে আসেন তিনি। বোনের অভাবের সংসারেই তার জীবন চলতে থাকে। বাধ্য হয়ে জীবীকার পথ বেছে নেন তিনি। তার স্বল্প আয়ে কোনোরকমে দিন চলতো। তাই নিজেদের স্থায়ী কোনো জমিজমা কিংবা বাড়িঘর করার সুযোগ ছিলো না তার। বাবার আর্থিক অবস্থান কিছুটা ভালো থাকলেও তার বোন মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল সারাদেশ। সারাদেশে কয়েক শত ছাত্রজনতা নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা শহরেই শতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। যাত্রাবাড়ি, রামপুরা, বাড্ডা, সাভারসহ বেশ কিছু জায়গা ছিলো আন্দোলনের মূল হটস্পট। সেদিন দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ডিউটি শেষ করে বাসায় এসে গোসল করে দুপুরের খাবার খান ওয়াসিম। জুমার নামাজের পর বাসায় এসে ভাগিনার খোঁজ করেন তিনি। তাকে কোথাও না পেয়ে তার খোঁজে বাহিরে যান ওয়াসিম। বাসা থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সুবাস্তু ও শাহজাদপুরের মাঝামাঝি মেইন রোডে পুলিশের গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। গুলি মাথার একপাশ থেকে ভেদ করে অপর পাশে চলে যায়। মাথার খুলি থেকে মস্তিষ্ক আলাদা হয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। প্রচুর রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। তবুও সাধারণ ছাত্র-জনতা উদ্ধার করে প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মূলত প্রাইভেট হাসপাতালগুলো আন্দোলনকারী কাউকে সেবা দেয়নি। কারণ স্বৈরাচার হাসিনার নির্দেশে সব জায়গায় পুলিশি পাহারা বসায়। ফলে পুলিশ সাধারণ জনগণকে চিকিৎসা সেবা নিতে দেয়নি। সেখানে তাকে ভর্তি না নেয়ায় পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেলে পৌঁছে দেয়। এদিকে স্থানীয় লোকজন তার পরিবারের লোকজনকে আহত হওয়ার বিষয়টি জানালে তারা অগত হাসপাতালে খোঁজ নেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছবি দেখে তাকে শনাক্ত করতে পেরে জানান যে, তাকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। সে কথা শুনে তার বোন ও ভগ্নীপতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল পৌঁছান। নিজের ভাইকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ও বেডে সন্ধান করতে থাকেন। হাসপাতালে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা মর্গে খোঁজ নেয়ার পরামর্শ দেন। একথা শুনে বোনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। বাধ্য হয়ে মর্গে খোঁজ নিয়ে একমাত্র ভাইয়ের রক্তাক্ত লাশ দেখে বাকহীন হয়ে পড়েন তার বোন। হাসপাতাল থেকে লাশ নিতে চাইলে কিছুতেই তারা লাশ দিতে রাজি হয়নি। অনেক বাকবিতন্ডার পর তারা ভাটারা থানায় যোগাযোগ করলে পুলিশ উলটা তাদেরকে গ্রেফতারের হুমকি দেয়। তাদেরকে মামলার ভয় দেখায়। শহিদ ওয়াসিম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকেই নাকি মারা গেছে তাই তার লাশ দেয়া যাবেনা বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় আওয়ামী পুলিশ। টানা চারদিন হাসপাতালের মর্গে ছোটাছুটি করে বহু কষ্টে একমাত্র ভাইয়ের লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হন। সেদিন রাতেই ট্রাক ভাড়া করে নিজ গ্রামে নিয়ে যান এবং সেখানেই তার দাফন সম্পন্ন হয়। ভাইয়ের শাহাদাতের পর তার বোন মানসিক ও শারিরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

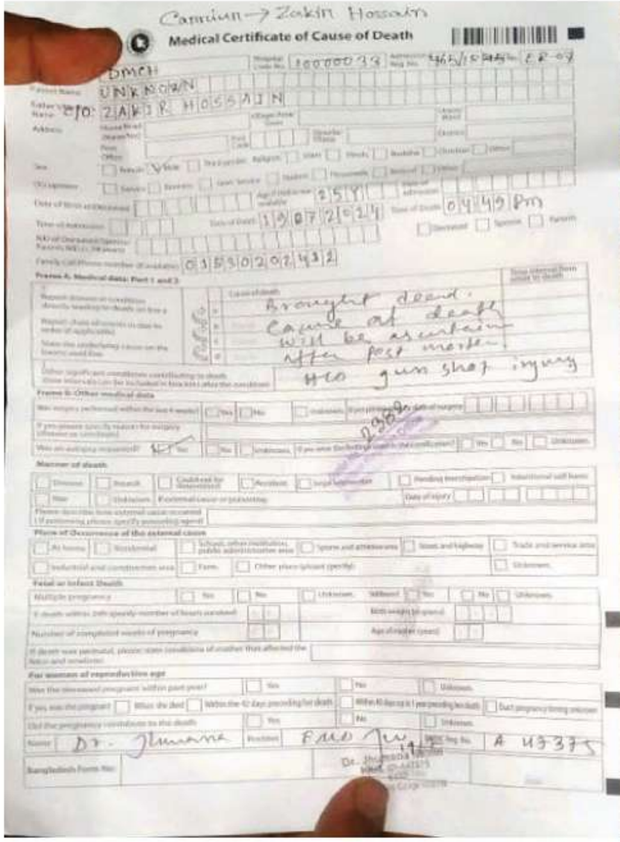
Camrium → Zakir Hossain
Medical Certificate of Cause of Death
DMCH
UNKNOWN
C/O: ZAKIR HOSSAIN
25Y
19 07 2024
04 49 Pm
01530202432
Brought dead.
Cause of death will be ascertain after post mortem
H/O gun shot injury

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: ওয়াসিম আহমদ
জন্ম	: ২০০৬, কদিগাও, ইনাতাবাদ, জালাল্যাবাদ, সিলেট
পেশা	: মুদির দোকানের কর্মচারী
পিতা	: কনর আলী
মাতা	: মৃত কল্পনা আক্তার
ভাই-বোন	: বোন ১, শিপা বেগম (২৮) গৃহিনী
স্থায়ী ঠিকানা	: এনাতাবাদ, ৯ নং ওয়ার্ড, কান্দিগাঁও, জালালাবাদ, সিলেট
বর্তমান ঠিকানা	: এনাতাবাদ, ৯ নং ওয়ার্ড, কান্দিগাঁও, জালালাবাদ, সিলেট
ঘটনার স্থান	: সুবাস্ত মেইন রোড, শাহজাদপুর সংলগ্ন, বাড্ডা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪
আঘাতের ধরন	: গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, ঢামেক
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম

প্রস্তাবনা

১. বোনের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

২. স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা

শহীদ জসিম ফকির

ক্রমিক : ৭৩৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৪৫

শহীদ পরিচিতি

মো: জসিম ফকির পেশায় ছিলেন দিনমজুর। তিনি ৫ আগস্ট ১৯৮৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ হায়াত আলী ফকির ও মায়ের নাম সেলিনা বেগম। জসিম ফকিরের স্ত্রীর নাম সারমিন খানম। তার তোহা ইসলাম তানহা নামে ৮ বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তান আছে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আশ্রয় থেকে বের হয়ে এসে নতুন দেশ বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে মুজিব ও তার দলের দূর্নীতি ও অবিচারের ফলে দেশে দূর্ভিক্ষ নেমে আসে। মানুষ না খেতে পেয়ে কোলের সন্তানকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এসময় ত্রান কর্তা হয়ে দেশবাসীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন সেনাবাহিনীর কিছু দেশপ্রেমিক অফিসার। তারা মুজিব ও তার খুনি বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ভারতের সহায়তায় আবার ক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশকে ভারতের তাবেদার রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলে। ইসলামপন্থীদের নির্মূল করে। প্রতিবাদকারীদের জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে খুন করে। ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাদের ১৬ বছরের শাসন পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্ট সময় হিসেবে স্থান লাভ করে। ছাত্র-জনতার একাংশ এই ঘাতক ও দেশবিরোধী অবৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করে। হাসিনার নির্দেশ ছিল যেকোন আন্দোলন দমাতে প্রয়োজনে লাশ ফেলে দিতে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কতিপয় জানবাজ নেতা-কর্মী। তারা সাধারণ ছাত্রদের ব্যানারে বিভিন্ন দাবী উপস্থাপন করতে থাকে এবং ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচী দিয়ে দেশবাসীকে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানায়। ইন্টারনেট বন্ধ এবং কারফিউ চলাকালে সমন্বয়কদের রক্ষার পাশাপাশি অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের অপকর্ম বিশ্ব মিডিয়ায় তুলে ধরে নিয়মিতভাবে।

কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালে সরকার কারফিউ, ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করাসহ জনবিচ্ছিন্ন নির্দেশনা জারি করে। সাধারণ মানুষ এতে দূর্ভোগের মুখে পড়ে। কাজ না থাকায় জসিম ফকির জুলাই মাসের সম্পূর্ণ সময় ঘরে বসে কাটান। বিশ বছর ধরে গাজীপুরের কালিয়াকৈর সফিপুর আমিরুল সুপার শপের পাশে স্ত্রী শারমিন খানম (২৭) ও একমাত্র কন্যা তোহফা ইসলাম তানহা (৭) কে নিয়ে বসবাস করতেন জসিম ফকির (৩৬)। আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন যখন অনিবার্য ঠিক সেইদিন গণঅভ্যুত্থানে যোগ দিতে কাউকে না জানিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন তিনি। দিনটি ছিল ৫ আগস্ট। এরপর আর দুইদিন তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবার থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি চলে। কিন্তু তারা হতাশ হন।

শেষ পর্যন্ত গত ৭ আগস্ট খুব সকালে এক নারী আনসার সদস্য জসিমের মৃত্যু সংবাদের কথা নিশ্চিত করেন। জসিমের স্ত্রী শারমিন ওইদিন বেলা ১২ টার দিকে লাশের সন্ধান পান গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। এরপর ৮ আগস্ট খুব ভোরে শহিদ জসিম ফকিরের লাশ এম্বুলেন্স যোগে নিয়ে আসা হয় তার নিজ গ্রাম বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার কলাতলা ইউনিয়নের চর চিংগুড়ী গ্রামে। এ গ্রামেই তার জন্ম। এ গ্রামই এখন তার শেষ ঠিকানা। লাশ গ্রামে পৌঁছালে হাজারো মানুষের ভীড়ে সৃষ্টি হয় শোকের আবহ। পুরো গ্রামজুড়ে চলে শোকের মাতম। চর চিংগুড়ি সরকারি প্রাইমারি স্কুল মাঠে জানাজা শেষে সকাল ৯ টায় স্থানীয় মাদ্রাসার পাশে কবরস্থানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। শহিদ জসিম ফকিরের বাবা মোঃ হায়াত আলি (৮০) ও মাতা সেলিনা বেগম (৬৭)। তারা জানান, জসিমের পিঠে ছিল বুলেট বিদ্ধের দাগ, নাক কান রক্তাক্ত, মুখমণ্ডল থেঁতলানো। তবে আন্দোলনে যোগ দেয়ার পর জসিম ঠিক কখন কিভাবে মারা গিয়েছিলেন তার প্রত্যক্ষ বিবরণ তার পরিবার পায়নি। জসিম ফকিরের রয়েছে আরও তিন ভাই। বড়ভাই মুরাদ হোসেন অনার্স ফাইনালের আগেই মানসিক রোগে আক্রান্ত হন। যাকে এলাকায় এক নামে 'পাগলা মুরাদ' বললে সবাই চেনে। জসিমের পরের ভাই রিয়াদ হোসেন ও ছোট ভাই আবির হোসেন রিফাত। তারা দুজনেই এস এস সি পাস করেছে। জসিমের একমাত্র কন্যা তোহফা ইসলাম তানহা গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ছে। স্ত্রী শারমিনের বাবা হেমায়েত হোসেন মোল্লা (৮০) ও মা আয়না মতি (৬০)। জসিম ফকিরের বাবাও একজন ভ্রাম্যমাণ পান বিক্রেতা। গ্রামের হাটে বাজারে ঘুরে ঘুরে পান বিক্রি করেন। সহায় সম্বল তেমন নেই।

পরিবারের বক্তব্য

স্ত্রী বলেন, 'আর্থিক অনুদান পাওয়ার অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু এখনও কোন সাহায্য সহযোগিতা মেলেনি। বাবার বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ি থেকে সামান্য যা পাচ্ছি তা দিয়েই কোনমতে চলছি। কিন্তু মেয়ের লেখাপড়ার খরচ তো ভবিষ্যতে বাড়বে। তখন কিভাবে কি করবো ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না।' জসিম ফকিরের বাবা মো: হায়াত আলি বলেন,আমরা খুবই অসহায়। আমাদের বলতে গেলে ভিটেমাটি সহায় সম্পত্তি কিছুই নেই। দিন চলে কোন রকমে। এর মধ্যে জসিমের স্ত্রী ও মেয়ের খরচ কে দেবে? কিভাবে চলবে তাদের? মা সেলিনা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি আমার পাগল ছেলে মুরাদকে নিয়ে কোনভাবে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছি। আমাদের কোন সহায় সম্বল নেই। সরকার ও রাষ্ট্রের কাছে আমাদের দাবি দেশের জন্য অকাতরে আমার সন্তান জীবন বিসর্জন দিয়েছে। সরকার যদি আমাদের বিপদে এগিয়ে আসে তাহলে বৃদ্ধ বয়সে ডাল আলুভর্তা খেয়ে কোনরকমে জীবন যাপন করতে পারতাম। আমরা সেদিকে তাকিয়ে আছি।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: জসিম ফকির
জন্ম	: ০৫ আগস্ট ১৯৮৮
পেশা	: দিনমজুর/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
পিতা	: মোঃ হায়াত আলী
মাতা	: সেলিনা বেগম
স্ত্রী	: সারমিন খানম
সন্তান	: তোহা ইসলাম তানহা, ২য় শ্রেণি, শাহীন ক্যাডেট স্কুল, গাজীপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: চর চিংগুড়ী, কলাতলা, চিতলমারী, বাগেরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: আমিরুল সুপার শপ, শফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
ঘটনার স্থান	: অজ্ঞাত
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট
আঘাতের ধরন	: পিঠে বুলেট বিদ্ধের দাগ, নাক কান রক্তাক্ত, মুখমণ্ডল থেঁতলানো
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট
শহীদের কবরের অবস্থান	: চর চিংগুড়ী কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

২. সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় প্রদানে সহযোগিতা করা

সামান্য একজন হকারকেও ছাড় দেয়নি খুনি হাসিনার কুখ্যাত ত্রাস ছাত্রলীগ ও যুবলীগ বাহিনী

শহীদ মো: শাহজাহান মিয়া

ক্রমিক : ৭৩৭

আইডি : ঢাকা সিটি ১২১

শহীদ পরিচিতি

সরকারি চাকরিতে কোটা থাকবে কি থাকবে না, এই চিন্তা করার ফুরসত ছিল না শাহজাহানের। কোন কাজটি করলে দুটি টাকা বেশি আসবে, এই ছিল তার নিত্য ভাবনায়। মায়ের পরামর্শ ছিল, "বাবা তোর যহন এত অভাব, লজ্জা রাইখা করবি কী?" তার মানে কোন কাজকে ছোট ভাবা বা কোন কাজ নিয়ে লোক লজ্জার কিছু নেই, যেখানে যা পাওয়া যায়, তাই করতে হবে। মায়ের সেই উপদেশ মেনেই কাজ করতেন দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী শাহজাহান। তার জন্ম ১৯৯৯ সালে। বেড়ে ওঠা রাজধানীর কেরানীগঞ্জ মীরেরবাগ পোস্তগোলা এলাকায়। পরবর্তীতে জীবীকার তাগিদে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে কামরাঙ্গীরচরের চান মসজিদ এলাকায় ভাঁড়া বাড়িতে থাকতেন। তাঁর প্রয়াত বাবার নাম মহসিন এবং মায়ের নাম আয়েশা বেগম। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে শাহজাহান ছিলেন তৃতীয়। পেশায় হকার হলেও সংসারের দায়িত্ব পালনে কোন কমতি রাখতেন না। প্রতিদিন সকালে জীবীকার তাগিদে বাসা থেকে বের হতেন। উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিউমার্কেট এলাকার বলাকা সিনেমা হলের সামনে ফেরি করে পাপোশ বিক্রি করাই ছিল তাঁর একমাত্র যোগান। মাস তিনেক আগে তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। তবে অনাগত সন্তানটি পৃথিবীর মুখ দেখতে পারেননি। সন্তান মারা যাওয়ায় স্ত্রীর চিকিৎসা বাবদ অনেক টাকা খরচ হয় শাহজাহানের। ঋণও করতে হয়। সেই টাকা শোধ দিতে না পারায় নিউমার্কেটের আগের জায়গায় দোকান বসাতে পারছিলেন না তিনি। একমাস ধরে বলা যায় বেকারই ছিলেন।

শাহাদাতের বিবরণী

একটি ভবনে বিদ্যুতের কাজ করতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন শাহজাহান। তার মা বলেন, "ওয় ইলেকট্রিকের কাম, ওয়ার্কশপের কামও জানত। ওর এক মামায় কইছে ধানমন্ডিতে বিল্ডিংয়ের কামে জয়েন দিতে। মঙ্গলবার সকালে উইঠা বাইরাইছে। ওর বউয়ে ভাত সাধছে, ও খায় নাই। সকাল থিকা কাম করছে। দুপুরের পর খাওয়ার জন্য সবাই বাইর হইছে আর ও বাড়ির দিকে হাঁটা দিছে। শরীরটা বলে খারাপ লাগতাছিল। এরপর কী হইল আমরা কিছু জানি না। আমরা হাসপাতালে গিয়া পোলার লাশ পাইলাম।"

মূল ঘটনা

১৭ জুলাই, মঙ্গলবার ২০২৪। সকাল গড়িয়ে দুপুর নামে। বেলা ২টায় সায়েন্স ল্যাব এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকে প্রতিহত করতে হঠাৎ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ-সময় পেটুয়া হাসিনার সন্ত্রাস বাহিনীরা ঢাকা কলেজের ফটকের সামনে অবস্থান করে। দূর থেকে টার্গেট করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। জখম শরীরে অনেকেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। খুনি হাসিনার ইন্ধনে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর এই হামলা অবশ্যই চরম ঘৃণিত ও জঘন্য অপরাধ। একপর্যায়ে রামদা, লাঠি, শর্টগান নিয়ে তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ভূঁয়ে রাস্তা থেকে সড়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন শাহজাহান। এরপর ঢাকা কলেজের পেটুয়া দল আরও মারমুখী ভুমিকায় যায়। জান বাঁচাতে প্রাণপণ দৌড়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সিটি কলেজের গলিতে অবস্থান নেন শাহজাহান। আকস্মিক ঘাতক আওয়ামী দোসরদের একটু গুলি তাঁর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। দুপুর থেকে বিকাল, বিকাল থেকে সন্ধ্যা। যেন চারিদিকে রণাঙ্গন অনুভূত হয়। শাহজাহান গুলিবিদ্ধ জখম শরীরে রাস্তায় পড়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এরপর কয়েকজন কিশোর গোলাগুলি উপেক্ষা করে মর্মান্তিক জখম অবস্থায়

সিটি কলেজের সামনের রাস্তা থেকে উদ্ধার করে তাঁকে পপুলার মেডিকেলে নিয়ে যান। ততক্ষণে অবস্থা বেশ বেগতিক। কোনরকম শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে। তবে রক্তক্ষরণের মাত্রা অনেক বেশি। রক্ত বন্ধ করতে না পেরে পপুলার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেলে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঢামেকের মর্গ থেকে শাহজাহানের মরদেহ শনাক্ত করেন তাঁর মা আয়েশা বেগম ও মামা মোসলেম উদ্দিন।

পরিবারের অনুভূতি

সন্তান হারা মায়ের আহাজারি দেখে তাঁর সাথে দেখা করে কথা বলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: আসাদুজ্জামান। শহীদ জননী বড় দুঃখ করে তাকে বলেন, "স্যার আমার পোলাডা প্যাটের দায়ে কাম করতে বাইর হইছিল। কে ওরে এ্যামনে মারল?"

শাহাদাতের ঘটনার সত্যতা নিয়ে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী উল্লেখ করা হলো ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া বলেন, একজন অ্যাম্বুলেন্সচালক সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শাহজাহানের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ছেলেটিকে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অ্যাম্বুলেন্সচালক আলী মিয়া বলেন, সিটি কলেজ সংলগ্ন পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে ফোন পেয়ে তিনি সেখানে যান। সেখানকার লোকজন ছেলেটিকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসতে বলেন। তিনি ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাস্টমার কেয়ার প্রতিনিধি হৃদয় বলেন, কয়েকজন ছেলে সন্ধ্যার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় শাহজাহানকে নিয়ে আসেন। তখন তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শহীদের ঘটনা নিয়ে কয়েকটি মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে

1. https://www.jugantor.com/capital/828876
2. https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/0j233xhxqg
3. https://dailyamadermatribhumi.com/article/78772

খুনি হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনামল

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ক্ষমতায় আসার দুই মাস পর ২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে হাজার হাজার আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে। বাহিনীর অগণিত জোয়ানকে

নিষ্ঠুরভাবে ও নির্মমভাবে হত্যা করে। বিরোধী দল ও রাজনৈতিক অন্যান্য দলকে অপদস্ত করতে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ, হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে হামলা-ভাঙচুর, হাজার হাজার মানুষকে পৈশাচিকভাবে হত্যা ও অসংখ্য নারীকে ধর্ষণের এক অকথ্য নির্মম-রক্তাক্ত-বিপন্ন নিকষ কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি করে ফ্যাসিস্ট দলটির নেতাকর্মীরা। যার সরাসরি ইন্ধনদাতা ছিল রক্তপিপাসু স্বৈরাচার হাসিনা। আওয়ামী আমলে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিত ভাবে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেছিল এই নরপশু হাসিনা ও তাঁর পিশাচ বাহিনী।

বিগত ১৬ বছর স্বাধীনতাবিরোধী-বাংলাদেশ বিরোধী, কট্টর ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ও কুখ্যাত সশস্ত্র আওয়ামী সন্ত্রাসরা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদেরকে কোণঠাসা করে জোরপূর্বক ক্ষমতায় অবস্থান করেছিল। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের হিংস্র বাসনায় পরিকল্পিতভাবে এই ষড়যন্ত্রকারীরা স্বাধীনতাকামী দেশের আপামর জনতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ, বানোয়াট ও গুজব প্রচারের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে দেশে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পাশাপাশি ২০২৪ সালে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতি ঘটিয়ে জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও শত শত সাধারণ মানুষকে পরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে হত্যা করে এই ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা সরকার। এছাড়াও মেট্রোরেল, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সেতুভবন, ডেটা সেন্টার ও হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিসংযোগ, স্কুল-কলেজ, শিল্প-কারখানা, বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। অথচ তার আগের সরকার বেগম খালেদা জিয়া সকল চিহ্নিত জঙ্গিদেরকে আটক করে ফাসির রায় দিয়ে দেশকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন। দেশের শত্রু হাসিনা সরকার স্বাধীনতাবিরোধী, বাংলাদেশ বিরোধী, মহান ৭১ বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী বর্বর ভারত বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে বিচারহীনভাবে মানুষের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ পুরো বাংলাদেশে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। এখানেই এই বর্বর গোষ্ঠীর হিংস্র থাবা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেমে থাকেনি। মানুষখেকো পিশাচিনী হাসিনার মদদ পেয়ে বিতর্কিত আওয়ামী চেলাচামুণ্ডারা ভারত বিদ্বেষী দেশের অতি সাধারণ জনদরদী বর্ষীয়ান নেতাদের বাসভবনে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সকল চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে দেশের

স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে জাতীর সামনে খলনায়ক করে উপস্থাপন করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে তার বাড়ি থেকে বিতারিত করে অগ্নিসংযোগ ও বাঙালি জাতির জন্মের ইতিহাস ও অস্তিত্বের উপর আঘাত হানে। সারাদেশে জঙ্গি তৎপরতা, হামলা-অগ্নিসংযোগ, নির্বিচারে গণহত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী, জঙ্গি ও উগ্র-সাম্প্রদায়িক ভারতপন্থী সরকার প্রধানের ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয় দেশের সকল নথিপত্র বিদেশে বিক্রি করে দেয়। (তথ্যসুত্র-যুগান্তর পত্রিকা, ১০ অক্টোবর ২০২৪ https://www.jugantor.com/national/863185)

জোরপূর্বক ক্ষমতাদখলকারী ভোট চোর খুনি হাসিনা ও তার উগ্রপন্থী জঙ্গি দোসরদের ভয়াবহ অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সীমাহীন লুটপাট, রাষ্ট্রীয় অর্গানগুলোর অপব্যবহার, নির্বিচারে সাধারণ মানুষের ওপর নারকীয় তাণ্ডবে দেয়ালে পীঠ থেকে যায়। এরপর সারাদেশ ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে নব উদ্যমে একযোগে জাগ্রত হয়। ফলে আওয়ামী দোসররা আপমর জনতার কাছে হার মেনে দেশ ছেড়ে কোন রকম জান নিয়ে প্রাণে বাঁচে। বর্তমান বাংলাদেশে এক নতুন দিগন্তের সুচনা হয়েছে। শহীদ শাহজাহানের মত যাদের আত্নত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে দেশটি দ্বিতীয় বারের মত স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আমরা তাদেরকে স্যালুট জানাই। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন এ-সকল তরুণ তুর্কিদের শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করেন। (আমিন)

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: শাহজাহান মিয়া
জন্ম	: ১৯৯৯ সাল, বয়স: ২৫
পেশা	: হকার (নিউমার্কেট এলাকায় পাপোশ বিক্রি করতেন)
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: কেরানীগঞ্জ, মীরেরবাগ পোস্তগোলা, ঢাকা
পিতা	: মৃত মহসিন
মাতা	: আয়েশা বেগম, পেশা: গৃহকর্মী
ভাই-বোনের বিবরণ	: তিন ভাই ও এক বোন
আহত হওয়ার সময়	: ১৭ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক বিকাল ৪:০০টা
ঘটনার স্থান	: সায়েন্স ল্যাব, সিটি কলেজ মোড়, ঢাকা
আক্রমণকারী	: হিংস্র ছাত্রলীগ ও যুবলীগ বাহিনী
চিকিৎসা সেবা নেওয়া হাসপাতাল	: ১. পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা
	: ২. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ঢামেক)
শাহাদাতের তারিখ, সময়, ও স্থান	: ১৭ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ৭.৩০, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
লাশ হস্তান্তর	: ১৭ জুলাই ২০২৪
দাফন কাফন	: ১৮ জুলাই ২০২৪

প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে

২. পরিবারকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা প্রয়োজন

৩. শহীদ জননীকে স্থায়ী বাসস্থান উপহার দিলে পরবর্তী জীবন সুন্দর ভাবে কাটাতে পারবেন

শহীদ তানজীর খান মুন্না

ক্রমিক : ৭৩৮

আইডি : বিভাগ ঢাকা ১৪৫

জন্ম ও পরিচিতি

তানজীর খান মুন্না ২০০৩ সালে ২৩ অক্টোবর ঢাকা জেলার সাভারে জন্ম গ্রহন করেন। তার বাবার নাম মোঃ রাজা খান এবং মায়ের নাম আমেনা বেগম তিনি সাভার সরকারী কলেজের ডিগ্রি ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শেখ হাসিনার মতো হিংস্র ফেরাউনকে সরিয়ে দেয়ার মতো সাহস কারো ছিলোনা। যারাই এরকম কিছু করার চেষ্টা করেছে আওয়ামীলীগ তাদের স্বপরিবারে দেশ থেকে নির্মুল করেছে। জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির নেতাদের হামলা, মামলা, ভয় কিংবা অর্থের লোভ দেখিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল। কোকো রহমান আওয়ামী নির্যাতনে স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেন। তারেক রহমান বিদেশে নির্বাসিত হন। এদেশের বাকি নেতারা গর্জালেও প্রয়োজনের সময়ে আওয়ামীলীগকে প্রতিহত করতে ব্যার্থ হন। জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরকে গুম, খুন, গ্রেফতার, ফাঁসিতে ঝোলানোসহ নির্মমতার সকল পদক্ষেপ নিলেও চরম্ভাবে ব্যার্থ হয় আওয়ামীলীগ। তারা ভেবেছিল ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে দলীয় অদক্ষ চাটুকারদের নিয়োগ দিয়ে ২০৪০ সাল পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে বংশ পরম্পরায় ক্ষমতায় থেকে বাংলাদেশকে লুটেপুটে খাবে। কিন্তু শহীদ তানজীর খানের মতো কিছু সাহসী, উদ্যমী ও ত্যাগী ছাত্ররা স্বৈরাচার সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। শেখ হাসিনা ও তার এমপিরা সবসময় বড়াই করতো কোন শক্তিই তাদের পরাজিত করতে পারবেনা। আমিত্বে মত্ত শেখ হাসিনার অহংকার তাকে ডুবালো। জুলাই আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে হত্যা করেও তার শেষ রক্ষা হলোনা। ছোটবোনসহ ভারতে পালাতে হলো।

শেখ হাসিনা ও তার বামনেতারা উপলব্ধি করেছিল আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির। আর তাই ১ আগস্ট তাদের নিষিদ্ধ করে গণহত্যার পরিকল্পনা করে। সাধারণ ছাত্র-জনতা এতোদিনে বুঝে গিয়েছিল আওয়ামীলীগ প্রতিবাদী দেশপ্রেমিকদের সবসময় জামায়াত-শিবির ও রাজাকার আখ্যা দিয়ে নির্মম নির্যাতন, গুম, খুন করেছিল। এবারে এমন নির্যাতন তাদের উপরে চালানো হবে। ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতা নিরস্ত্র হাতে প্রতিরোধ ঘটিয়ে বসে। এতে হাসিনা প্রশাসনের পীলে চমকে উঠে। পালাতে থাকে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ও তার ছোটবোন গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে পালিয়ে যায়।

মুন্না জুলাই আন্দোলনে অত্যন্ত ঝুঁকি থাকা সত্বেও রাস্তায় ছিলেন বন্ধুদের নিয়ে। আন্দোলনে সবসময় সক্রিয় ছিলেন। মিছিলে সবসময় সামনের সারিতে থাকতেন। ৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে স্বৈরাচার মুক্তির আনন্দ মিছিল থেকে ফেরার সময় সাভার মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হন। পরিবর্তীতে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হলে সেখানে ডাক্তার মৃত ঘোষনা করেন ।

অর্থনৈতিক অবস্থা:

শহীদের পরিবারের নিজস্ব কোন ঘর বাড়ি নেই তার ফুফুর বাসায় তাদের পরিবার থাকেন। তার বাবা বহুবছর যাবত অসুস্থ। তিনি মুন্নার চাচার বাসায় থাকেন। পরিবারে উপার্জনক্ষম শহীদের একমাত্র ভাই রাজিব খান। তিনি পেশায় একজন ফটোগ্রাফার। একটি স্টুডিওতে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে চাকুরী করেন। মা ডায়াবেটিকসের রোগী। প্রতি মাসে তার ৩৫০০ টাকার মেডিসিন লাগে

নিউজ লিংক

https://www.bssnews.net/bangla/stories-of-mass-upsurge/150721

https://www.facebook.com/share/p/15v2LJt4Lo/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/v/18PFvLL1mj/?mibextid=wwXIfr

https://www.observerbd.com/news/505351

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/357152/student-movement-martyr-munna-will-forever-live-in?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR00vJheH9TLNpRFuu1WoFQwvPrc0V3_U21y2ELYiNiR-8HMY--f79H85l4_aem_SgPmXqQV-o71IeEvZUHTRw

https://www.facebook.com/share/v/15cYEGpUzm/?mibextid=wwXIfr

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত রোভার স্কাউটদের তথ্য

ক্রম	নাম ও মোবাইল নম্বর	স্কাউট পরিচিতি ও ইউনিটের নাম	মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৬
১	শহীদ স্কাউটার মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ	[illegible], আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা	'পানি লাগবে পানি' বলে পানি বিতরণ করতে করতে পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।
২	শহীদ রোভার রোমান আহমেদ খান	রোভার মেট, [illegible] কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ।	গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।
৩	শহীদ রোভার তানজীর খান মুন্না	প্যাক্সহিল ওপেন স্কাউট গ্রুপ, সাভার, ঢাকা।	গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।
৪	শহীদ রোভার আহনাফ আহমেদ	বিএফ শাহীন কলেজ ঢাকা এয়ার স্কাউট গ্রুপ	গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

Md. Iqbal Hossen
Deputy Director (CDH & MCF)
Bangladesh Scouts

বাংলাদেশ স্কাউটস

নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ স্কাউটস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: তানজীর খান মুন্না
Name: TANJIR KHAN MUNNA
পিতা: মোঃ রাজা খান
মাতা: আমেনা বেগম
Date of Birth: 23 Oct 2003
ID NO: 8710690598

বাংলাদেশ স্কাউটস

শোকবার্তা

প্যাক্স হিল ওপেন স্কাউট গ্রুপ, সাভার, ঢাকা এর রোভার স্কাউট তাঞ্জির খান মুন্না গত ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়ান ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল পর্যায়ের স্কাউট নেতৃবৃন্দ, রোভার স্কাউট, স্কাউট ও কাব স্কাউট সদস্য গভীরভাবে শোকাভিভূত। তাঁর মৃত্যুতে আমি স্কাউট পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহতালার নিকট মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করছি। আল্লাহ তাঁর পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন

(ড. মোঃ শাহ্ কামাল)
প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: তানজীর খান মুন্না
জন্ম	: ২৩/১০/২০০৩
পেশা	: ছাত্র সাভার সরকারী কলেজ (ডিগ্রি ২য় বর্ষ)
পিতা	: মো: রাজা খান
মাতা	: আমেনা বেগম
ভাই-বোন	: ১ ভাই মো: রাজিব খান
স্থায়ী ঠিকানা	: বাসা/হোল্ডিং: এ ১৫/২, গ্রাম/রাস্তা: আনন্দপুর, ডাকঘর : সাভার-১৩৪০, সাভার পৌরসভা, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: এ ১৫/২, গ্রাম/রাস্তা : আনন্দপুর, ডাকঘর: সাভার-১৩৪০, সাভার পৌরসভা, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: সাভার মডেল থানার সামনে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬.৩০
আঘাতের ধরন	: বাম পায়ের উরুর অংশে
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট, রাত ৯ টা, সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ
শহীদের কবরের অবস্থান	: সাভার তালবাগ কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের জন্য পুনর্বাসন করে দেওয়া

২. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ আবদুল্লাহ ইবনে শহীদ

ক্রমিক ৭৩৯

আইডি খুলনা বিভাগ ৬২

শহীদ পরিচিতি

বাংলার ফেরাউন দস্যুরানী শেখ হাসিনার জোর করে দখলে রাখা সিংহাসন কাঁপিয়ে দিতে যেসকল দেশপ্রেমিক তরুণ নিজের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে শহীদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে যশোর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শহীদুল হক এবং মায়ের নাম রওশন আরা। আবদুল্লাহ ইবনে শহীদ মৃত্যুর আগে স্ত্রী মুমতারিন জান্নাতুলকে নিয়ে সংসারের ইনিংস শুরু করেছিলেন। তাদের সংসারে রাইয়ান নামে একটি সন্তান আছে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের উপর চেপে বসেছিল এক ভয়ংকর হিংস্র ডাইনি। যিনি দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে জনতাকে একেক সময় একেক রান্নার রেসিপি উপহার দিতেন। অর্থ লুটপাট করে দেশের রিজার্ভ যেমন শেষ করে ফেলেছিলেন তেমনি অধিক পরিমাণে বিদেশী ঋণ গ্রহণ করে দেশকে ঋণগ্রস্থ করে তোলেন। প্রত্যেকের মাথা পিছু ঋণ ১ লাখ ডলার ছাড়িয়ে যায়। প্রতিবাদীদের জেল, গুম, খুন করে নির্মূল করতেন। তার পলায়নে আয়নাঘরে ভয়াবহতা জাতি প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে হাসিনা বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে ছাত্র-জনতার উপরে গুলি চালাতে থাকেন। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেন। এসময় ইসলামী ছাত্রশিবির সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে অত্যন্ত কৌশলী ভূমিকা পালণ করে। সরকারী জুলুম-নির্যাতনের মধ্যেও তারা বিভিন্ন দফা দাবী তোলে আন্দোলনকে গতি প্রদান করে। একেক দিন একেক রকম আন্দোলনের শিরোনাম দেখে জাতি উজ্জীবিত হচ্ছিল এবং দলে দলে অংশ নিচ্ছিল অন্যদিকে আওয়ামী প্রশাসন বিভ্রান্ত হচ্ছিল। ছাত্র শিবির ছাত্র নেতাদের সেইফ জোনে রেখে আন্দোলনকে বেগবান রেখে চলে।

রাজপথে আন্দোলনের ভয়াবহতা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র তাহমিদ হুজাইফা নামক এক গুরুতর আহত ছাত্র তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"২ অগাস্ট 'মার্চ ফর জাস্টিস' সফল করার জন্য আমরা উত্তরাতে জমায়েত হই। সেদিন আমরা ঘোষণা দেই জুমার নামাজের পর মিছিল বের করবো। জুমার নামাজ শেষ হলে খুব শান্তিপূর্নভাবে উত্তরা বি এন এস এর এখান থেকে মিছিল নিয়ে উত্তরা ১১ নাম্বার সেক্টরে যাই। উত্তরা ১১ নাম্বার সেক্টরে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পারি সেখানে আগে থেকেই স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগের সন্ত্রাসীরা ও পুলিশ বাহিনী মিলে ভারি অস্ত্র, শর্টগান,পিস্তল নিয়ে অবস্থান করছিল। আমরা সেখানে সংখ্যায় অনেক কম ছিলাম। মাত্র ২০০-২৫০ জনের মত হবে।

সম্ভবত কি কারনে জানিনা হয়তো আমাদের সংখ্যা কম দেখে তারা আমাদেরকে রাস্তা করে দেয় মিছিল নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য। মিছিল নিয়ে তাদেরকে পাস করে আমরা যখন সামনে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করছিলাম তখনই তারা আমাদের ওপর হামলা করে। আমরা চিন্তাও করিনি এতো অল্প কিছু মানুষ যেখানে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি সেখানে তারা হামলা করবে। তারা অনবরত গুলি বর্ষন করে যাচ্ছিল। যেহেতু সেখানে মেয়েরা সংখ্যায় বেশি এবং ছেলেরা কম ছিল তাই আমাদের পক্ষে এতো বড় বাহিনীকে মোকাবেলা করা সহজ হচ্ছিলনা তারপরও আমরা আমাদের জায়গা থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে তাদের মোকাবেলা করার চেষ্টা করছিলাম।

এভাবে যখন ঘন্টাখানেক সংঘর্ষ চলছিল তখনি আমরা দেখতে পেলাম ৫-৬ জন অস্ত্রধারি পিস্তল,বন্দুক, শট গান নিয়ে আমাদের একদম সামনে চলে আসে এবং আমাদের লক্ষ্য করে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করতে থাকে। আমি সহ বেশ কয়েকজন তখন সামনে ছিলাম, আমরা তাদের গুলি উপেক্ষা করে খালি হাতে তাদের মোকাবেলা করার চেষ্টা করছিলাম।

একসময় তারা আমাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধাওয়া দিলে আমরা সবাই একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ি। আমরা তখন গলির মুখে দাঁড়িয়েই ছিলাম, তাদের থেকে মাত্র ১০-১২ ফিট দূরে হবে, তখন তারা আমাদের লক্ষ্য করে আরেক দফা গুলি বর্ষন করে। সেবারই আমার মুখে ও শরীরে ছড়রা গুলি লাগে, সেসময় আমার সাথে আরও একজন ছেলের গুলি লাগে।

যখন গুলিটা আমার মুখে এসে লাগে তখন খুব কাছ থেকে চোখের সামনে দিয়ে দেখলাম যে গুলি টা এসে লাগল। এখানে মজার বিষয় হলো, যে আমাকে গুলিটা করে তাকে আমি চিনতে পারি যেহেতু আমি উত্তরার স্থানীয় এবং অনেক বছর ধরে এখানেই থাকি। সে ছিলো কাউন্সিলরের ছেলে। আমার মুখে-চোখে যখন গুলি লাগে তখন আমি ভাবছিলাম এখানেই হয়তো আমি মারা যাব। যেহেতু এর আগের দিনও আমি দেখেছি ছড়রা গুলি লাগার কারনে আমার পাশে একজন শহীদ হয়ে যায়। একথা মনে হওয়ার সাথে সাথেই আমি সেখানে বসে পড়লাম এবং আমার পাশের একজন ভাইকে বললাম আমি তো মনে হয় আর বাঁচবো না, এটা বলে আমি কালেমা পড়া শুরু করে দেই।

সেখানের আমার পূর্ব পরিচিত বেশ কয়েকজন ভাই আমাকে পাশের ছোট একটি ক্লিনিকে নিয়ে যায়। যদিও সেখানে তেমন কোনো চিকিৎসা দেয়া যায়না কারণ সেটা খুব ছোট একটি ক্লিনিক ছিল। সেখানেও ছাত্রলীগ এসে হামলা চালানোর চেষ্টা করে কিন্তু ক্লিনিকের দরজা লাগিয়ে দেয়ার কারণে তারা উপরে আসতে পারে নাই।

তখন আমরা সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। ব্লাড মুছে আমাকে সেখানে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়। ক্লিনিক থেকে বলা হয়, "আপনার চোখে যেহেতু গুলি লেগেছে তাই আপনি এখানে থাকতে পারবেননা, আপনি ভালো কোনো হসপিটালে যান।"

সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামার কারণে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে সরে গেলে আমি তখন ক্লিনিক থেকে বের হতে সক্ষম হই। আমাকে নেওয়ার জন্য এম্বুলেন্স আসলে সেই এম্বুলেন্স ভাংচুর করা হয়।

যেহেতু আন্দোলনে যাওয়ার আগে আমি বাটন ফোন কিনি তাই ফোনে নতুন সিম লাগানো ছিল। এজন্য বাসার কারও সাথেও কানেক্ট হতে পারছিলাম না। কিন্তু যখন আমার গুলি লাগে সেটা কেউ একজন ভিডিও করে অনলাইন এ পোস্ট করে এবং ভিডিওটি বেশ ভাইরাল হয়ে যায়। সেই ভিডিও দেখে আমার বাসার লোকজন প্রথমে দেখতে পায় যে আমার গুলি লাগে। তখন আমার ছোট বোন আমার টেবিল থেকে নতুন সিমের নাম্বারটা খুঁজে বের করে কল দেয়। তো এভাবেই বাসা থেকে আমার সাথে রিচ করা হয়।

সন্ধ্যার সময় বাসা থেকে গাড়ি পাঠানো হলে আমাকে ক্লিনিক থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্লিনিক থেকে তাৎক্ষণিক আমাকে নিয়ে

যাওয়া হয় আগারগাঁও চক্ষু বিজ্ঞান হসপিটালে। সেখানে যাওয়ার পর আমাকে বলা হল, আপনার চোখের এক্সরে করাতে হবে। এক্সরের জন্য বের হয়ে দেখি সেখানেও পুলিশ উপস্থিত। হয়তো কোনোভাবে ইনফরমেশন গিয়েছে। উত্তরাতেও বিভিন্ন হসপিটালে তখন পুলিশ আমাকে খুঁজতে থাকে।

আমি কোনোভাবে তখন এক্স-রে করাই কিন্তু হসপিটালে আর ফেরত যেতে পারিনি।

এর মধ্যে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং ট্রিটমেন্ট নেওয়ার ব্যাপারে সেখান থেকে আমাকে সাহায্য করা হয়। ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে যোগাযোগ করে সেখানে আমার চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ভার্সিটি থেকে বলা হয়, আমার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ তারা বহন করবে। এভাবে পরের দিনই আমি ইসলামিয়া হসপিটালে চিকিৎসা পাই, সেখানে আমার অপারেশন হয় এবং আমার চোখ থেকে বুলেট অপসারণ করা হয়।

সে অবস্থায় আমরা আমাদের পরিচয় সেখানে কোনভাবেই বলতে পারিনি। হাসপাতালে আমার ইনজুরির কারণ এক্সিডেন্ট হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। এছাড়া আমার ঠিকানাও চেঞ্জ করে দিয়ে আসতে হয়।

হসপাতালে গিয়ে আমি দেখতে পাই আমারই মতন অনেকে আহত হয়ে মুখোমুখি বসে আছে কিন্তু কেউ কাউকে জিজ্ঞেশ করার সাহস পাইনি কিভাবে কী হলো।

বুলেটে আমার চোখের বেশ বড় একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রায় ত্রিশটার মতন শেলাই দেয়া লাগে। চোখের রেটিনা এবং ব্রেইন এর সাথে যে নার্ভটা চোখের সাথে কানেক্টেড সেটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়। যার কারনে এখনও আমার দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি ফিরে আসেনাই। চোখে নরমাল এর মতন দেখিনা যাস্ট আলোটা দেখি আরকি। ডাক্তার বলেছেন যেহেতু রেটিনা একদম ডিসফাংশন হয়ে যায় নাই তাই হয়তো আমি সামনে কিছুটা দেখতে পারি।

২ তারিখে গুলি লাগার কারনে পরবর্তী ৩ ও ৪ তারিখ আমি হসপাতালে ভর্তি থাকি। ৫ তারিখের বিজয় মিছিলেও সামিল হতে পারিনি। ৫ তারিখ খবর পাই যে হাসিনা পালিয়ে গেছে।

গত ডিসেম্বরে আবারও আমার সার্জারী হয়। ডাক্তার বলেছে আরও ৫-৬ মাস চোখ এভাবেই থাকবে। আমার চোখে সেলাই দিয় এক ধরনের সিলিকন জেল দিয়ে দেওয়া হয় যেনো চোখের শেপটা ঠিক থাকে। এখনও আমার চোখে জেল দেয়া আছে। ৫-৬ মাস পর জেলটা রিমুভ করা হলে বোঝা যাবে যে, ডান চোখে আদৌ দেখতে পাব কিনা। আপাতত শুধু ঝাপসাভাবে আলোর উপস্থিত বুঝতে পারি, আর তেমন কিছুই দেখতে পারিনা।

৪ আগস্ট প্রতিবাদী ছাত্র নেতারা ৬ আগস্ট **'মার্চ ফর ঢাকা'** কর্মসূচী দেয়। কিন্তু ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতারা অনুভব করেন সরকারকে বেশি সময় দেয়া হলে তারা গণহত্যা চালাবে। তাই ৬ তারিখের স্থলে ৫ তারিখ কর্মসূচী প্রদান করা হয়। জনতা ৫ আগস্ট ভোর থেকে রাজপথে সাহসীকতার সাথে জমায়েত হতে থাকে। সারাদেশ তখন উত্তাল। সকল জেলা শহর এই কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে শহরের মূল কেন্দ্রে এসে জড়ো হতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে শহীদ ৫ আগস্ট বিজয় মিছিলে অংশ নিয়ে দরাটানা পৌঁছান। খুনি হাসিনার আগে থেকে নির্দেশ ছিল গণহত্যা পরিচালনা করার। যশোরের মিছিলে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর দোসর ও ঘাতক পুলিশ আক্রমণ করলে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় মিছিলকারীর একাংশ দরাটানা জাবির ইন্টারন্যাশনালে আশ্রয় নেয়। আবদুল্লাহ ইবনে শহীদও নিজেকে হেফাজত করতে সেখানে অবস্থান নেন। মুহূর্তেই হিংস্র হয়ে উঠা ঘাতক বাহিনী সে ভবনে অগ্নিসংযোগ করলে সেখানে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আব্দুল্লাহ ইবনে শহীদের বাবা কৃষিকাজ করেন। সন্তানের মৃত্যুতে তাদের পরিবারে দারিদ্র অবস্থা তৈরী হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আব্দুল্লাহ ইবনে শহীদ
Name: MD. ABDULLAH IBNE SHAHID
পিতা: শহীদুল হক
মাতা: রওশন আরা
Date of Birth: 06 Feb 1997
ID NO: 7803124218

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Jessore Paurashava
Jashore Sadar, Jashore
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
01/09/2024	19974121603257160	01/09/2024

Date of Birth : 06/02/1997 Sex : Male
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: আব্দুল্লাহ ইবনে সহিদ	Name	: Md. Abdullah Ibne Shahid
মাতা	: রওশন আরা	Mother	: Rowshon Ara
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: সহিদুল হক	Father	: Shahidul Haqe
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: যশোর, বাংলাদেশ	Place of Death	: Jashore, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: আগুনে পুড়ে মৃত্যু	Cause of Death	: Death by fire

01.9.24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
UTTOM KUMAR KUNDU
Administrative Officer
Jashore Pourashava

01.09.24
Seal & Signature
Registrar
MD. Rafiqul Hasan
Administrator
Jashore Pourashava

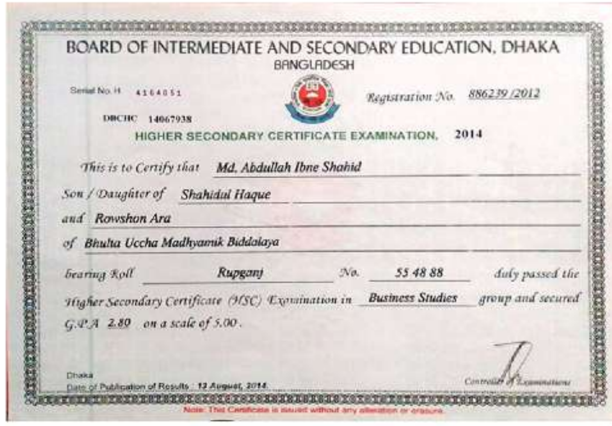

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DHAKA
BANGLADESH

Serial No. H 4164051 Registration No. 886239/2012
DBCHC 14067938
HIGHER SECONDARY CERTIFICATE EXAMINATION, 2014

This is to Certify that Md. Abdullah Ibne Shahid
Son / Daughter of Shahidul Haque
and Rowshon Ara
of Bhulta Uccha Madhyamik Biddalaya
bearing Roll Rupganj No. 55 48 88 duly passed the Higher Secondary Certificate (HSC) Examination in Business Studies group and secured G.P.A 2.80 on a scale of 5.00.

Dhaka
Date of Publication of Results : 12 August, 2014

Controller of Examinations

Note: This Certificate is issued without any alteration or erasure.

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আব্দুল্লাহ ইবনে শহীদ
জন্ম	: ০৬-০২-১৯৯৭
পিতা	: শহীদুল হক
মাতা	: রওশন আরা
স্ত্রী	: মুমতারিন জান্নাতুল
সন্তান	: ১. রাইয়ান (৫) নার্সারী
ভাই	: সাদমান, সরকারী সিটি কলেজ, যশোর
স্থায়ী ঠিকানা	: ঘোপ, নোয়াপাড়া, ওয়ার্ড-০৩, যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: পাঁচাইখা, ভূলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
ঘটনার স্থান	: দরাটানা জাবির ইন্টারন্যাশনাল, যশোর
আক্রমণকারী	: যুবলীগের বাহিনীর অগ্নিসংযোগ
আহত হওয়ার সময়	: আনুমানিক বিকাল ৪ টা, ৫-০৮-২০২৪
আঘাতের ধরন	: আগুনে পুড়ে যাওয়া
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫-০৮-২০২৪
শহীদের কবরের অবস্থান	: ঘোপ সেন্ট্রাল রোড, যশোর

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা
২. শহীদ স্ত্রীর জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

‘সে হাসপাতালে চিকিৎসা পায়নি। ভর্তি করতে চায়নি কোন হাসপাতাল।’
-মনির মোল্লা

শহীদ শেখ হৃদয় আহমেদ শিহাব

ক্রমিক: ৭৪০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৪৬

পরিচিতি

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার সন্ন্যাসীরচর ইউনিয়নের রাজারচর আজগর হাওলাদারকান্দি গ্রামের শাহ আলম হাওলাদার ও নাছিমা বেগমের কোল জুড়ে ২০০৬ সালে জন্ম নেন শেখ হৃদয় আহমেদ শিহাব। ২০২৪ সালের কোটাবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। পেশায় ফার্নিচার দোকানের একজন কর্মচারী ছিলেন শিহাব। প্রায় ৮ বছর আগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কাঁধে আঘাত পান শিহাবের বাবা শাহ আলম হাওলাদার। এরপর থেকে ভারী কোনো কাজ করতে পারেন না তিনি। বর্তমানে তাঁর হার্টে সমস্যা দেখা দিয়েছে। শিহাবের বাবা অসুস্থ হওয়ার পর তৎকালীন সন্তানদেরকে নিয়ে নাছিমা বেগমের সংসারে তৈরি হয় আর্থিক সংকট। সংসারের হাল ধরতে সেলাইয়ের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন শিহাবের মা। পরে কোনো মতে ধীরেধীরে সংসার উঠে দাড়ায়। তখন হৃদয় আহমেদ শিহাব অষ্টম শ্রেণিতে পড়তেন। সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে ঢাকায় আসেন তিনি। একটি ফার্নিচারের দোকানে যোগ দিয়ে পিতার চিকিৎসার খরচ যোগানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন সিহাব। সেই থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর শ্রমিক জীবন। তারপর থেকে ফার্নিচারের দোকানে প্রায় তিন বছর ধরে কাজ করেছেন শিহাব। বেতন থেকে নিজের চলার মত কোন রকম খরচ রেখে বাকি টাকা মায়ের হাতে পাঠিয়ে দিতেন। অবসর সময়ে রোলার স্কেটিং চালানই ছিল শিহাবের অন্যতম শখ।

যেভাবে তিনি রবের সান্নিধ্যে গিয়েছেন

‘ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সড়কে কিছু দেখতে না পেয়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করেন’

ঢাকার বাড্ডা লিংকরোড এলাকায় ফুপাত ভাই মনির মোল্লার ‘হাসান স্টিল অ্যান্ড ফার্নিচার-এ কাজ করতেন শিহাব। ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে মনির মোল্লার বোনের বাসায় দুপুরের খাবার খেতে যান। এ সময় বাড্ডা এলাকা আওয়ামী নেতাকর্মীরা দখল করে রেখেছিল। কোটাবিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে লাগাতার গোলাগুলি করছিল। শিহাব এসব দেখে ভয় পেয়ে যান। এরপর খাবার শেষ করে কারখানায় যাওয়ার সময় রাস্তা পার হতে গেলে পুলিশের টিয়ারশেলের মুখে পড়েন তিনি। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সড়কে কিছু দেখতে না পেয়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করেন। এসময় পুলিশের ছোড়া একটি গুলি তাঁর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি উপেক্ষা করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ফার্নিচার দোকানের মালিক মনির স্থানীয় এক হাসপাতালে গিয়ে শিহাবকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সেখানে চিকিৎসা না পেয়ে বনশ্রী এলাকার নাগরিক স্পেশালাইজড প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শুক্রবার রাতে গ্রামের বাড়ি শিবচর উপজেলার সন্ন্যাসীর চর ইউনিয়নের রাজারচর আজগর হাওলাদারকান্দি গ্রামে লাশ এসে পৌঁছালে চারিদিকে শোকের মাতম উঠে। পরে শনিবার দিবালোকে শহীদ শেখ হৃদয় আহমেদ শিহাবের দাফন সম্পন্ন হয়।

মনির মোল্লা বলেন, শিহাব আমার দোকানে কাজ করতেন। দুপুরে খাবার খেয়ে কারখানায় ফেরার সময় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। বুকের এক পাশ থেকে গুলি ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে যায় তার। সে হাসপাতালে চিকিৎসা পায়নি। ভর্তি করতে চায়নি কোনো হাসপাতাল! চোখের সামনেই সব শেষ হয়ে গেল।

পরিবারের ও পরিচিত জনদের অভিমত

আদরের একমাত্র সন্তান হারিয়ে বার বার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন মা নাছিমা বেগম। শোকে বাকরুদ্ধ বাবা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকছেন ঘরের এক কোণে। একমাত্র ভাইকে হারিয়ে আর্তনাদ করছেন বোন। শোকে আচ্ছন্ন স্বজন-প্রতিবেশী। বাড়ির পাশের কবরস্থানে এসে ভিড় করছেন স্বজনেরা। একমাত্র নাতিকে হারিয়ে প্রলাপ বকছেন দাদা রফিক হাওলাদার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে নিহত শিহাবের মা নাছিমা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলে দুপুরে খাইয়া কারখানায় যাইতেছিল। ওই তো আন্দোলন করে নাই। ওরে কেন গুলি কইরা মারলো? আমার একমাত্র ছেলে! আমি এখন কি নিয়া বাঁচমু। আমার বাবার কাছে আমারে নিয়া যাও’।

শহীদের বাবা শাহ আলম হাওলাদার বলেন, আমাদের পরিবারের একমাত্র ছেলে ও একমাত্র উপার্জনকারী সন্তান ছিল শিহাব। আমি ছেলে হত্যার বিচার চাই। বাবা হয়ে সন্তানের লাশ কাঁধে নেওয়ার কষ্ট কাউকে বলে বুঝাতে পারব না। সন্তানের মরদেহ কাঁধে নেব, তা কখনও ভাবিনি। কিন্তু কেন আমার সন্তান গুলিতে মারা গেল। তার কি কোনো বিচার পাব?

নিহত শিহাবের চাচা সাহাবুদ্দিন হাওলাদার বলেন, ‘আমাদের পরিবারের একমাত্র ছেলেসন্তান ছিল শিহাব। আমার বড় ভাইয়ের ছেলে। তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিল শিহাব।’

জুনায়েদ নামে তার এক প্রতিবেশী বলেন, এলাকার মধ্যে অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী ছিল। ছুটিতে বাড়িতে আসলে সবার সঙ্গে মিশতো। তার এমন আকস্মিক মৃত্যু কেউ মানতে পারছেন না।

শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, শিহাবের মৃত্যুর বিষয়টি দুঃখজনক। আমি খোঁজখবর নিয়েছি। সবকিছু স্বাভাবিক হলে ওই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব। তা ছাড়া তারা চাইলে আমাদের পক্ষ থেকে যেকোনো সহযোগিতা করা হবে।

শিহাবের হৃদয় বিদারক ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে লেখালেখি করেছে। উল্লেখযোগ্য মিডিয়ার লিংক সমূহ

১.. https://reformbangladesh.net/martyrs/শেখ-হৃদয়-আহমেদ-শিহাব/
২. https://dailyinqilab.com/index.php/national/article/672604
৩. https://www.jugantor.com/tp-firstpage/831751
8. https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2024/08/04/1411601
৫. https://www.dhakapost.com/country/296473
৬. https://www.somoynews.tv/news/2025-01-29/P1vQSFNী
৭. https://www.jaijaidinbd.com/wholecountry/481018
৮. https://www.youtube.com/watch?v=OnKIysZ-z4M

আওয়ামী আগ্রাসন

বিতর্কিত রক্তখেকো দল আওয়ামী সরকারের ১৬ বছরের শাসনামলে শিহাবের মত এমন আরও হাজারও মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। গুম হতে হয়েছে শত-শত নিরপরাধ মানুষকে। আওয়ামী দুঃশাসনের কয়েকটি খন্ড চিত্র তুলে ধরা হল।

১. বিচার বহির্ভূত হত্যা ও ক্রসফায়ার
২. গুম করে আয়না ঘরে বন্দী
৩. গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরা
৪. ডিবি হেফাজতে অত্যাচার

৫. শিবির ট্যাগ দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতন ও খুন

৬. অর্থ পাচার ও হল মার্ক কেলেঙ্কারি

৭. ব্যাংক ডাকাতি, পদ্মা সেতুর টাকা নিয়ে ছল চাতুরী

৮. অর্থ কালোবাজারি

৯. শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি

১০. ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পিলখানা হত্যাকাণ্ড, ৫ মে ২০১৩ হেফাজত হত্যা কাণ্ড

১১. বিরোধী দলকে অথর্ব করা, সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন

১২. সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার পুত্র তারেক জিয়াকে অপমান-অপদস্থ, জেল-জুলুম, আটক ও আরাফাত রহমান কোকোকে ষড়যন্ত্র করে স্ট্রোক নাটক সাজিয়ে হত্যা

১৩. ট্রাইব্যুনাল গঠন করে জনদরদী নেতাদের গ্রেফতার ও হত্যা নাটক

১৪. বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলিকে জবাই করে হত্যা

১৫. আওয়ামী গডফাদার শামিম ওসমানের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে সাত খুন

১৬. বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদি সাহেবের আটক ও রায় ঘোষণা কেন্দ্রিক

সারাদেশে একযোগে গণহত্যা

১৭. ইসলামী স্কলারদের দেশ থেকে বিতারিত করণ

১৮. উলামায়ে কেরামদের হুমকি ও তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে হত্যা চেষ্টা

১৯. টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন কোটা সৃষ্টি করে মেধাবী শুন্যকরণ

২০. আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিজের আয়ত্বে রেখে গণহত্যা বাস্তবায়ন

শেষকথা

আওয়ামী শাসনামলে বিগত বছর গুলোতে দেশের মানুষকে খুনি হাসিনা বাকরুদ্ধ করে রেখেছিল। এই বাক স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে ২০২৪ সালে আপামর জনতা ফুঁসে ওঠে। একপর্যায়ে শতশত মানুষের তাজা প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার পর বাংলাদেশে ২য় স্বাধীনতা ফিরে আসে। বিজয়ের এই চেতনা আমাদের মধ্যে জাগ্রত করুক দেশপ্রেম ও মহানুভবতা। শহীদ শিহাবের এই আত্মত্যাগ দেশের নাগরিক মনে রাখুক কোটি-কোটি বছর। শিহাবের এমন আকস্মিক শাহাদাতে ভেঙে পড়েছেন তার বয়োবৃদ্ধ বাবা-মা। বাকরুদ্ধ বাবার নিরবতা ও মায়ের আহাজারিতে চারিদিক যেন ভারী হয়ে উঠেছে। এই তেজস্বী তরুণ তুর্কী বেঁচে থাকুক আমাদের হৃদয়ে, আমদের জীবনে।

TIAN-E

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: শেখ হৃদয় আহমেদ শিহাব
জন্ম	: ২০০৬ সাল, বয়স: ১৮
পেশা	: স্টিল কারখনার শ্রমিক
প্রতিষ্ঠান	: হাসান স্টিল অ্যান্ড ফার্নিচার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রাজারচর আজগর হাওলাদারকান্দি, উপজেলা: শিবচর, জেলা: মাদারীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নবীনগর, ঢাকা
পিতা	: শাহ আলম হাওলাদার, পেশা: দিনমজুর
মাতা	: নাছিমা বেগম, পেশা: গৃহিণী
সম্পদের পরিমাণ	: পৈতৃক বসতি জমি রয়েছে
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ৩:৩০টা
ঘটনার স্থান	: বাড্ডা লিংক রোড, ঢাকা
আক্রমণকারী	: আওয়ামী মদদপুষ্ট পুলিশ বাহিনী
চিকিৎসা সেবা নেওয়া হাসপাতাল	: নাগরিক স্পেশালাইজড প্রাইভেট হাসপাতাল, বনশ্রী
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, নাগরিক স্পেশালাইজড প্রাইভেট হাসপাতাল, বনশ্রী
লাশ হস্তান্তর	; ১৯ জুলাই ২০২৪
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজগ্রাম

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদের পিতাকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে

৩. নিজস্ব জমিতে স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করলে অসহায় পরিবারটির উপকার হবে

শহীদ নয়ন মিয়া

ক্রমিক: ৭৪১

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৫৪

শহীদ পরিচিতি

মো নয়ন মিয়া লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার দক্ষিণ গাবদা গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে। তিনি কাঁঠাল বাগান এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং ঐ এলাকায় একটি মটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করতেন। তিনি তার আড়াই বছর বয়সী একটি মেয়ে রেখে গেছেন। নয়ন মিয়ার মৃত্যুতে কন্যা নুসরাতকে নিয়ে স্ত্রী রিফা আক্তার অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন হলো বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন।

২০২৪ এর কোটা সংস্কার আন্দোলন হলো বাংলাদেশের সব ধরনের সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটা ভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে সংগঠিত একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ জুন। ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষনার পর কোটা পদ্ধতির সংস্কার আন্দোলন আবার নতুনভাবে আলোচনায় আসে। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছিল। ঐ পরিপত্রের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে পূর্বতন ১ম শ্রেনি এবং পূর্বতন ২য় শ্রেণি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল কোটা বাতিল করা হয়েছিল। কোটা পদ্ধতিকে আবার ফিরিয়ে আনায় ২০২৪ সালের জুলাই মাসের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের প্রতিবাদ শুরু হয়। বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের দমন-পীড়ন, সশস্ত্র ও সহিংস হামলার শিকার হন। পুলিশ রাবার বুলেট, ছররা গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে, লাঠিপেটা করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। সরকার এই সময়ে প্রায় সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়। এইচ এস সি পরিক্ষা স্থগিত করে দেয়া হয়। সব ধরনের ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে সারাদেশে কারফিউ জারি করে সেনা মোতায়েন করেন শেখ হাসিনা।

জুলাই জুড়ে সরকারি বাহিনীর গ্রেফতার, গুম,খুন, গনহত্যা, বিভিন্ন স্থানে আওয়ামীলীগের কর্মীদের নির্যাতন নয়ন মিয়াকে বিক্ষুব্দ করে তোলে। ৪ আগষ্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র -জনতার আন্দোলনে অংশ নেন লালমনিরহাট জেলার সাহসী সন্তান নয়ন মিয়া। তিনি বাংলামোটরের কাঁঠাল বাগান এলাকার বাসা থেকে বের হয়ে বিকেলে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে বন্ধুদের সাথে নিয়ে যোগ দেন। জুলাই জুড়ে মার খেতে খেতে ছাত্র-জনতা এদিন প্রতিরোধ করা শুরু করে। ফলে সরকারী সন্ত্রাসী বাহিনী পিছু হঠতে থাকে। মিছিল চলাকালে রাজধানীর কাঠালবাগান এলাকায় পুলিশের সামনে যাওয়া মাত্রই একটি গুলি নয়ন মিয়ার মাথায় এসে বিদ্ধ হয়। পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে তার বন্ধুরা পালিয়ে যায়। কিন্তু শুধু নয়ন মিয়া পড়ে থাকে রাস্তায়। পরে রাস্তার কিছু পথচারি তাকে দেখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে নয়নের চিকিৎসার আগে ডাক্তাররা বুঝতে পারে তিনি আন্দোলনকারী। এটা বুঝেতে পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তাররা তাকে প্রথমে চিকিৎসা দিতে চায়নি। দীর্ঘ সময় পরে এক চিকিৎসক রাত ৩টায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার মাথা থেকে গুলি বের করে আনে। সে সাথে খুলে ফেলা হয় মাথার খুলির একাংশ। ডাক্তারের ইচ্ছে ছিল নয়ন মিয়া যদি কিছুটা সুস্থ হয় তাহলে তার মাথার খুলিটি আবার পুনঃস্থাপন করা যাবে। তবে সেটা আর সম্ভব হলো না। নয়ন মিয়া ৪৭ দিন তীব্র যন্ত্রনা ভোগ করে চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার সকাল ৭ টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনের প্রদীপ নিভে যায়। রোববার সকাল দশটায় নিজ গ্রাম দক্ষিন গোবধায় জানাজা শেষে নিহতের লাশ দাফন করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত লালমনিরহাটের নয়নের দাফন সম্পন্ন

অর্থনৈতিক অবস্থা

তিনি ঢাকায় একটি মটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করতেন। তার বাবা, মা, দুই ভাই ও দুই বোন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহন করেন। তিনি ধর্মান্তরিত না হওয়ায় তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষনা করে। যার কারনে পৈত্রিক কোন সম্পত্তি তার না থাকায় আহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি একালায় আসলে শশুরের বাড়িতেই থাকতেন। কন্যাকে নিয়ে স্ত্রী খুব অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করছেন।

নিউজ লিংক

১. https://www.youtube.com/watch?v=Fr3GYG8p9wM&ab_channel=KalbelaNews
২. https://www.bssnews.net/bangla/national/153261
3. https://www.dhakapost.com/national/308568
4. https://www.khoborsangjog.com/country/rangpur/54471/

1/28/25, 6:31 PM print | বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত চিকিৎসাধিন নয়নের মৃত্যু: লালমনিরহাটে দাফন সম্পন্ন | জাতীয়

বিএসএস নিউজ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত চিকিৎসাধিন নয়নের মৃত্যু: লালমনিরহাটে দাফন সম্পন্ন

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১১:৪৩ | বাসস

লালমনিরহাট, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বাসস): রাজধানীতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রায় দেড় মাস পর গত শুক্রবার রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন নয়ন মিয়া(২৬)।

আজ রোববার সকাল ১০টায় লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার দক্ষিণ গোবধা গ্রামের চান্নারপাড়ে তৃতীয় নামাজে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

এরআগে গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নয়নের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রথম নামাজে জানাজা ও পরে নয়াপল্টনে বিএনপি অফিসের সামনে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় গোবধা গ্রামের ইউপি সদস্য আমিনুল ইসলাম জানান- লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ গোবধা গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে নয়ন মিয়া।তিনভাই, দুইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। তার তিনবছর বয়সী একটি মেয়ে রয়েছে।তিনি রাজধানীর কাঁঠালবাগান এলাকার একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করতেন। গত ৪ আগস্ট দুপুরে কাঁঠালবাগান এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে পড়েন তিনি। এ সময় তার মাথায় গুলি লাগে। এতদিন ঢাকা মেডিকেলে তার চিকিৎসা চলছিল। প্রায় দেড় মাস পর গত শুক্রবার রাতে চিকিৎসাধিন অবস্থায় মারা যান নয়ন মিয়া।

বিএসএস নিউজ

bss.org.bd
National Portal of BSS

সর্বসত্ব সংরক্ষিত © ২০২৫ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

https://www.bssnews.net/bangla/national/153261/print 1/2

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র
মোঃ নয়ন মিয়া
মোঃ লোকমান হোসেন
মোছাঃ হামিদা বানু
Date of Birth 01 Jan 1998
NID No. 780 864 6009
নয়ন

1/28/25, 6:33 PM

DHAKA POST

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

৪৮ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে না ফেরার দেশে যুবদল কর্মী নয়ন

ঢামেক প্রতিবেদক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৭:১৬

ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর কাঠালবাগান এলাকায় গুলিতে আহত যুবদল কর্মী নয়ন মিয়া (২৬) মারা গেছেন। তিনি ওই এলাকায় একটি গ্যারেজে কাজ করতেন।

শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ৪৮ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা যান।

নয়ন মিয়া লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার দক্ষিণ গাবদা গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে। তিনি বর্তমানে কাঁঠাল বাগান এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

নিহতের শ্বশুর এরশাদুল হক জানান, গত ৪ আগস্ট বিকেলে নয়ন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে কাঠালবাগান ঢালের একটু সামনে যাওয়া মাত্রই একটি গুলি তার মাথায় এসে লাগে। পরে আমরা খবর পেয়ে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাই। এখানে ৪৮ দিন চিকিৎসা শেষে আজ সকালে সে মারা যায়।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। আমরা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে জানিয়েছি।

এসএএ/এসএসএইচ

© dhakapost.com

https://www.dhakapost.com/national/308568 1/2

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Durgapur Union Parishad
Aditmari, Lalmonirhat
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 05/01/2016
Birth Registration Number 19985210241065349
Date of Issuance 05/01/2016

Date of Birth : 01/01/1998 Sex : Male
In Word : First of January Nineteen Ninety Eight

নাম	: মোঃ নয়ন মিয়া	Name	: Md Nayan Mia
মাতা	: মোছাঃ হামিদা বানু	Mother	: Mst Hamida Banu
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ লোকমান হোসেন	Father	: Md Lokman Hossain
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: লালমনিরহাট, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Lalmonirhat, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: দক্ষিণ গোবধা দুর্গাপুর, দুর্গাপুর, আদিতমারী, লালমনিরহাট	Permanent Address	: Daskin Gobdha Durgapur, Durgapur, Aditmari, Lalmonirhat

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar
Md. Sohorab Hossain
Chairman

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

Durgapur Union Parishad

Aditmari, Lalmonirhat

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Death Registration Number

19985210241065349

Sex : Male

Date of Birth 01/01/1998

Date of Death 20/09/2024

In Word Twentieth of September Two Thousand Twenty Four

Name	Md Nayan Mia
Mother	Md Hamida Banu
Nationality	Bangladeshi
Father	Md Lokman Hossain
Nationality	Bangladeshi
Place of Death	Dhaka, Bangladesh
Cause of Death	Murder

Seal & Signature

Assistant to Registrar

(Preparation, Verification)

Seal & Signature

Registrar

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: নয়ন মিয়া
জন্ম	: ০১/০১/১৯৯৮
পেশা	: শ্রমিক
পিতা	: মো: লোকমান হোসেন
মাতা	: মোছা: হামিদা ভানু
স্ত্রী	: মোসা: রিফা আক্তার (২০) , ৫ম পাশ
সন্তান	: ১টি মেয়ে- মোছা: নুসরাত জাহান নুরী (জন্ম: ২৮/১১/২০২১)
ভাই-বোন	: দুই ভাই- দুই বোন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-দুর্গাপুর, থানা-আদিতমারি, জেলা-লালমনিরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম-দক্ষিণ গোবধা, ডাকঘর-দুর্গাপুর, থানা-আদিতমারি, জেলা-লালমনিরহাট
ঘটনার স্থান	: কাঠালবাগান মোড়, বাংলামোটর
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ ও পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৪/৮/২৪ দুপুর ২:৩০ মিনিট
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলি
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: চিকিৎসাধীর অবস্থায় ২০/০৯/২৪ তারিখ সকাল ০৭:০০টা,
	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

প্রস্তাবনা

১. নয়নের স্ত্রীকে পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. মেয়ে নুসরাত জাহান নুরীকে এতিম প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা।

শহীদ মোঃ শাহিনুর আলম

ক্রমিক: ৭৪২

আইডি: রংপুর বিভাগ ০৫৫

শহীদ পরিচিতি

মোঃ শাহিনুর আলম (১৯) পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে। জনাব আব্দুল জব্বার ও মাছিরন বেগমের পাঁচ সন্তানের মধ্যে শাহিনুর ছিল ৪র্থ তম। শাহিনুরের জন্ম ২৭ মার্চ ২০০৫। তার ঠিকানা গ্রাম: বড়বাসুরিয়া, ইউনিয়ন: বড় বাড়ি, ডাকঘর: খেদাবাগ, থানা+ জেলা: লালমনিরহাট। কৃষক পিতা দারিদ্রের কারনে সন্তানদের তেমন লেখাপড়া করাতে পারেননি। শৈশব গ্রামে কাটলেও দারিদ্রতার কারনে লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জীবিকার তাগিদে ঢাকায় পারি জমান শাহিনুর। ঢাকাতে এসে রিকশা চালাতেন। তার ভাই বোনরা হলেন- মোঃ মাজেদুল ইসলাম (২৬) ও মোঃ সাইদুল ইসলাম (২১) নামে দুজন বড় ভাই এবং মোছাঃ মাজেদা বেগম (২৩) ও মোছাঃ মারুফা খাতুন (১২) নামে তার আরো দুজন বোন রয়েছে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হওয়ার পর, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। এরপর রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগ পরপর আরও তিনটি জাতীয় নির্বাচনে জয় লাভ করে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলোতে ব্যপক কারচুপির অভিযোগ উঠে। এরমাঝে ২০১৮ সালের নির্বাচন ব্যতীত বাকি দুটো নির্বাচন বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বয়কট করেছিলো। এইসময় সরকার তাদের বিরোধীদের উপর ব্যাপক নির্যাতন ও ধর-পাকড় চালায়, বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাদের বিভিন্ন মামলায় সাজা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বশূন্য করে ফেলা হয়। এইসময়ে বাংলাদেশের সব গণমাধ্যমে তথ্য প্রচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর মতো আইনের মাধ্যমে কঠোরভাবে জনসাধারণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এইসময়ে অরাজনৈতিক আন্দোলন সহ অধিকাংশ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকার পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বিশেষত ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রলীগকে ব্যবহার করতো। ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ড ও দমন-নিপড়নের অভিযোগ ছিলো। গত তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগের ছোট থেকে কেন্দ্রের বেশিরভাগ নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থপাচারের অভিযোগ উঠেছিলো, বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থে কানাডায় বাংলাদেশিদের পরিবারে সদস্যদের নিয়ে বেগমপাড়া তৈরি করা হয়েছে, গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি রেকর্ড ছুঁয়েছে, পাশাপাশি রিজার্ভের ঘাটতি, দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার, দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ পাচার, ব্যাংকিংখাতে হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের জন্য সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দিনে দিনে জীবন-যাপন কঠিন হয়ে উঠেছিলো, যার কারণে তারা সরকারের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ২০১৮ সালে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়, যা ছাত্রদের মধ্যে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে চলমান কোটা ব্যবস্থা সংস্কার করা। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং শিক্ষার্থীদের চাপে, সরকার ৪৬ বছর ধরে চলা এই কোটাব্যবস্থা বাতিলের ঘোষণা দেয়।

তবে, ২০২১ সালে এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে সাতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, অহিদুল ইসলামসহ, হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। অবশেষে, ২০২৪ সালের ৫ জুন, হাইকোর্টের বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চ কোটাব্যবস্থা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। রায় প্রকাশের পরপরই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

জুলাই মাসে আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নেয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা "বাংলা ব্লকেড" সহ অবরোধ কর্মসূচি চালায়। এই সময়ে আন্দোলন দমাতে পুলিশের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের ফলে সংঘর্ষ ঘটে, এবং রংপুরে আবু সাঈদ নামে একজন শিক্ষার্থী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনাটি আন্দোলনকে আরও জোরালো করে এবং দেশজুড়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

এরপর ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন সহিংহ হয়ে উঠে ও বিভিন্ন জায়গায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের মতো সংগঠনের হামলায় অনেক হতাহত হয়। এইসময় সারাদেশে কারফিউ জারি ও ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা কোটাবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। আন্দোলনের নামকরণ করা হয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। যার যাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৪ আগষ্টে সরকার ৩ দিনের কারফিউ জারি করার পর ৫ আগষ্টে চলছিল প্রথম দিনের কারফিউ। এদিন সকালের পরিবেশ বেশ থমথমে, সতর্ক অবস্থানে ছিল ঢাকার পুলিশ। তবে কারফিউ অমান্য করে বেলা ১১ টার পর থেকে সারা দেশের শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ শাহবাগে জড়ো হতে থাকে। তারপর শাহবাগ থেকে আন্দোলনকারীরা গণভবনের দিকে পদযাত্রা শুরু করেন। এ সময় শেখ হাসিনা বেলা দুইটার দিকে পদত্যাগ করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন কর্মসূচি লং মার্চ টু ঢাকা ঘোষণা করে। প্রথমে ৬ আগস্ট পালন করার কথা থাকলেও পরে তা ৫ আগস্ট করা হয়। ৫ আগস্ট খুনি হাসিনার দেশ থেকে পালানোর খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই খবর শুনার পরে সারা দেশের মানুষ আনন্দ মিছিল এ বের হয়। লালমনিরহাট জেলা সদরের বড়বাড়ি ইউনিয়নের বড় বাসুরিয়া গ্রামের মোঃ শাহিনুর আলমের কথা। ভাই -বোনের মধ্যে উনি হলেন তৃতীয় জন। তার স্বপ্ন ছিল নিজের উপার্জন দিয়ে বসত ভিটা কিনে বাবা-মাকে একটা বাড়ি করে দেওয়ার। আর এই চিন্তা ভাবনা নিয়েই সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাট থেকে দেশের রাজধানী

ঢাকায় ছুটে যাওয়া। জীবিকার তাগিদে ঢাকায় এসে রিকশা চালান তিনি। কিন্তু বাড়ি করার সেই ইচ্ছে মাটিতে বিলীন হয়ে গেছে শাহিনুরের। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পরদিন ৬ আগস্ট মঙ্গলবার সকালে ৮.৩০ মিনিটে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকার লালবাগ থানার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন শাহিনুর আলম। এ সময়ে থানার সামনে চলছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিল। খুনি হাসিনা পালানোর পরে রাস্তায় আনন্দ ও বিজয় এ মিছিল দেখে শাহিনুর মিছিলে যোগ দেন। ঠিক সেই সময় থানার ভেতর থেকে পুলিশ অতর্কিত গুলি চালাতে শুরু করে। শাহিনুরের গায়ে গুলি লাগে। তিনি রাস্তায় পড়ে যান।

পরে তাকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন স্বপ্নবাজ এই ছেলেটি। পরে ৬ ই আগস্ট রাতে তার লাশ নিজ বাড়িতে নিয়ে এসে বড়বাড়ি ইউনিয়নের খেদাবাগের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পরদিন ৬ আগস্ট মঙ্গলবার সকালে ৮.০০ মিনিটে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকার লালবাগ থানার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন শাহিনুর আলম (১৯)। এ সময়ে থানার সামনে চলছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিল। শাহিনুর মিছিলে যোগ দেন। ঠিক সেই সময় থানার ভেতর থেকে পুলিশ অতর্কিত গুলি চালাতে শুরু করে। শাহিনুরের গায়ে গুলি লাগে। তিনি রাস্তায় পড়ে যান।

পরে তাকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন স্বপ্নবাজ এই ছেলেটি। পরে ৬ আগস্ট রাতে তার লাশ নিজ বাড়িতে নিয়ে এসে বড়বাড়ি ইউনিয়নের খেদাবাগের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শাহিনুর আলমের বাবা ছিলেন কৃষক। এবং শাহিনুর মা ছিলেন গৃহিনী। কৃষকের কাজ করে তার বাবা সংসার চালতেন খুবই কস্ট করে।দারিদ্রের কারনে তিনি তার সন্তানদের তেমন বেশি লেখাপড়া করাতে পারেননি। শাহিনুর আলম ভাইবোনদের মধ্যে ৩য়। ভাই মাজেদুল ইসলাম ও সাইদুল ইসলাম দুজনেই অটো রিকশা চালক। বোন মাজেদা বেগমের বিয়ে হয়েছে। তিনি একজন গৃহিণী। ছোট বোন মারুফা খাতুন মোহাম্মদবাগ আদর্শ নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। শাহিনুর আলম দারুস সুন্নাহ হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিলেন। পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি ছাত্রাবাসে থেকে অটো রিকশা চালাতেন তিনি। অটো রিকশা চালিয়ে যে টাকা উপার্জন করতেন তার বড় একটি অংশ বাবার হাতে তুলে দিতেন। তার টাকায় ছোট বোন মারুফা খাতুনের পড়াশুনাসহ তার বাবার সংসার চলতো। শাহিনুরের টাকায় তার বাবা মা খেয়ে পরে চলতো। এখন তো শাহিনুর নেই। এখন তাদের খুব অর্থ সংকট।

পারিবারিক বক্তব্য

শাহিনুর আলম একজন নম্র, ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল গ্রামে সবার কাছে। তাই গ্রামবাসীরা তার জন্য একটি সড়কের নাম 'শাহিনুর আলম সড়ক' । শাহিনুরের মৃত্যুতে গ্রামের অনেক মানুষই নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি।

বাবা আব্দুল জব্বার বলেন, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। এখন তেমন কাজকর্ম করতে পারি না। আগে মানুষের জমিতে কাজ করে টাকা উপার্জন করতাম। আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। সরকারি খাস জমিতে বাড়ি করে থাকি আমরা। নিজের কোন জায়গা-জমি নেই। আমার যেই ছেলে টাকা পয়সা দিয়ে আমাদের সাহায্য করত তাকেই তারা গুলি করে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিলো। তার মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে গেছে আমার পুরো পরিবারের উপার্জনের চাকা। অন্যদিকে আমার স্ত্রী ছেলে হারানোর শোকে পাগল হয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত এখন তার চিকিৎসা করতে হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, সরকার যদি আমাদের সংসারের খোঁজ খবর রাখে এবং সাহায্য করে তাহলে আমাদের অসচ্ছল পরিবারটি হয়তো আবারো আগের মতো করে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

শাহিনুর আলমের বাবা আব্দুল জব্বার বলেন, আমার ছেলেসহ দেশের এই আন্দোলনে যারা মায়েদের বুক খালি করেছে, যারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত আমি তাদের প্রত্যেককে বিচারের আওতায় দেখতে চাই। বর্তমান সরকারের প্রতি আমার এটা দাবি।

শাহিনুর আলমের মা মাছিরন বেগম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেন, আমার ছেলেকে ওরা হত্যা করেছে। আমি এখন কার মুখ দেখে বেঁচে থাকব! কে আমারে ওষুধের টাকা দেবে? কে আমার জামাকাপড়ের দিবে? কে আমার ছোট মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাবে ? আর কেই বা আমারে মা বলে ডাকবে? আমি এই হত্যার বিচার চাই!

নিউজ লিংক

https://www.bssnews.net/bangla/stories-of-mass-upsurge/161071/print

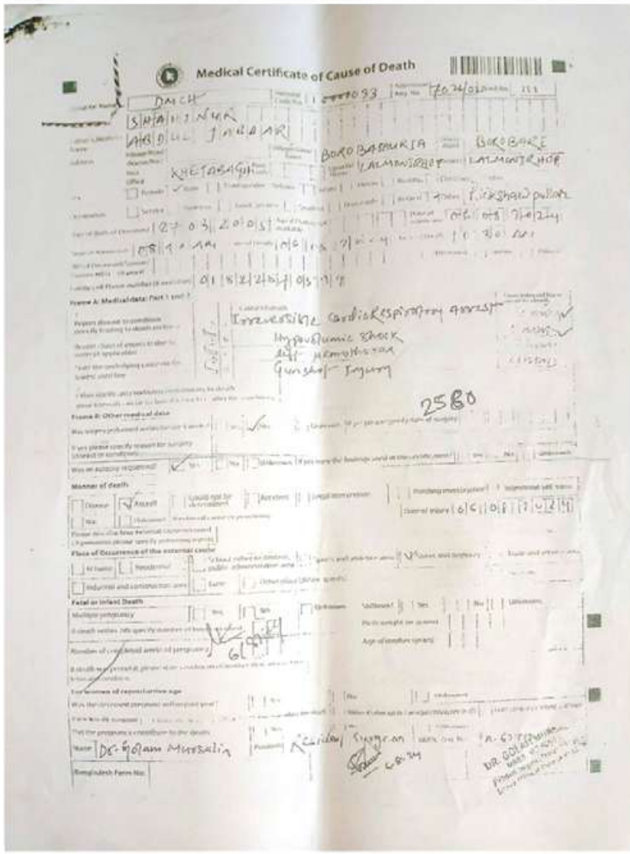

Medical Certificate of Cause of Death

Irreversible Cardiorespiratory arrest

Hypovolumic shock

Gunshot Injury

Dr. Golam Mursalin

Resident Surgeon

বিএসএস নিউজ

‘আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, আমি কার মুখ দেখে বেঁচে থাকবো?’ শহিদ শাহিনুরের মায়ের আকুতি

১১ নভেম্বর ২০২৪, ১৬:১৮ | বাসস

প্রতিবেদন : মোঃ বিপুল ইসলাম

লালমনিরহাট, ১১ নভেম্বর , ২০২৪(বাসস): স্বপ্ন ছিল নিজের উপার্জন দিয়ে বসত ভিটা কিনে বাবা-মাকে একটা বাড়ি করে দেওয়ার। আর এই চিন্তা ভাবনা নিয়েই সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাট থেকে দেশের রাজধানী ঢাকায় ছুটে যাওয়া। কিন্তু সেই ইচ্ছে মাটিতে বিলীন হয়ে গেছে শাহিনুরের।

বলছি লালমনিরহাট জেলা সদরের বড়বাড়ি ইউনিয়নের বড় বাসুরিয়া গ্রামের মোঃ শাহিনুর আলমের কথা।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৫ ই আগস্ট সরকার পতনের পরদিন ৬ ই আগস্ট মঙ্গলবার সকালে ৮.৩০ মিনিটে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকার লালবাগ থানার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন শাহিনুর আলম(১৯)। এ সময়ে থানার সামনে চলছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিল। শাহিনুর মিছিলে যোগ দেন। ঠিক সেই সময় থানার ভেতর থেকে পুলিশ অতর্কিত গুলি চালাতে শুরু করে। শাহিনুরের গায়ে গুলি লাগে। তিনি রাস্তায় পড়ে যান।

পরে তাকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন স্বপ্নবাজ এই ছেলেটি। পরে ৬ ই আগস্ট রাতে তার লাশ নিজ বাড়িতে নিয়ে এসে বড়বাড়ি ইউনিয়নের খেদাবাগের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মোঃ শাহিনুর রহমান (১৯)
জন্ম	: ২৭-০৩-২০০৫
পেশা	: শ্রমিক (রিকশা চালক)
পিতা	: আব্দুল জব্বার
মাতা	: মাছিরন বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
ভাই-বোন	: দুই ভাই ও দুই বোন (মাজেদুল-২৬, সাহিদুল-২১, মাজেদা-২৩ ও মারুফা-১২)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বড়বাসুরিয়া, ইউনিয়ন: বড় বাড়ি, ডাকঘর: খেদাবাগ, থানা+ জেলা: লালমনিরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বড়বাসুরিয়া, ইউনিয়ন: বড় বাড়ি, ডাকঘর: খেদাবাগ, থানা+ জেলা: লালমনিরহাট
ঘটনার স্থান	: কামরাঙ্গীরচর এলাকার (লালবাগ থানার কাছে)
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ০৬ আগস্ট ২০২৪, সকাল ৮ টা
আঘাতের ধরন	: কাঁধে গুলি লেগে পিছনে দিয়ে বেরিয়ে যায়।
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ৬ আগস্ট ২০২৪ ঢামেক, সকাল ১০:৩০ মিনিট
শহীদের কবরের অবস্থান	: বড়বাসুরিয়া, বড় বাড়ি, খেদাবাগ, লালমনিরহাট

প্রস্তাবনা

১. ভাইদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া

২. ছোট বোন মারুফার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শহীদ আকরাম খান রাব্বি

ক্রমিক ৭৪৩

আইডি : ঢাকা সিটি ১২২

শহীদ পরিচিতি

মোঃ আকরাম খান রাব্বি ছিলেন একজন ছাত্র, পিতার নাম ফারুক খান (চাকরিজীবী) ও মাতা বিউটি আক্তার। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন মেঝো। বড় ভাই ইমরান খান রকি একজন ব্যবসায়ী এবং ছোট ভাই মেহেদী হাসান রাফি। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকাল ৪টা ১৭ মিনিটে মিরপুর ১০ শহীদ আবু তালেব স্কুলের সামনে পুলিশের গুলিতে তিনি আহত হন। ছাত্র অধিকার আন্দোলনের একজন সাহসী অংশগ্রহণকারী ছিলেন তিনি।

শাহাদাত প্রেক্ষাপট

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহিদ হন আকরাম খান রাব্বি। শহিদ আকরাম খান রাব্বি'র বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। তিনি রাজধানীর ক্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। পাশাপাশি ক্রিকেটার এনামুল হক বিজয়ের শোরুমে চাকরি করতেন। কারন তিনি পড়ালেখার পাশাপাশি চাকরি করে বাবা -মায়ের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন। রাব্বি'র বাবা ফারুক খান (৫৪) ও মা বিউটি আক্তার (৪৫)। তিন ভাইয়ের মধ্যে রাব্বি ছিলেন মেজ। বড় ভাই ব্যবসায়ী ইমরান খান রকি (৩২) আর ছোট ভাই মেহেদী হাসান রাফি (২১)। রাফি এ বছর এইচএসসি পাস করেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বাবা ও মায়ের সব স্বপ্ন পূরণ করবেন। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন তিনি। জুলাই বিপ্লবের শুরু থেকে আন্দোলনে যোগ দেন। অফিসের ফাঁকে ফাঁকে আন্দোলনে যোগ দিত। সে নিজের বেতনের টাকা দিয়ে আন্দোলনকারীদের পানি, বিস্কুটসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার কিনে খাওয়াতো। সে ছাত্র- ছাত্রীদের তার সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করতো। ১৯ জুলাই ছিল শুক্রবার। রাব্বি দুপুরে বাসা থেকে জুম্মার নামাজ পড়তে বের হয়। নামাজ শেষে আন্দোলনে যোগ দেয়। বিকেল চারটা ১৭ মিনিটে মিরপুর ১০ এ শহীদ আবু তালেব স্কুলের সামনে তার পেটে ও বুকে গুলি লাগে। সাড়ে চারটার দিকে ওর বন্ধু আমাকে ফোন করে জানায়, রাব্বি'র গুলি লাগছে। আমরা ওকে ১১ নম্বরের ইসলামিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তখন আমি বাসা থেকে বের হয়ে মিরপুর ১১ নম্বরের দিকে যেতে থাকি, এই সময় তার বন্ধু আবার আমাকে ফোন করে জানায়, এই হাসপাতালে রাব্বিকে চিকিৎসা দেবে না। তাই ওকে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, আপনি ঢাকা মেডিকেলে আসেন। আমি যখন অনেক কষ্ট করে ঢাকা মেডিকেলে যাই, গিয়ে দেখি আমার বাবাটার লাশ ফ্লোরে পড়ে আছে। ওর গায়ের গেঞ্জিটা রক্তে ভেজা।'

ফারুক খান বলেন, 'আমি লাশ নিয়ে আসতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে আমার ছেলের লাশ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।' তারা বলেন, 'উপরের নির্দেশ আছে, লাশ এখন দেওয়া যাবে না।' তখন আমি ৫ হাজার টাকা দিয়ে লাশ হিম ঘরে রেখে রাতে বাসায় ফিরে যাই। পরের দিন ২০ তারিখ সকালে লাশ নিতে এসে দেখি রাব্বির লাশ বাইরে পড়ে আছে। লাশ নেওয়ার জন্য আমি ২০ তারিখ সারাদিন অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। অবশেষে ২১ তারিখ অনেক চেষ্টা করে, আমি রাব্বির লাশ বুঝে পাই। তিন দিন বাইরে পড়ে থাকার কারণে লাশ পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। পরে ওইদিন সন্ধ্যায় জানাজা শেষে, মিরপুরের পূর্ববাইশটেক কবরস্থানে রাব্বিকে দাফন করা হয়।

রাব্বির বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ছেলে হারানোর যন্ত্রণা কি, আমি এখন বুঝতে পারছি। আমার কষ্ট, বিদায় বেলায় আমার সন্তানের মুখটাও কেউ দেখতে পারলো না। রাব্বির লাশ হিম ঘরে রাখার জন্য আমি টাকা দিয়ে এলাম, কিন্তু লাশ বাইরে ফেলে রাখা হলো। তিনটা দিন আমার বাবাটার লাশ বাইরে পড়ে ছিল। এমন কি যখন আমি সন্তানের জানাজায় দাঁড়িয়েছি, তখন পুলিশ এসেছিল আমাকে গ্রেফতার করতে। স্থানীয় জনগণের বাধায় আমাকে সেদিন পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। শহিদ আকরাম খান রাব্বির মা বিউটি আক্তার বলেন, 'শুরু থেকেই রাব্বি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ১৮ তারিখ দুপুরে বাসায় আমরা এক সাথে ভাত খাই। এরপর বিকেলে সে গিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতাকে নিজের বেতনের টাকা দিয়ে পানি কিনে খাওয়ায়। রাতে বাসায় ফিরে আমাদের কাছে এই বিষয়ে গল্প করে। আমি ও ওর আব্বু আন্দোলনে অংশ নিতে নিষেধ করি। পরের দিন ১৯ জুলাই দুপুরে জুম্মার নামাজ পড়তে রাব্বি বাসা থেকে বের হয়। সাড়ে ৪ টার দিকে ওর আব্বুর ফোনে এক বন্ধু জানায়, রাব্বির গুলি লাগছে। তখন ওর আব্বু তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হয়ে যায়। আমি ওর আব্বুকে বলি আমার বাবাটার কি হয়েছে, কোথায় গুলি লাগছে? ওর আব্বু আমাকে কিছু না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। একটু পরে রাব্বির বন্ধু ফোন করে আমাকে বলে, 'আন্টি চিন্তা করবেন না, রাব্বির হাতে গুলি লাগছে।'

তিনি বলেন, সারা বিকেল চলে গেল, রাত ১১টা বেজে যায়, আমি আমার বাবাটার কোন খবর পাই না। রাত ১২টার দিকে ওর বাবা

বাসায় ফেরে। আমি দরজা খুলে দিতেই ওর বাবার গা থেকে আতরের গন্ধ পাই। তখন আমি বুঝে ফেলি আমার বাবা আর নেই। তারপরও রাব্বির বাবাকে বলি তোমার শরীরে আতরের গন্ধ কেন? তাহলে আমার রাব্বি কি আর নেই? তখন ওর বাবা হাউমাউ করে কান্না শুরু করে। পরে তিন দিন অপেক্ষা করি, ছেলের লাশের জন্য, আমার বাবাটাকে একনজর দেখার জন্য। সবাইকে কত অনুরোধ করলাম আমাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যেতে, কিন্তু কেউ আমাকে মেডিকেলে নিয়ে গেল না। পরে ২১ তারিখে যখন শুনলাম আজ আমার বাবার লাশ নিয়ে আসা হবে। তখন আমি সকাল থেকে বাসার নিচে অপেক্ষা করতে থাকি। আমার বাবাটাকে একটু দেখবো, একটু আদর করবো, শেষ বারের মত একটু চুমু খাবো। কিন্তু এমন হতভাগ্য মা আমি, আমার ছেলের লাশটাও দেখতে পারিনি। আমার জীবনটাই বৃথা।

শহীদের মা বিউটি আক্তার বলেন, 'রাব্বি অফিস থেকে বাসায় ফিরে আমাকে রান্না, বাসন মাজা, ঘর মোছাসহ বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতো। আমার শরীর খারাপ হলে আমাকে কোন কাজ করতে দিত না। আমার কখন কি লাগবে, সব সে এনে দিত। এখন আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না, আম্মু তোমার কিছু লাগবে কি না?

পরিবারের বক্তব্য

ভবিষ্যতে আর কোন স্বৈরাচার যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে না পারে এমন ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে শহীদ রাব্বির বাবা ফারুক খান বলেন, ২০২৪ সালে এসে আন্দোলনে অংশ নিয়ে সারাদেশে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা শহীদ হয়েছে, আহত হয়েছে। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি স্বৈরাচারমুক্ত দেশ পেয়েছি। আমি চাই ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরাচার যাতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে না পারে। আবার যেন হাজার হাজার মায়ের বুক খালি না হয়। যারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে।

নিহতদের শহীদের মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, যারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত হয়েছেন, তাদের সবাইকে যেন শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়। শুধু মুখে শহীদ বললে হবে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে সবাইকে শহীদের মর্যাদা দিতে হবে। একই সঙ্গে আন্দোলনে সারাদেশের যে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আহত হয়েছেন তাদের পূনর্বাসন করার দাবি জানান রাব্বির বাবা।

পরিবারের মামলাঃ

বাবা ফারুক খান গত ২৫ আগস্ট পল্লবী থানায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪৮ জনের নামে হত্যা মামলা করেছেন।

নিউজ লিংক

https://www.bssnews.net/bangla/stories-of-mass-upsurge/175348#
https://www.ittefaq.com.bd/717211/
https://www.jugantor.com/national/862174
https://www.somoynews.tv/news/2024-11-19/u4YS61L3
https://sokalerkhobor24.com/news/74556/print/

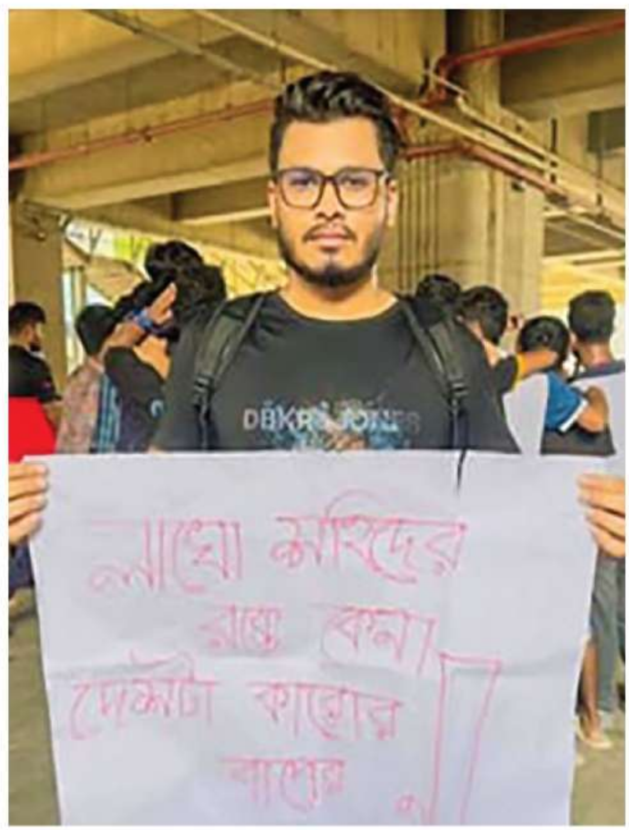

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: আকরাম খান রাব্বি
পেশা	: ছাত্র, চাকরীজীবী (বেসরকারী)
বাবা	: ফারুক খান (৫৪)
মাতা	: বিউটি আক্তার (৪৫)
ভাই	: বড় ভাই ইমরান খান রকি (ব্যবসায়ী) আর ছোট ভাই মেহেদী হাসান রাফি (২১)
ঘটনার স্থান	: মিরপুর ১০ শহীদ আবু তালেব স্কুলের সামনে
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪টা ১৭মিনিট
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: বাইশটেক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২. ছোট ভাইয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

শহীদ মোঃ মজিদ হোসেন

ক্রমিক: ৭৪৪

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ১১০

শহীদ পরিচিতি

মোঃ মজিদ হোসেন ২০০৮ সালে ১২ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ আমিন মিয়া এবং মায়ের নাম মনোয়ারা বেগম। তিনি পেশায় একজন গাড়ির হেল্পার ছিলেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

মতিউর রহমান রেন্টু শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন। আওয়ামীলীগের সাথে থেকে বিভিন্ন অপকর্ম করার এক পর্যায়ে মতের অমিল হওয়ায় শেখ হাসিনা কর্তৃক আওয়ামীলীগ থেকে বহিস্কৃত হন। তিনি পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে তার নিজস্ব উপলব্ধি থেকে 'আমার ফাঁসি চাই' নামক একটি বই লিখেন। এতে স্থান পায় শেখ হাসিনা ও তার আওয়ামীলীগের কুৎসিত আমলনামার একাংশ। বইটিতে দাবী করা হয়েছিল মেজর জিয়া হত্যাকান্ড আওয়ামীলীগের পরিকল্পনার অংশ ছিল। এছাড়াও বইতে উল্লেখ আছে, শেখ হাসিনা লাশের খবর শুনলে খুব খুশি হয়ে যেতেন। লাশ নিয়ে রাজনীতি করতেন। ২০০০ সালে বইটি আওয়ামীলীগ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। 'আমার ফাঁসি চাই' বইয়ের তথ্য অতিরঞ্জিত মনে হলেও ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা আমলের কর্মকান্ড দেখে দেশবাসী বুঝতে পেরেছিল কোন তথ্যই অতিরঞ্জিত নয়। শেখ হাসিনা ও তার ঘাতক সন্ত্রাসীদের দল আওয়ামীলীগ ২০০৮ থেকে বিরোধী মতের লোকদের নির্দয়ভাবে উচ্ছেদ করেছিল। গ্রেফতার,

গুম, খুন, আয়নাঘরে বন্দী, ফাঁসি দেয়াসহ এমন কোন অপকর্ম ছিলোনা যা তিনি জনতার উপরে প্রয়োগ করেননি। জুলাই জুড়ে ছাত্র-জনতার উপরে গণহত্যা চালাতে তার দলের সামান্য বুক কাঁপেনি! এমনকি আগস্টের ৫ তারিখ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময়েও গণহত্যার নির্দেশ ছিল।

মোঃ মজিদ হোসেন ছিলেন একজন গাড়ির হেল্পার। তিনি রাজনীতি বুঝেননা। বুঝেননা ছাত্র আন্দোলন। তিনি ছিলেন প্রচন্ড পরিশ্রমী। সংসারে হাসি ফোটাতে তিনি চাকুরী নেন। চিটাগাং বন্দর থেকে গাড়িতে মালামাল নিয়ে চাঁদপুর জেলায় গিয়েছিলেন্। সেখানে ছাত্রলীগ গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় । আগুনে পুরে মজিদ হোসেন আহত হয়। সেখান থেকে চাদপুর মেডিকেলে ভর্তি করানো হয়। ২৫ জুলাই হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

ভিটে বাড়ি সংশ্লিষ্ট ২ শতাংশ জমি আছে। বড় ভাই গাড়ির ড্রাইভার। পরিবার আর্থিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল ।

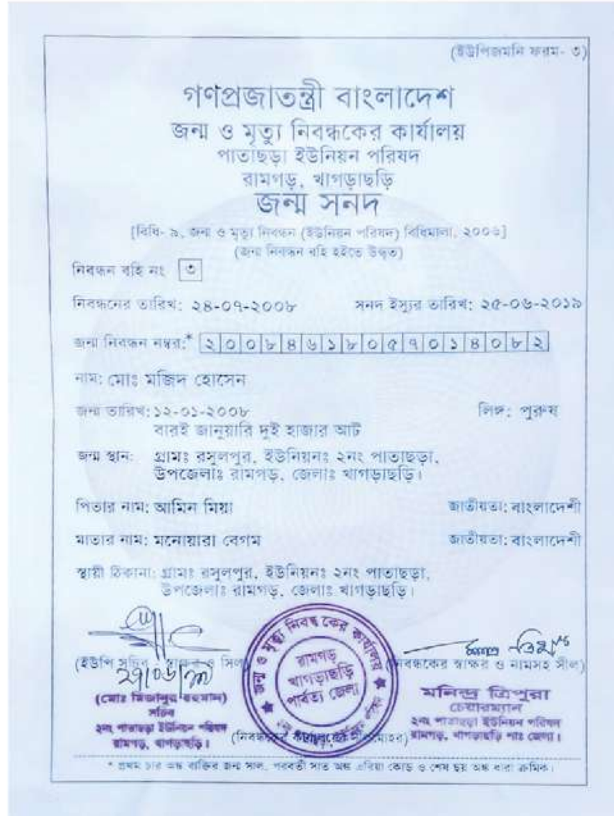
(ইউপিজমনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
পাতাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ
রামগড়, খাগড়াছড়ি
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৩

নিবন্ধনের তারিখ: ২৪-০৭-২০০৮ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৫-০৬-২০১৯

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৮৪৬১৮০৫৭০১৪০৮২

নাম: মোঃ মজিদ হোসেন

জন্ম তারিখ: ১২-০১-২০০৮ লিঙ্গ: পুরুষ
বারই জানুয়ারি দুই হাজার আট

জন্ম স্থান: গ্রামঃ রসুলপুর, ইউনিয়নঃ ২নং পাতাছড়া, উপজেলাঃ রামগড়, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

পিতার নাম: আমিন মিয়া জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মনোয়ারা বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ রসুলপুর, ইউনিয়নঃ ২নং পাতাছড়া, উপজেলাঃ রামগড়, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

(ইউপি সচিব স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
(মোঃ মিজানুর রহমান) মনিন্দ্র ত্রিপুরা
সচিব চেয়ারম্যান
২নং পাতাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ ২নং পাতাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ
রামগড়, খাগড়াছড়ি। রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

* প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক ব্যক্তির ক্রমিক।

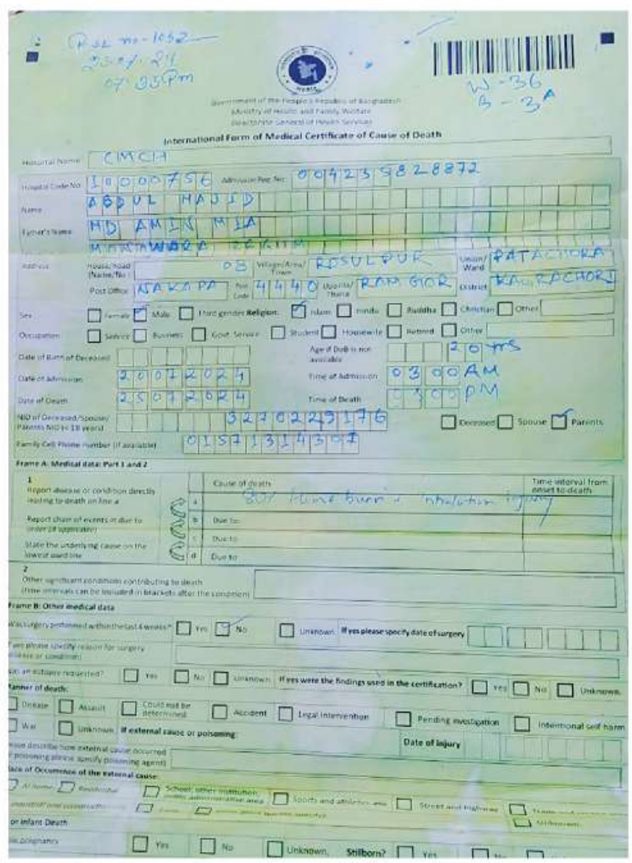
Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Health and Family Welfare
Directorate General of Health Services

International Form of Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: CMCH
Hospital Code No: 10000756 Admission Reg. No: 00423982887?
Name: ABDUL MAJID
Father's Name: MD AMIN MIA
Address: Village/Area/Town: ROSULPUR; Union/Ward: PATACHORA; Post Office: NAKAPA; Post Code: 4440; Upazila/Thana: RAMGOR; District: KAGRACHORI
Sex: Male; Religion: Islam
Age if DoB is not available: 20 yrs
Date of Admission: 20/07/2024 Time of Admission: 03:00 AM
Date of Death: 25/07/2024 Time of Death: PM
Family Cell Phone number (if available): 01?

Frame A: Medical data: Part 1 and 2
Cause of death: a: burn ... inhalation injury

Frame B: Other medical data

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Pathachhara Union Parishad
Ramgarh, Khagrachhari
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 14/09/2024
Death Registration Number 20084618057014082
Date of Issuance 14/09/2024

Date of Birth : 12/01/2008 Sex : Male
Date of Death : 25/07/2024
In Word : Twenty Fifth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ মজিদ হোসেন	Name	:
মাতা	: মনোয়ারা বেগম	Mother	:
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: আমিন মিয়া	Father	:
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: খাগড়াছড়ি, বাংলাদেশ	Place of Death	: Khagrachhari, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: আগুনে পুড়ে মৃত্যু	Cause of Death	: Death by fire

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Rasel Rana
Administrative Officer
Pathachhara Union Parishad
Ramgarh, Khagrachhari.

Seal & Signature
Registrar
Kazi Nurul Alam
Chairman
Pathachhara Union Parishad
Ramgarh, Khagrachhari.

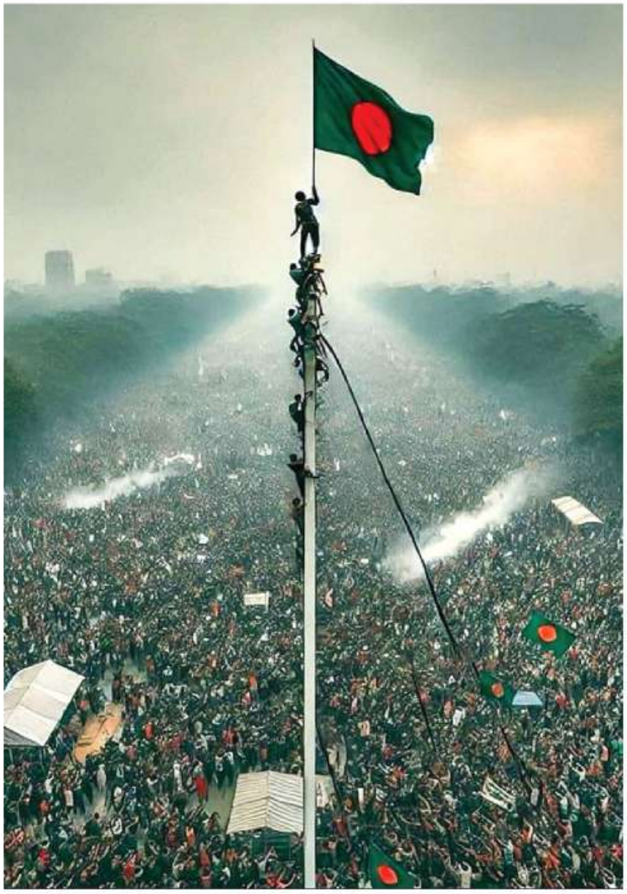

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মোঃ মজিদ হোসেন
জন্ম	: ১২/০১/২০০৮
পেশা	: দিনমজুর (গাড়ির হেল্পার)
পিতা	: আমিন মিয়া
মাতা	: মনোয়ারা বেগম
ভাই-বোন	: ২ ভাই ১ বোন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রসুলপুর,ইউনিয়ন: ২ নং পাতাছাড়া, উপজেলা: রামগড়, জেলা: খাগড়াছড়ি
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: রসুলপুর,ইউনিয়ন: ২ নং পাতাছাড়া, উপজেলা: রামগড়, জেলা: খাগড়াছড়ি
ঘটনার স্থান	: চাঁদ পুর জেলার হাজিগঞ্জ
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই রাত ১০ টা
আঘাতের ধরন	: আগুনে পুড়ে
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ২৫ জুলাই চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের ছোট ভাই মনির হোসেনকে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া

শহিদ শেখ মো: সফিকুল ইসলাম (শামীম)

ক্রমিক: ৭৪৫

আইডি: সিলেট বিভাগ ০৩২

জন্ম পরিচয়

শহিদ মো: সফিকুল ইসলাম ১৯৭০ সালের ৫ ই ফেব্রুয়ারী হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার শিমুলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে শামীম নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি। তার পিতার নাম শেখ লাল মিয়া ও মাতার নাম হামিদা খাতুন। জন্ম থেকে বেড়ে উঠা ছিলো নিজ জেলা হবিগঞ্জে।দারিদ্র্যে সংগে লড়াই করে বড় হয়েছেন তিনি। জীবীকার তাগিদে পাড়ি জমিয়েছিলেন ঢাকা শহরে। পুরান ঢাকায় ছোটখাটো ব্যবসা করেই সংসার চালাতেন। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার এ চেষ্টা বহুদিন ধরে করছেন। গতবছর তিনি সাভারে চলে যান। সেখানে শুরু করেন শরবতের ব্যবসা। আরও কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সাথে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে নতুন বিপ্লবের সূচনা হয় স্বাধীন বাংলাদেশে। স্বাধীন দেশকেই পুনরায় স্বাধীন করতে হয় ফ্যাসিস্ট সরকারের হাত থেকে। টানা চারবার ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামীলীগ সরকার। যারা দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ লুটপাটের মাধ্যমে বিদেশে হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে এবং নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে ও মানুষের বাক স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে গুম খুন করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অসংখ্য নেতাকর্মী এবং সাধারণ জনগণকে। মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর আটকে রেখে নির্যাতন করেছে বহু আলেম ওলামা ও গন্যমান্য ব্যক্তিকে। তাদেরই ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠা ছাত্রলীগ নামক গুন্ডাবাহিনী তান্ডব চালিয়েছে সারা দেশ জুড়ে। এভাবেই কেড়ে নেয়া হয়েছিলো মানুষের মৌলিক অধিকার আর বাক স্বাধীনতা। জীবনের কোনো নিরাপত্তাই ছিলোনা নিজের দেশে।

বেশ কয়েকবার আন্দোলন হলেও ক্ষমতার জোরে সেগুলো জোরদার হতে দেয়নি স্বৈরাচার সরকার। ২০২৪ সালের ৫ই জুন হাইকোর্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণার পরেই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। যা পরবর্তীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রুপ নেয়।

১৬-১৮ জুলাই শতাধিক ছাত্রজনতা নিহত হয়। ফলে আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। আর আন্দোলনের মূল কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সাভার ছিলো অন্যতম। যদিও বেশ কিছুদিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পেটের দায়ে বের হতে হয়েছিলো কাজের সন্ধানে । তেমনি খেটে খাওয়া মানুষ ছিলেন শহীদ শামীম। ২০ শে জুলাই বিকেল ৪ টার সময় বাসা থেকে বের হয়েই পুলিশের গুলির মুখে পড়েন শামীম সহ বেশ কয়েকজন । এ সময় তিনিও অন্যদের মতো পালাতে চেষ্টা করেন। অন্যরা দৌড়ে পালাতে সক্ষম হলেও শামীমের গলায়, মুখে ও পেটে কয়েকটি গুলি লাগে। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে নেয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শামীম। পরে রাতে একটি মিনি ট্রাক ভাড়া করে শহীদের লাশ বাড়িতে নিয়ে যান তার স্বজনরা। পরের দিন ২১ শে জুলাই সকাল ১১ টায় নিজ গ্রামে তার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শামীমের দেহে অসংখ্য গুলির চিহ্ন ছিলো। যেন তার শরীর টা ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়েছে।

শহীদ সম্পর্কে স্ত্রীর বক্তব্য

শোকে মুহ্যমান শামীমের স্ত্রী সহায় সম্পদহীন পিয়ারা বেগম স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ খোঁজ খবর নেয় নাই। এই দুনিয়াতে এখন আমার আর কেউ নেই।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থান

শহীদ শামীমের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাদের নিজেদের কোনো ঘরবাড়ি কিংবা চাষের জমি নেই। ঢাকার ছোট ব্যবসা দিয়েই কোনোরকমে সংসার চালাতেন। বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে শেয়ার করা ছোট একটি খুপরি বাসায় থাকতেন তিনি। পরিবারে আয় করার মতো তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তাই তার মৃত্যুর পর অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তার আপনজনেরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

গুলিতে ঝাঁজরা হন শামীম বিচার দাবি স্ত্রীর

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সৃষ্ট সহিংসতায় গত ২০ জুলাই ঢাকার সাভারে পুলিশের গুলিতে নিহত হন শামীম মিয়া (৫৮)। পুলিশ ও ছাত্রদের সংঘর্ষ দেখে পালাতে চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ শামীমের গলায়, মুখে এবং পেটে বেশ কয়েকটি গুলি লাগলে সঙ্গে সঙ্গে সড়কে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

শামীম হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার ছাতিয়াইন ইউনিয়নের শিমুলঘর গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে। তিনি সাভারে আরও কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ঘটনার দিন বিকেল ৪টার সময় বাসা থেকে বের হয়েই পুলিশের অ্যাকশনের মুখে পড়েন শামীমসহ কয়েকজন। এ সময় অন্যদের সঙ্গে তিনিও পালাতে চেষ্টা করেন। অন্যরা দৌড়ে পালাতে সক্ষম হলেও শামীমের গলায়, মুখে এবং পেটে বেশ কয়েকটি গুলি লাগে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শামীম। পরে রাতে একটি মিনি ট্রাক ভাড়া করে শামীমের মরদেহ বাড়ি নিয়ে যান স্বজনরা। ২১ জুলাই বেলা ১১টায় জানাজা শেষে দাফন করা হয় শামীমের মরদেহ। নিহত শামীমের স্বজনরা জানান, হতদরিদ্র শামীম দীর্ঘদিন পুরান ঢাকায় ছোটখাটো ব্যবসা করে সংসার চালাতেন। গত বছর তিনি ঢাকা থেকে সাভারে গিয়ে শরবত বানিয়ে বিক্রি করতে শুরু করেন। কিন্তু পুলিশের গুলি তাকে বাঁচতে দিল না। তার মরদেহে অসংখ্য গুলির চিহ্ন ছিল। পুরো শরীর যেন গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল।

শোকে মুহ্যমান শামীম মিয়ার স্ত্রী সহায়-সম্পদহীন পিয়ারা বেগম স্বামীর হত্যার বিচার চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলেন, 'আজ পর্যন্ত কেউ কোনো সহযোগিতা করে নাই। এ পর্যন্ত কেউ খোঁজখবর নেয় নাই। এই দুইন্যাতে (দুনিয়ায়) আমার এখন কেউ নাই।'

মাধবপুর ইউএনও একেএম ফয়সাল বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাত্র আন্দোলনের নিহতদের তালিকা করবে বলে জেনেছি। ওই তালিকায় শামীমের নাম থাকলে তার পরিবার সরকারি তরফে অবশ্যই সহযোগিতা পাবে।'

দেশ রূপান্তর

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: শেখ মো: সফিকুল ইসলাম
পিতার	: শেখ লাল মিয়া
মাতার	: হামিদা খাতুন
গ্রাম	: শিমুলঘর
ডাকঘর	: ছাতিয়াইন
থানা	: মাধবপুর
জেলা	: হবিগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: সাভার, ২০/০৭/২০২৪
আক্রমনকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান	: সাভার, ২০/০৭/২০২৪
সমাধি	: নিজ গ্রাম
শহিদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা	: ১. বাসস্থানের ব্যবস্থা করা
	: ২. স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা

শহীদ সানজিদ হোসেন মৃধা

ক্রমিক: ৭৪৬

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৪৭

শহীদ পরিচিতি

সানজিদ হোসেন মৃধা গাজীপুর জেলার দেশপ্রেমিক কৃতিসন্তান। তিনি ২৭ জানুয়ারি ২০০৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ কবির হোসেন মৃধা এবং মায়ের বনাম রাজিয়া বেগম।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

২০০৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১৬ বছরে বেশিরভাগ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তারা নিজেরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের যে ক্ষমতার ভিত্তি, তার কোনটাই টেকসই ছিল না। কারণ তারা জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। ফলে মানুষের একটা ক্যাটালিস্ট বা স্ফুলিংগের দরকার ছিল। সেটাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছে।

ফলে সরকার বিরোধী একটা আন্দোলন যখন জোরালো হয়ে ওঠে, সেই আন্দোলন ঘিরেও মানুষের ক্ষোভের জন্ম হয়, তখন সেনাবাহিনী, কারফিউ বা পুলিশের পরোয়ানা না করে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজার হাজার মানুষ গণভবনের উদ্দেশ্যে রাজপথে নেমে এসেছিলেন।

বিশেষজ্ঞরা জানান, ১৫ বছরের একটা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, জিনিসপত্রের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি, গণপরিবহনের অব্যবস্থাপনা, লুটপাট, ব্যাংকিংয়ের অনিয়ম সব কিছু নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষ কোটা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে একটা পরিবর্তনের আশায় সম্পূর্ণ খালি হাতে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছেন।

তাহমিনা নামে একজন আন্দোলনকারী বলেন, ''আমার সরকারি চাকরির দরকার নেই, চাকরির আবেদন করার মতো বয়সও নেই। কিন্তু আমাদের সাথে যে মিথ্যাচার করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে, আমাদের যে ভয়ভীতির মধ্যে রাখা হচ্ছে, সেটার অবসান চাই। সেটার জন্যই আজ আমি পথে নেমে এসেছি।''

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলেও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ বাস্তবে কার্যত একটি 'একনায়কতান্ত্রিক' সরকারে পরিণত হয়েছিল।

২০০৮ সালের পর বাংলাদেশে বাস্তবিক অর্থে আর কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। এই সময়ে অনুষ্ঠিত তিনটি জাতীয় নির্বাচনের দুইটি হয়েছে অনেকটা একতরফা নির্বাচন।

২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিলেও সেখানে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল, যে নির্বাচনকে 'রাতের নির্বাচন' বলেও অনেকে বর্ণনা করেন।

এমনকি স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেসব নির্বাচনও বেশিরভাগ সময় একতরফা হয়েছে। যেখানে বিএনপি বা অন্য রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছে, সেখানেই অনিয়ম বা কারচুপির অভিযোগ উঠেছে।

ফলে গত ১৫ বছরে মানুষ আসলে ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি বেছে নেয়ার বা মতামত জানানোর কোন অধিকার পায়নি। বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় নেতাসহ শত শত নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে, মামলা বা সাজা দিয়ে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। অনেক নেতাকর্মীকে ধরে নিয়ে বছরের পর বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে। যে দেশটা স্বাধীন হয়েছে মানুষের ভোটের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে, সেই দেশে দীর্ঘ ১৫ বছরে মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ। তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আইন, নজরদারি করার মাধ্যমে।''

বাংলাদেশে গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিএনপি ও জামায়াতসহ বিরোধী দলগুলোকে সভা সমাবেশও করতে দেয়া হয়নি। জেল, গুম, খুন করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার ও পুলিশ বাহিনী মিলে পুরো দেশকে একটা 'মাফিয়া স্টেট' তৈরি করেছিল। সামাজিক মাধ্যমেও শেখ হাসিনা বা শেখ মুজিব বিরোধী বক্তব্য পোস্ট করার জের ধরে মামলা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার বিরোধী বক্তব্য দেয়ার জের ধরে মাসের পর মাস ধরে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে, জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আওয়ামীলীগের একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাও দেশের টাকা লুটপাট করে

উন্নত দেশে পাচার করতো। এককথায় আওয়ামী দুঃশাসন সকল স্তরের জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সকলেই একটি পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিল। অপরদিকে আওয়ামীলীগ পরিকল্পনা করেছিল জনতাকে গোলাম বানিয়ে আজীবন বংশ পরম্পরায় এদেশটাকে গিলে খাবে। আর তাই কোটা বিরোধী আন্দোলনে ব্যপক নির্যাতন হলেও ছাত্র-জনতা আরো বেশি পরিমাণে রাজপথে সামীল হতে থাকে। বাংলার ফেরাউনকে হঠাতে ও দেশের জন্য প্রাণ দিতে ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তাদের সাথে ১৬ বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত জনতা যুক্ত হতে থাকে। আন্দোলন পুলিশ, বিজিবি, আনসার, সেনাবাহিনী ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার মুখে বার বার থমকে যাচ্ছিল। ছাত্ররা নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে পারছিলোনা। রাজপথে যাদের হাতে মোবাইল ফোন থাকতো এবং তাতে হাসিনা বিরোধী কোন ছবি-তথ্য পেলেই গ্রেফতার, খুন করা হচ্ছিল। কারফিউ ও ইন্টারনেট বন্ধ করে সবকিছু অচল করে দেয়া হলো। দেশবাসী ভেবে নিলো বাংলার এই জুলুমবাজ ইহুদীদের আর বুঝি নির্মূল করা গেলোনা! এসময় আবির্ভূত হয় নির্যাতিত ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। তারা নিত্য নতুন ও অভিনব কর্মসূচী প্রদান করে আন্দোলনকে জাগিয়ে রাখে। ছাত্র সমন্বয়কদের সেইফ হোমে রেখে সরকারের নির্যাতনের সংবাদ ইন্টারনেট বন্ধ থাকার পরেও বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচার করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব মিডিয়া বাংলাদেশের দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগের হত্যাকান্ডে প্রবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে দেয়। জাতিসংঘের গাড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে ছাত্র-জনতাকে হত্যা করায় জাতিসংঘ কর্মকর্তা সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। বিশ্ববাসীর তখন একটাই জিজ্ঞাসা কেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সন্তানদের সাধারণ আন্দোলনকে রাক্তাক্ত করলো? কেন সাধারণ ন্যায় সংগত দাবী মেনে না নিয়ে ছাত্র-জনতাকে হত্যা করছে?

শেখ হাসিনা তার ১৬ বছরের লুটপাটের সঙ্গী ও বাংলাদেশের পরজীবী-আগাছা হিসেবে খ্যাত বামপন্থী দল গুলো নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করলো। তারা বুঝতে পেরেছিল সমস্ত আন্দোলন জামায়াত ও শিবিরের দেশপ্রেমিক মেধাবীদের সাহায্যে সংঘটিত হচ্ছে। শেখ হাসিনা ছাত্রদের শিবির আখ্যা দিয়ে একটি ভয়ংকর গণহত্যার প্রস্তুতি নিল। অপরদিকে দেশবাসী আরো বেশি ক্ষেপে গেল। শিবির নেতাদের আহ্বানে সকলে নিজেদের ফেইসবুক প্রোফাইল লাল করতে লাগলো। দেশবাসী প্রতিবাদে নিজেদের ফেইসবুক প্রোফাইল লাল করতে লাগলেন। সাবেক সেনাপ্রধানও এই

কর্মসূচীতে অংশ নিলেন। প্রাক্তন সেনা সদস্যরা এই আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করলেন। ৪ আগস্ট সারাদেশে আওয়ামী বাহিনী খুন করতে এসে প্রথমবারের মতো প্রতিরোধের মুখে পড়লো। শিবির নেতারা পরদিন মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচী দিলেন। সানজিদ হোসেন মৃধা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র। তিনি বুকে সাহস নিয়ে সমস্ত জুলাই জুড়ে রাজপথে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ছাত্রদের অধিকার রক্ষায় নিজের প্রাণের ভয়কে দূরে সরিয়েছিলেন। ৫ আগস্ট তিনি 'মার্চ ফর ঢাকা' কর্মসূচীতে অংশ নিতে রাস্তায় নেমে আসেন। বিকেলে উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের রবীন্দ্র সরণিতে হাসিনার খুনি বাহিনী তাকে গুলি করে হত্যা করে। উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

পরিবারের মামলা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা, বরগুনা-১ আসনের সাবেক এমপি ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভুসহ ২৩১ জনের নামে মামলাটি হয়েছে।

রোববার (১৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরীর আদালতে সানজিদের বাবা কবির হোসেন মৃধা মামলার আবেদন করেন।

আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে উত্তরা পশ্চিম থানাকে অভিযোগটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক সংসদ সদস্য মো. খসরু চৌধুরী আলহাজ্ব মো. হাবিব হাসান, শওকত হাচানুর রহমান রিমন।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নির্দেশে উত্তরার ৩ নং সেক্টরের রবীন্দ্র সরণিতে ৩০০/৪০০ জন গুলি চালায়। এতে সানজিদসহ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সানজিদকে মৃত ঘোষণা করেন।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Tentulia Union Parishad
Mohanganj, Netrakona
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration	Birth Registration Number	Date of Issuance
05/10/2024	20087216384121564	05/10/2024

Date of Birth : 27/01/2008 Sex : Male
In Word : Twenty Seven of January Two Thousand Eight

নাম	: সানজিদ হোসেন মৃধা	Name	: Sanjid Hossen Mrida
মাতা	: মোছাঃ রাজিয়া বেগম	Mother	: Mst Razia Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ কবির হোসেন মৃধা	Father	: Md Kabir Hossen Mridha
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: গাজীপুর, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Gazipur, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: হোল্ডিং-১০৬, বর্ষন হল রোড, উত্তর দত্তপাড়া, টেকবাড়ি, এরশাদনগর-১৭১২, অঞ্চল-১, টঙ্গী, গাজীপুর	Permanent Address	: Holding-106, Barshan Hall Road, Uttar Dattapara, Tekbari, Ershad Nagar-1712, Zone-1, Tongi, Gazipur

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md. Masudul Hasan
Secretary
3No Tentulia Union Parishad
Mohangnj, Netrakona

Seal & Signature
Registrar
Md. Sofiqul Islam Chowdhury
Secretary
3No Tentulia Union Parishad
Mohangnj, Netrakona

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: সানজিদ হোসেন মৃধা
জন্ম	: ২৭ জানুয়ারি ২০০৮
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: কবির হোসেন মৃধা
মাতা	: রাজিয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: ১০৬, বর্ষন হল রোড, উত্তর দত্তপাড়া, টেকবাড়ি, এরশাদ নগর, টঙ্গী, গাজীপুর
ঘটনার স্থান	: রবীন্দ্র স্মরণী, ৩ নং সেক্টর রোড, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী
আহত হওয়ার সময়	: বিকেল ৫ টা
আঘাতের ধরন	: গলায় গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, বিকাল ৫ টা

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ মেহেরুন্নেসা

ক্রমিক ৭৪৭

আইডি ঢাকা সিটি ১২৩

শহীদ পরিচিতি

মেহেরুন নেসা তানহা ২০০২ সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার আজিমনগর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহন করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তার জীবন প্রদীপ নিভে যায়। তিনি ছিলেন কলেজ ছাত্রী এবং জুলাই বিপ্লবের এক সক্রীয় নারী নেত্রী। তার বাবার নাম মোশারফ হোসেন (৬৪) ও মায়ের নাম আছমা আক্তার (৪৫)। একমাত্র ভাইয়ের নাম আব্দুর রহমান তারিফ (১৯)। তারিফ ২০২৪ সালে এইচএসসি পাশ করেছে। মেহেরুন নেসার বাবা গাড়িচালক এবং মা গৃহিনী।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

কোটা আন্দোলনে জুলাই মাস জুড়ে চলে গ্রেফতার ও গণহত্যা। দেশব্যাপী প্রকাশ্যে ও অপ্রাকাশ্যে চলে নিন্দার ঝড়। এসময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলো বন্ধ করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলে ছাত্ররা পাল্টা শিক্ষকদের সরকারী বাসভবন ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগরসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা শিক্ষক ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে পাল্টা নোটিস প্রদান করে নজির স্থাপন করে। এইচ এস সি পরীক্ষা চলমান ছিল। ছাত্ররা যাতে আন্দোলনে নামতে না পারে একারণে সরকার সর্বত্র সাধারণ ছুটির ঘোষণা দেয়। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। ফলে অনলাইনে আয়-ব্যায় বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কাজ করাসহ আয়-ব্যায় বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাংকিং সেক্টর স্থবির হয়ে পড়ে। অনলাইনে ডা. পিনাকী ভট্টাচার্য ও ইলিয়াস হোসাইনের আহ্বানে প্রবাসীরা আওয়ামীলীগের গ্রেফতার,গুম,খুন ও গণহত্যার প্রতিবাদে রেমিটেন্স প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। বৈদেশিক আয় কমে যাওয়ায় শেখ হাসিনা ইন্টারনেট সংযোগ অব্যাহত রাখতে বাধ্য হন। অফিস আদালত আবার সরব হয়ে উঠে। স্থগিত এইচ এস সি পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণের নির্দেশনা পেয়ে নটরডেম কলেজ, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, তীতুমীর কলেজ, চট্টগ্রামের বাইতুশরফ, পতেঙ্গা আলিয়াসহ সারাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ইসলামী ছাত্রশিবিরের পরামর্শে তৈরী ৯ দফা দাবী বাস্তবায়নের পক্ষে জোর দাবী জানায়। ছাত্রদের হত্যার বিচার করা না হলে এইচ এস সি পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একে একে কলেজ ও মাদরাসার এইচ এস সি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বয়কটের নোটিস অনলাইনে আসতে থাকে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন জুলাইয়ের শেষ দিকে আওয়ামীলীগের নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক ও ভাতের হোটেলের মালিক খ্যাত পুলিশের ডিবি হারুন ওরফে হাউন আংকেলের পতিতালয়ে সক্রীয় অংশগ্রহণের ভিডিও প্রকাশ করে দেয়। যা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায় এবং আওয়ামীলীগের নেতাদের লাম্পট্য অতীতের মতো হট নিউজ হিসেবে প্রচারিত হতে থাকে। যার প্রেক্ষিতে ১ আগস্ট হারুনকে গোয়েন্দা শাখা থেকে স্থানান্তর করে ডিএমপির ক্রাইম এন্ড অপারেশন শাখায় পদায়ন করা হয়। ১ আগস্ট জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে সরকার। আওয়ামীলীগ বুঝতে পেরেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করছে শিবিরের মেধাবী সদস্যরা। কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়ার পরে গ্রামীনফোন সেন্টার ঘেরাওয়ে নেতৃত্ব দেয় একজন ছাত্রী। উত্তরা, মিরপুর, বাড্ডা, রামপুরাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় রাজপথের উত্তপ্ত ময়দানে ছাত্রীদের সরব উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষনীয়। মিরপুরের হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজে অনার্স তৃতীয় বর্ষে পড়তেন মেহেরুন নেছা তানহা। তানহার মামাতো ভাই আকরাম খান রাব্বি ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ হন। তানহা বিক্ষুব্ধ হয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদে অংশ নেয়। জুলাই মাস জুড়ে রাজপথে সরব থাকে। ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতা কোন ধরণের অস্ত্র ছাড়াই সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরদিন ৫ আগস্ট ১ দফার ঘোষণায় ভয় পেয়ে শেখ হাসিনা তার দূর্নীতিবাজ ছোট বোনকে সাথে নিয়ে ভারতে পালাতে বাধ্য হন। ছাত্র-জনতা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে গণভবনের দিকে যাত্রা শুরু করেন। পথে পথে ছিল পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার ও আওয়ামীলীগের অস্ত্রধারীদের বাধা এবং নির্বিচারে গুলি। আহত হতে থাকে মানুষ, অনেকে শাহাদাত বরণ করেন। মেহেরুন নেসা তানহা দৃপ্ত পদে গণভবন দখলে এগিয়ে যায়। যেসকল সাহসী ছাত্র-ছাত্রী গণভবন দখলে নিয়েছিল তানহা তাদের একজন। এসম্পর্কে বাবা মোশাররফ হোসেন বলেন, 'মিছিলে যেতে মানা করতাম। মেয়ে শুনত না। অন্যদিনের মতো ৫ আগস্টও শেখ হাসিনার পালানোর খবরে গণভবনে যায় তানহা। ছবি তুলে ফেসবুকে দেয়। তানহার মা আছমা আক্তার বলেন, 'ওই দিন রাতে ৮ টায় মেয়ে আমার জন্য ফুল নিয়ে আসে। এসে বলে মা দেখো, তোমার জন্য গণভবন থেকে ফুল নিয়ে এসেছি। নাও এটা গণভবনের ফুল। আমাকে একগ্লাস পানি দাও। সারা রাস্তা হেঁটে এসেছি। আমি ওকে পানি দেই।

শাহাদাত সম্পর্কে মা বলেন, আমি তানহাকে বলি চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে, ভাই কোথায়? তানহা বলে ও যে কোন দিকে গেলো আমি জানি না। তখন ছেলেকে ফোন দিতে বলি, ওর ভাই তারিফকে ফোন দিয়ে বলে নতুন বাজারের দিকে ঝামেলা হচ্ছে। তুই পেছনের রাস্তা দিয়ে বাসায় আয়, এই কথা বলা শেষ হতেই তানহা মেঝেতে পড়ে যায়। আমি তাকিয়ে দেখি মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওর বুক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তখন আমি ওর আব্বাকে ফোন করি। ওর আব্বা দৌড়ে এসে ওকে ধরে নিয়ে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এসম্পর্কে তানহার বাবা বলেন, 'ওর মা যখন ফোনে আমাকে বলে তানহার গুলি লাগছে। আমি নিচে ছিলাম। দৌড়ে বাসায় আসি।

এসে দেখি মেয়ে আমার মেঝেতে পড়ে আছে। ওর শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তখন ওকে আমি একটু পানি খাওয়াই। মা, মা বলে ডাকি, মা আমার চোখ খোলে না। আমার দিকে তাকায় না। পরে আলোক হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু কোন লাভ হয় না। মা টা আমাকে ছেড়ে চলেই গেল। আমি এমন হতভাগ্য বাবা, আমার কোলের মধ্যে মেয়েটা মারা গেল, আমি কিছুই করতে পারলাম না।'

পরিবারের মামলা

বাবা মোশাররফ হোসেন সম্প্রতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ জনের নামে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

২০২২ সালের শুরুর দিকে পরিবারকে সহযোগিতা ও নিজের লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করতে রাকাইন সিটির একটি মেয়েদের পোশাকের শো রুমে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন।

শহীদ মেহেরুন নেসার বাবা ব্যাক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট কার চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন।

তাঁর বাবা মোশাররফ হোসেন গাড়ি চালক। অসচ্ছল হলেও সবাইকে নিয়ে মোশাররফের ছিল সুখের সংসার। বাবার ১৬ হাজার টাকা বেতনে সংসার চলে না। তাই বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাসার পাশেই একটি শোরুমে চাকরি করে পড়ালেখার খরচ চালাতেন তানহা। পরিবারকেও সহায়তা করতেন।

সহযোগিতা

জুলাই ফাউন্ডেশন থেকে পাঁচলাখ টাকার চেক ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দুই লাখ টাকা পেয়েছেন।

পরিবারের বক্তব্য

মোশারফ হোসেন বলেন, 'আমরা রাজনীতি করি না, বুঝিও না। আমার মেয়েও রাজনীতি করত না। ১৯ জুলাই জুম্মার নামাজের পর মিরপুরের মাজার রোডে মিছিলে ছিল তানহা'র মামাতো ভাই আকরাম খান রাব্বি। এমবিএ পরীক্ষা দিয়েছিল সে। ছেলেটার হাতে জায়নামাজও ছিল। কোনো অপরাধ করেনি। তবে পুলিশ প্রথমে রাব্বির হাতে গুলি করে। মাটিতে পড়ে গেলে পেটে গুলি করে। তিন দিন হাসপাতালের মর্গে রাব্বির লাশ আটকে রেখেছিল। পচাগলা লাশ ফেরত দিয়েছে। গোসল পর্যন্ত করানো যায়নি।'

তিনি বলেন, 'রাব্বি হত্যার পর বদলে যেতে শুরু করে তাঁর ছেলে ও মেয়ে। তানহা প্ল্যাকার্ড লিখত, 'আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'। এটা লিখে রাস্তায় দাঁড়াত।

তদন্ত করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার নির্দোষ মেয়েটারে মাইরা ফেলল। আমার বুক খালি কইরা দিল। আমি আমার মেয়ে হত্যার বিচার চাই।'

অন্তবর্তীকালিন সরকারের কাছে প্রত্যাশার বিষয়ে বাবা মোশাররফ হোসেন বলেন, 'পরিবারের নিরাপদ ভবিষ্যত চাই। আমার এই অল্প আয় দিয়ে তো সংসার চলে না। আমার বয়স হয়েছে। তাই সরকারের প্রতি আহবান, আমার ছেলের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ওর যেন একটি চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি যারা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় ভাবে সবাইকে শহিদের মর্যাদা দেওয়া হোক।

আছমা আক্তার বলেন, 'আমার মেয়েটা ঝাল খেতে পছন্দ করতো। বোম্বাই মরিচ তার খুব পছন্দের ছিল। প্রতি শুক্রবার নিজ হাতে পোলাও-মাংস রান্না করতো। এখন আমি পোলাও-মাংস রান্না করতে গেলেই মেয়েটার কথা মনে হয়। ওরা ভাই-বোন এক রুমে ঘুমাত। তানহা চলে যাওয়ার পর ওর ভাই ঠিক মত ঘুমায় না, খাবার খায় না, কথাও বলে না।'

তিনি আরো বলেন, আশা ছিল মেয়েটা পড়ালেখা শেষ করলে একটা চাকুরি করবে। ভালো ঘর দেখে ওর একটা বিয়ে দেব। আমার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। এখনও ভুল করে অনেক সময় খেতে বসে ডাকি, 'তানহা খেতে আয়'। কিছু সময় পরে মনে হয়, ও কিভাবে খেতে আসবে? চোখের পলকেই আমার সব শেষ হয়ে গেল। এখন আর আমাকে কেউ বলে না 'আমি বেতন পেয়েছি, মা তোমার কি লাগবে'?

মামা ফারুক খান বলেন, 'আমাদের একমাত্র ভাগ্নি ছিল তানহা। তাই আমরা সবাই ওকে আদর করতাম। আন্দোলনে আমার ছেলে (ওর ভাই রাব্বি) শহিদ হয়েছে ১৯ জুলাই। এরপর থেকে তানহা ওর মামিকে দেখাশোনা করার জন্য আমার বাসাতেই ছিল। ৫ আগস্ট সকালে নিজের বাসায় আসে। কেন যে মেয়েটাকে আসতে দিলাম। যদি আসতে না দিতাম তাহলে ছেলের পর ভাগ্নিটারে হারাতে হতো না।'

নিউজ লিংক

https://www.probahobangla.com/fitcher/9625

https://www.bssnews.net/bangla/stories-of-mass-upsurge/173111

https://www.somoynews.tv/news/2024-12-29/QJSL5AKV

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মেহেরুন নেসা
জন্ম	: ২০০২
পেশা	: ছাত্রী, অনার্স-৩য়, ব্যবসায় শিক্ষা, হযরত শাহ আলী কলেজ, মিরপুর
পিতা	: মো: মোশারফ হোসেন খান (৬৬)
মাতা	: আসমা আকতার (৪০)
ভাই	: আবদুর রহমান (১৯), ছাত্র, এইচ এস সি, মিরপুর ডিগ্রী কলেজ
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: ৫৫/২, পূর্ব বাইশটেক, ওয়ার্ড-০৪, কাফরুল, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: নিজ বাসার বারান্দায়
আক্রমণকারী	: পুলিশ ও যুবলীগ
আহত হওয়ার সময়	: তারিখ: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, সময়: রাত ৯ টা
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলি
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, সময়: রাত ৯ টা , আলোক হাসপাতাল
শহীদের কবরের অবস্থান	: পূর্ব বাইশটেক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

২. ছোট ভাইয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: কবিরুল ইসলাম

ক্রমিক: ৭৪৮

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ১১১

শহীদ পরিচিতি

মো: কবিরুল ইসলাম ১৯৭৫ সালের জুন মাসের ২৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান নোয়াখালী এবং বর্তমানে তার পরিবার বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাস করেন। তার বাবার নাম এম এ মতিন এবং মায়ের নাম শামছুর নাহার। বাবা-মা দুজনেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তার স্ত্রীর নাম শামছুন্নাহার শেলী এবং তাদের একাটি মাত্র কন্যা সন্তান আছে। মো: কবিরুল ইসলাম পেশায় ছিলেন একজন ডাক্তার। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাকে হারিয়ে দুই সদস্যের এই পরিবারটি এখন দিশেহারা, স্বামীর এ আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তিনি।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০০৮ সালে নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে অন্যায় অবিচার কায়েম করা শুরু করে। নির্বাচন হয়ে শুরুতে তারা ২০০৯ সালে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহের নাম দিয়ে ভারতের সহযোগিতায় পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ৫৭ জন দেশসেরা

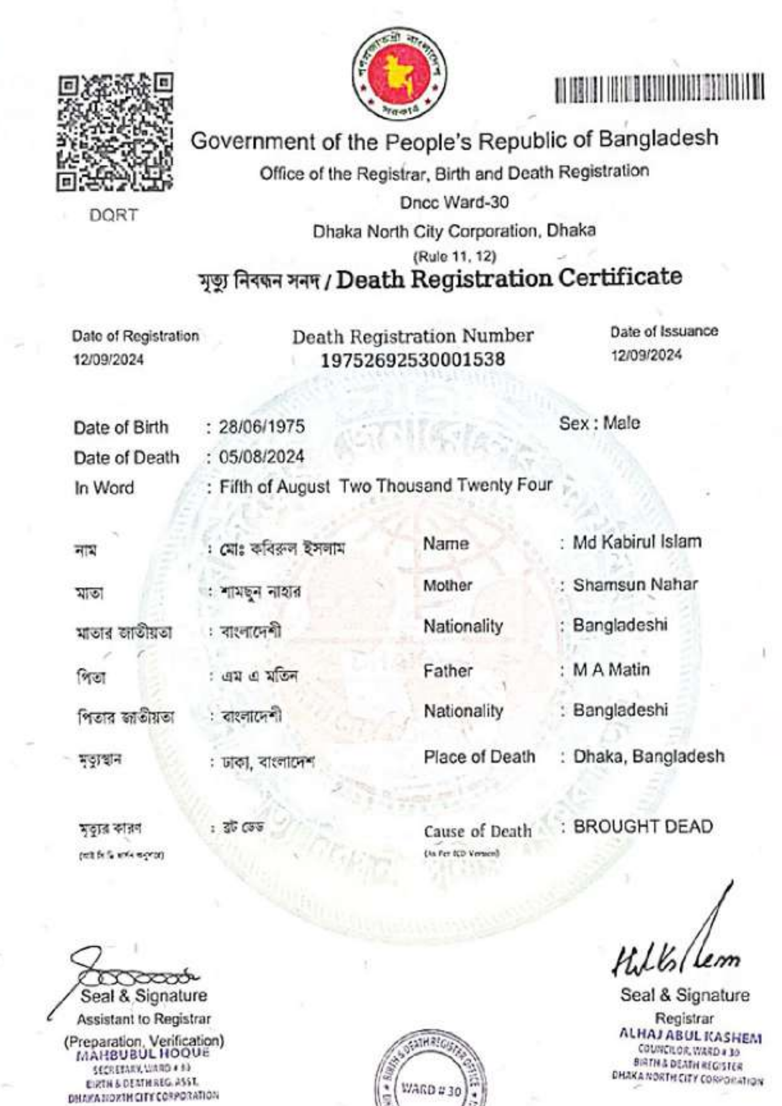

DQRT

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

Dncc Ward-30

Dhaka North City Corporation, Dhaka

(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
12/09/2024	19752692530001538	12/09/2024

Date of Birth : 28/06/1975 Sex : Male

Date of Death : 05/08/2024

In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ কবিরুল ইসলাম	Name	: Md Kabirul Islam
মাতা	: শামছুন নাহার	Mother	: Shamsun Nahar
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: এম এ মতিন	Father	: M A Matin
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: ব্রট ডেড	Cause of Death (As Per ICD Version)	: BROUGHT DEAD

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MAHBUBUL HOQUE
SECRETARY, WARD # 30
BIRTH & DEATH REG. ASST.
DHAKA NORTH CITY CORPORATION

WARD # 30

Seal & Signature
Registrar
ALHAJ ABUL KASHEM
COUNCILOR, WARD # 30
BIRTH & DEATH REGISTER
DHAKA NORTH CITY CORPORATION

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

Scanned with CamScanner

সেনা অফিসারসহ ৭৪ জনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, পরবর্তীতে যারা যারা হত্যাকাণ্ড কাছ থেকে নিজ চোখে দেখেছিল তাদের একে একে নির্মমভাবে হত্যা করে। সমস্ত আলামত নষ্ট করা হয় এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। ২০১০ সালে ২৭ জানুয়ারিতে সাবেক স্বৈরশাসক, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সম্পদ ভারতের হাতে তুলে দিয়ে এবং প্রচণ্ড রকমের লুটপাটের মাধ্যমে ৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী দল আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবকে বিপ্লবের মাধ্যমে যারা ক্ষমতাচ্যুত ও তার মৃত্যু ঘটিয়ে দেশকে মুক্ত করেছিলো তাদের চার জনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়া হয়। ঐ বিপ্লবে বজলুল হুদা ছিলেন অন্যতম নায়ক। তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে শেখ হাসিনা নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। শেখ হাসিনা ও তার হিংস্র সংগঠন আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছিলো এদেশে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে হলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ঘায়েল করা আবশ্যক। এ স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার পরিকল্পনা নেয় ২০৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার, এর পরিপ্রেক্ষিতে সে যা যা করা লাগে তা সে করবে। ২০০৯ সালের বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পরে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা কাদের মোল্লাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দেয়া হয় এবং দলটির অন্যান্য নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার গুম, খুন, হত্যার মাধ্যমে দেশে অরাজক পরিস্থিতি জন্ম লাভ করে। এরপর এ স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা একে একে কামারুজ্জামান, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, বিএনপির বাগা ইসলামী নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীসহ বিখ্যাত আলেম, জ্ঞানী-গুনীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হতে থাকে। এরপর ২০১৮ সালে সরকারি চাকুরীতে কোটা নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে, বাংলাদেশে সব ধরনের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এ কোটা ব্যবস্থা যেন না থাকে। এ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। লাগাতার আন্দোলনের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সরকার। কোটা আন্দোলন শেষ হওয়ার পর এ খুনি হাসিনা ৭ অক্টোবর ২০১৯ সালে বুয়েট এর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে ও তার বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা দ্বারা আবরার ফহাদকে সারা রাত অত্যাচার, নির্যাতন করে তাকে মেরে ফেলে। তার অপরাধ হলো তিনি খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে ফেসবুকে একটি পোস্ট করে। খুনি হাসিনা কেন ভারতকে মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং ফেনী নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশ থেকে এলপিজি আমদানি করার বিষয়গুলো নিয়ে আবরার ফাহাদ ফেসবুকে পোস্ট করে। এ রকম অসংখ্য হত্যাকাণ্ড

এ খুনি হাসিনা ক্ষমতা থাকাকালীন করতে থাকে। এরপর ২০২৪ সালে আবার কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাজপথে নামতে থাকে, যা বাংলাদেশে সংঘঠিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং এটি " জুলাই বিপ্লব" নামে পরিচিত।

যা দেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। এ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এর যাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে হয়ে গ্রাম হতে শহর অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় গুলো বন্ধ করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলে ছাত্ররা পাল্টা শিক্ষকদের সরকারি বাসভবন ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগরসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা শিক্ষক ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে পাল্টা নোটিশ প্রদান করে নজির স্থাপন করে। ছাত্ররা যাতে আন্দোলনে নামতে না পারে একারণে সরকার সর্বত্র সাধারণ ছুটির ঘোষণা দেয়। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, ফলে অনলাইনে আয়-ব্যয় বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে কাজ করাসহ আয়-ব্যয় বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাংকিং সেক্টর স্থবির হয়ে পড়ে। অনলাইনে ডা. পিনাকী ভট্টাচার্য ও ইলিয়াস হোসাইনের আহ্বানে প্রবাসীরা আওয়ামী লীগের গ্রেফতার, গুম, খুন ও গণহত্যার প্রতিবাদে রেমিটেন্স প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। বৈদেশিক আয় কমে যাওয়ায় শেখ হাসিনা ইন্টারনেট সংযোগ অব্যাহত রাখতে বাধ্য হন। অফিস আদালত আবার সরব হয়ে উঠে। স্থগিত এইচ এস সি পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণের নির্দেশনা পেয়ে নটরডেম কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, চট্টগ্রামের বাইতুশরফ, পতেঙ্গা আলিয়াসহ সারাদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ইসলামী ছাত্রশিবিরের পরামর্শে তৈরি ৯ দফা দাবী বাস্তবায়নের পক্ষে জোর দাবী জানায়, এর পরিপ্রেক্ষিতে ১ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। ৯ দফা আদায়ের দাবীতে সারাদেশে গণমিছিল করে ছাত্র জনতা, রাজাধানীসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ইতিমধ্যে আন্দোলনকারী হাজারো শিক্ষার্থী গ্রেফতার, গুম, খুন ইত্যাদি শিকার হয়। এ খুনি হাসিনার পুলিশ বাহিনী ও ছাত্রলীগ কর্মী দ্বারা শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবী না মেনে খুনি হাসিনা গণগ্রেপ্তার ও গণহত্যা চালু রাখে, এর প্রতিবাদে শহীদ মিনারে বিশাল বিভোক্ষ সমাবেশ করে ছাত্রজনতা। সেনাপ্রধান তার সেনা কমান্ডার নিয়ে মিটিং করেন। সেখানে তিনি এই বার্তা পান যে, সেনাবাহিনী আর গুলি করতে প্রস্তুত নয়। কয়েক লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ৯ দফা বাদ দিয়ে ১ দফার (খুনি হাসিনার পদত্যাগ) ঘোষণা দেয় ছাত্রনেতারা। হাসিনা ছাত্রদের আলোচনা করার প্রস্তাব দেয়, প্রয়োজনে মন্ত্রীদের কয়েকজন পদত্যাগ করার ঘোষণাও দেয়, ছাত্ররা সব আলোচনা নাকোচ করে দেয়। ৪ আগস্ট রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলে হামলা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী। এদিন পুলিশ এর সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরাও ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। পরদিন ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র জনতা, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগষ্ট স্বৈরাচারের পতন ঘটে। স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে গোপনে পালিয়ে যায়। খুনি হাসিনার দেশ পলায়নের খবর ছড়িয়ে পরলে সারাদেশে আনন্দ মিছিল বের হয়, মোঃ কবিরুল ইসলাম তখন এ আনন্দ মিছিলে অংশ নিতে নিজের বাসা থেকে বের হন, তিনি ছিলেন রাজধানী আদাবর এর বাসিন্দা। কিন্তু তার এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকেনি। সারাদেশে আনন্দ মিছিল করলে রাজধানী আদাবর এলাকা তখন ও ছিল উত্তপ্ত। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তখন তার স্ত্রী শামছুন্নাহার শেলী স্বামীকে ফোন দিলে তাকে আর ফোনে পাওয়া যায়নি। বিকেল গড়িয়ে রাত হলো শামছুন্নাহার শেলী আর তার স্বামীর খোঁজ পায়নি। রাত গড়িয়ে সকাল হলে ডাক্তার কবিরুল ইসলাম এর খোঁজ পাওয়া গেল, তবে তিনি আর জীবিত নয় মৃত। ডাক্তার কবিরুল ইসলাম এর মৃতদেহ পাওয়া যায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। খুনি হাসিনার পুলিশ বাহিনী তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তার মৃত দেহ ঐখানে তারা ফেলে রেখে চলে যায়। পরবর্তীতে তার মৃতদেহ তার পরিবার এর কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

বাসা ভাড়া থেকে আয় দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন স্ত্রী শেলী। পাশাপাশি গ্রামে একটি মসজিদ ও মাদরাসার খরচও চালিয়ে যাচ্ছেন।

নিউজ লিংক

https://youtu.be/7C1Ov_SlfDo?si=WAGiuUzYaXsHFFsE

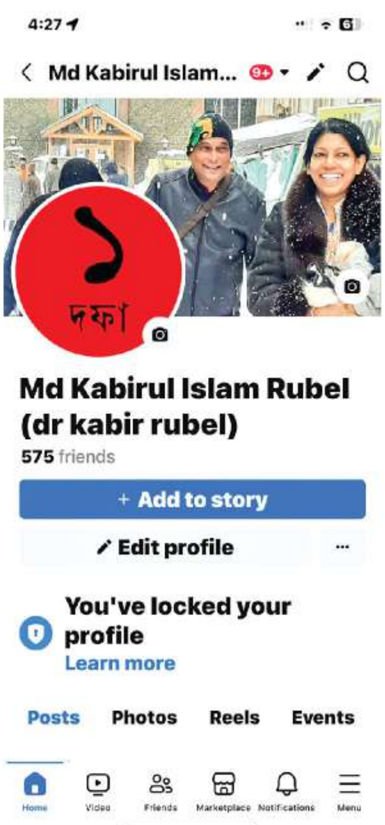

একনজরে শহীদের তথ্য

নাম	: কবিরুল ইসলাম
বাবা	: এম এ মতিন
মা	: শামছুর নাহার
স্ত্রী	: সামসুন্নাহার শেলী
কন্যা	: স্থাপনা ইসলাম পৌষী
বর্তমান ঠিকানা	: ৮০৮, ৩ নং রোড, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: নোয়াখালী
আক্রান্তের স্থান	: আদাবর থানার সামনে
মৃত্যুবরণ করেন	: সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে

শহীদ মোহাম্মদ ইয়াকুব

ক্রমিক: ৭৭০
আইডি: ঢাকা সিটি ১৩২

এক মায়ের সমস্ত আকাশ যার শরীরে রক্ত হয়ে নেমে এলো

শহীদের পরিচিতি

মো: ইয়াকুব এই নাম কোনো ব্যানারে ছিল না, পোস্টারের কোণে ছাপা হয়নি। কিন্তু একটি বিধ্বস্ত ঘরের ভিতর, ছেঁড়া বিছানার পাশে বসে থাকা এক বৃদ্ধা মায়ের চোখে, এই নামটিই একটি গোটা মহাবিশ্বের সমার্থক। জন্ম ১ জানুয়ারি, ১৯৮১। পিতা ইউসুফ মিয়া, মাতা রহিমা আক্তারের একমাত্র সন্তান। ছেলে ও মায়ের মধ্যে ছিল এক অদৃশ্য গাঁথুনি; যেন হৃদয়ের ধমনী ধরে বেঁচে আছেন তারা দু'জনেই।

বোনের বিয়ের পর মা এখন জামাইয়ের ঘরের এক কোনায়, ঠিক যেন কোনো বস্তু। বসবাস যে ঘরে, তা মানুষ থাকার উপযোগী নয়। বৃষ্টির দিনে হাঁটুসমান পানি উঠে যায়, ছাদের ফাটল দিয়ে ঝরে জল, আর দেয়ালের রং চুলকানো ক্ষত হয়ে ঝরতে থাকে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন ঘর কেবল ঠাঁই নয়, তা এক নির্জন শ্মশান যেখানে মায়েরা বাঁচে না, শুধু নিঃশ্বাস নেয়। মা বলেছিলেন, "কখনো ভাবি নাই, নিজের মেয়ের জামাইয়ের ঘরে আশ্রিত হয়ে থাকবো, ছেলে চলে গেছে আমি কোথায় যাবো?" এটুকু বলা যত সহজ, সেই উচ্চারণের ভিতর গুমরে থাকা যন্ত্রণা; তা ভাষার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি তাঁর ছেলেকে শুধু সন্তান হিসেবে ভালোবাসেননি তাঁর জীবনের কারণ ছিলেন ইয়াকুব। তাঁর যত জমানো স্বপ্ন, বিশ্বাস, আশ্রয় সবই ছিল ওই ছেলেটির শরীরের উপর নির্ভর করে। ইয়াকুব কোনো অফিসে চাকরি করতেন না, তাঁর নামে কোনো সনদ নেই, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা নেই কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ছিল এক ভয়হীন, পবিত্র ন্যায়বোধ। অন্যায়ের সংবাদ শুনলে স্থির থাকতে পারতেন না। একজনের মৃত্যুতে কাঁপতেন, আর বলতেন, "মা, অন্যদের ছেলেরা মরছে, আমি বসে আছি আমিও যাবো।" তখন মা গলা ধরে বোঝাতেন, **"তুই গেলে আমি বাঁচবো কিভাবে?"** কিন্তু এই ছেলে পৃথিবীর নিয়মে গড়া সন্তান ছিল না সে ছিল অন্যরকম এক আগুন, যে ভাবত, **"আল্লাহ দেখছেন। আর যদি তিনি দেখেন, তবে আমার চুপ করে থাকা চলে না।"** তাই সে গিয়েছিল। শহরের এক উত্তপ্ত দুপুরে, রাস্তায় রাস্তায় তখনো গুলির শব্দ, আর চিৎকারে বাতাস ছিন্নভিন্ন। সেই মুহূর্তে ইয়াকুব ছিলেন সামনে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না তিনি। জানতেন, তাঁর মৃত্যু কেউ গণনা করবে না; তাঁর নাম হবে না কোনো গণমাধ্যমে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে একজন দেখছেন। সেই বিশ্বাসেই শহীদ হয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর মা বেঁচে আছেন কিন্তু যেন এক দাহশালা-সম জীবন বয়ে বেড়াচ্ছেন। কোনো ভাত নেই ঠিকমতো, ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই। তাঁর চোখের নিচে শুকনো রেখা, কিন্তু তার চেয়েও গভীর হলো সেই শূন্যতা যেখানে ছেলে ফিরে আসে না, আর কেউ **"মা"** বলে ডাকেও না।

মোহাম্মদ ইয়াকুব আমাদের রাষ্ট্রের কাছে এক সংখ্যা কিন্তু তাঁর মায়ের কাছে তিনি ছিলেন বেঁচে থাকার শেষ কারণ। এই শহীদের রক্ত শুধু মাটিতে মিশে যায়নি, তা মিশে গেছে এক বাঙালি মা'র অন্তর্গত আত্মায়। যতদিন সেই মাটি আছে, এই নামটিও বেঁচে থাকবে।

জুলাইয়ের আগুন: যে আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল ইয়াকুবদের

বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক শোক, অনেক জুলুম কিন্তু জুলাই ২০২৪ যেন তার মাঝে এক লাল-কালো রক্তছাপ দিয়ে লেখা অধ্যায়। এটি কেবল একটি আন্দোলনের সময়কাল নয়। এটি ছিল রাষ্ট্র নামক জুজুবরার মুখোশ খুলে ফেলার সময়। এখানে গুলি করেছিল তারা, যাদের দায়িত্ব ছিল রক্ষা করা। এখানে পেটাতে নেমেছিল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগ যাদের বলা হয় ভবিষ্যতের নেতৃত্বের মুখ। কিন্তু রাজপথে দাঁড়িয়েছিল এক ঝাঁক তাজা প্রাণ। তাদের কারও নাম কেউ জানে না, তাদের বাড়ি কোথায় কেউ জানে না, শুধু জানে তারা এসেছিল বুক পেতে দাঁড়াতে, অন্যের গুলির মুখে। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হয়েছিল উত্তাল ঢেউ। কিন্তু এটা কোনো ফেসবুক পেজের আহ্বান ছিল না; এটা ছিল হাজারো বছরের জমে থাকা বঞ্চনার গর্জন। একটা রাষ্ট্র যখন নাগরিকের কণ্ঠ রোধ করে, তখন সেই কণ্ঠস্বর পাহাড় ভেদ করে বের হয়ে আসে। রংপুরের শহীদ আবু সাঈদের মৃত্যু তা যেন আগুনে ঘি ঢেলে দিলো। কেউ আর পেছনে ফিরলো না। আন্দোলনের ভাষা বদলে গেল। দাবির কেন্দ্রবিন্দু বদলে গেল। কোটা তখন শুধু একটি নীতির প্রশ্ন নয়, তা হয়ে উঠলো "আমার জীবন কেন তুচ্ছ হবে তোমার ক্ষমতার কাছে?"

এই হলো সেই মুহূর্ত, যখন ইয়াকুবদের জন্ম হয়। ইয়াকুব একটি নাম, একটির মতোই হাজারো মুখ। কারও মা তাঁকে ডাকে "বাবা", কারও বন্ধু বলে "ভাই", কিন্তু রাষ্ট্র বলে "অসন্তোষকারীদের একজন"। ইয়াকুব ছিলেন না কোনো নেতা, কোনো সংগঠনের মুখপাত্র। তিনি ছিলেন এক সাধারণ মানুষ, যাঁর রক্তে ছিল প্রতিরোধের নেশা, ন্যায়ের নেশা। রাতে বাড়ি ফিরতেন চুপচাপ, চোখেমুখে ক্লান্তি, কিন্তু হৃদয়ে ঝড়। মা জিজ্ঞেস করলে হাসতেন কিন্তু সে হাসির আড়ালে ছিল এক বিদ্রোহ, এক দায়। মা বুঝতেন না সব, তবু বলতেন, "কাক ডাকে মাথার উপর, আমার বুক কাঁপে।" জুলাইয়ের সেই দিনগুলোতে ঘর মানে ছিল ভয়ের

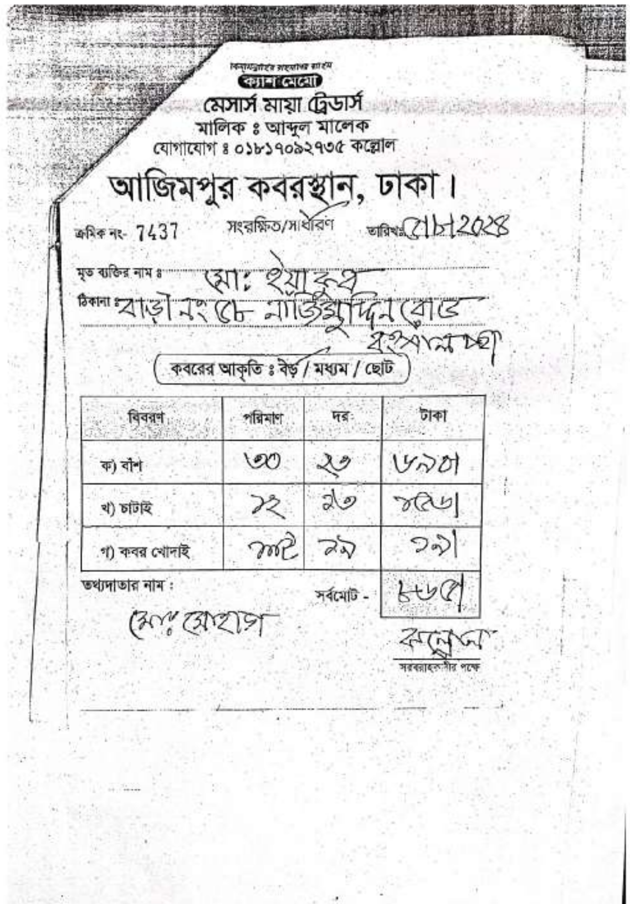

ক্যাশ মেমো
মেসার্স মায়া ট্রেডার্স
মালিক ঃ আব্দুল মালেক
যোগাযোগ ঃ ০১৮১৭০৯২৭৩৫ কল্লোল

আজিমপুর কবরস্থান, ঢাকা।

ক্রমিক নং- 7437 সংরক্ষিত/সাধারণ তারিখঃ

মৃত ব্যক্তির নাম ঃ মো: ইয়াকুব

ঠিকানা ঃ

কবরের আকৃতি ঃ বড় / মধ্যম / ছোট

বিবরণ	পরিমাণ	দর	টাকা
ক) বাঁশ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
খ) চাটাই	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গ) কবর খোদাই	[illegible]	[illegible]	[illegible]

তথ্যদাতার নাম :

সর্বমোট - [illegible]

সরবরাহকারীর পক্ষে

দেয়াল। ছেলেরা ফিরবে কি না, মায়েরা জানতেন না। কিন্তু আবার সকালে বেরিয়ে যেতো তারা কারণ তারা জেনে গিয়েছিল, ঘরে থাকলে মরবে একা, পথে গেলে মরবে সবাই মিলে, মর্যাদা নিয়ে। এই হলো সেই বিদ্রোহের ভাষা, যা পুঁথিতে লেখা যায় না এটা জন্মায় নিপীড়নের গর্ভে।

রাষ্ট্র চেয়েছিল এই আগুন নিভিয়ে দেবে গুলি দিয়ে, মামলা দিয়ে, নির্যাতন দিয়ে। কিন্তু তারা জানতো না, একবার যদি কারও ভেতরে "আমিও মানুষ" এই চেতনা জেগে ওঠে, তখন তাকে আর দমন করা যায় না। জুলাই ২০২৪-এর আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, কোনো ক্যাম্পেইনের নয়। এটা ছিল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের অসাধারণ হওয়ার গল্প। এই আন্দোলনের বুকেই জন্ম নেয় ইয়াকুবরা যারা গোপনে রাতের আঁধারে পোস্টার সাঁটায়, যারা ভোরে প্ল্যাকার্ড লিখে, যারা পুলিশের লাঠিতে পড়ে যায় কিন্তু বলে, "আমি আবার আসবো।" এখানে বিপ্লব ছিল না কোনো নেতার ভাষণে। এখানে বিপ্লব ছিল একটি মায়ের প্রার্থনায়, একটি সন্তানের যুদ্ধে, একটি জাতির ঘুম ভাঙায়। আর এই বিপ্লব যতদিন থাকবে স্মৃতিতে, ততদিন ইয়াকুবরাও বেঁচে থাকবে প্রতিটি নীরব গুলির ভিতর।

ইয়াকুবের শেষ দিন: এক রক্তাক্ত সকাল, এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা

০৫ আগস্ট ২০২৪, দিনটা মনে আছে ভালো করে সেই বিভীষিকাময় লাল জুলাইয়ের শেষভাগ, যখন প্রতিটি সকাল যেন নতুন এক শোকবার্তা বয়ে আনতো। সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল রাজধানীর রাজপথে। কোথাও ছাত্ররা জড়ো হচ্ছে, কোথাও আবার গুলির গুঞ্জন। তখনও কেউ জানত না, এই দিনের ইতিহাস লেখা হবে একটি মায়ের বুক চিরে, একটি সন্তানের রক্ত দিয়ে। ঘড়ির কাঁটা বলছিল ১১টা ১৫। হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ে "গুলির ঘটনা ঘটেছে, ইয়াকুব গুলিবিদ্ধ।" খবরটা যখন মায়ের কানে পৌঁছায়, তিনি তখন ঘরের এক কোণায় চুপচাপ বসে ছিলেন কেন জানি বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠেছিল। কেউ এসে বললো, "আপনার ছেলেকে গুলি করা হয়েছে।" কিন্তু কেউ জানালো না, কোথায়। কেউ মুখে বললো না, কী হয়েছে। শুধু চোখে চোখে একধরনের কফিনের নীরবতা ছিল।

মা তখন রাস্তায় নেমে পড়েন, পাগলের মতো ছুটতে থাকেন হাসপাতালের পথ ধরে, কিন্তু কোথাও ছেলেকে খুঁজে পান না। কেউ কিছু বলে না। আশপাশের মানুষ যেন এক গভীর শূন্যতা বয়ে বেড়ায়। তাতেই মা বুঝে যান এই নীরবতা কথার চেয়েও বেশি নির্মম। ছেলেটা আর নেই। তারপর আসে সন্ধ্যা। ঘরজুড়ে তখন শুধু কান্না আর ক্যামেরা। ইয়াকুবের লাশ আনা হয় প্লাস্টিক মোড়ানো ব্যাগে, মা ছুটে যান, তাঁকে কেউ লাশ স্পর্শ করতে দেয় না। কিন্তু যখন তাঁকে ছেলের গায়ে রাখে, তখন সেই শরীরের উষ্ণতা নেই, আছে শুধু এক অদ্ভুত ঠান্ডা যা মায়ের বুকেও নেমে আসে। মা বলছিলেন, চোখের পানি থামছিল না "ওর রক্তে আমার সাদা জামাটা লাল হয়ে গিয়েছিল। শুধু জামা নয়, আমি নিজেও যেন রক্তে স্নান করলাম।" প্রতিবেশীরা ভিড় করে, মিডিয়ার ক্যামেরা ঘোরে, কেউ মা'র মুখ চায় টিভিতে দেখাতে কিন্তু সেই মুখে আর কিছু নেই। শুধু একটা চিৎকার "আমার একটাই ছেলে ছিল, ও নেই, আমি বাঁচবো কীভাবে?"

এই মৃত্যু কেবল একটি সন্তানের নয়, এটি ছিল একটি যুগের মৃত্যু। একটি বুকে গজিয়ে ওঠা সাহসের মৃত্যু। এক নির্ভীক প্রতিবাদের মৃত্যু। এবং রাষ্ট্র যে কিনা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংরক্ষণে সে নিজেই হয়ে উঠলো হত্যার হন্তারক। কেউ বিচার চায়নি তখন, মা-ও না। তিনি শুধু চাইছিলেন, যদি একবার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারতেন। কিন্তু আন্দোলনের সন্তানদের এমনটিই হয় তারা ফিরে আসে না জীবিত, আসে ঝড়ের মতো, চলে যায় বিদ্যুতের মতন। আর রেখে যায় অসীম শূন্যতা। মায়ের সেই কান্না এখনও বাতাসে ভেসে বেড়ায়। শুধু তিনি নন, এই দেশের মাটির গায়ে এখনো লেগে আছে ইয়াকুবের রক্তের গন্ধ। সে গন্ধ শুধু গুলির নয় তা হলো রাষ্ট্রের আত্মঘাতী নৈঃশব্দ্যের প্রতিচ্ছবি।

"শুধু শ্বাস নেই, বেঁচে নেই"

শহীদ ইয়াকুবের মায়ের নিঃসঙ্গতা

আজ রহিমা আক্তার একা। ছেলের মৃত্যুর পর তিনি আর মা নন, আর মানুষও নন তিনি যেন এক স্মৃতিচারণে বন্দী অবশ দেহমাত্র। তাঁর চারপাশে যেন সব কিছু থমকে আছে, অথচ সময় চলছে নিষ্ঠুর, উদাসীন, অচেনা। আগে যেখানে প্রতিদিনের শুরু হতো ছেলের ডাকে, "মা, নাস্তা করো," এখন ঘরের কোণটায় চুপচাপ বসে থাকেন তিনি, চেয়ে থাকেন দেয়ালে, যেখানে ইয়াকুবের একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি ঝুলে আছে চোখে আগুন, কপালে ঘাম, মুখে এক চিলতে ধৈর্য। সেই ছবির চেয়ে বাস্তব কিছু নেই এখন তাঁর কাছে।

ঘরটা ছোট, ছাদের কোনা থেকে পানি পড়ে, রান্নাঘরে তিনদিনে একবার হয় কিছু, আর মা নিজেই ভুলে যান খেতে। তাঁর সন্তান ছিল তাঁর শেষ অবলম্বন, একমাত্র উপার্জনক্ষম, ভালোবাসার একমাত্র কেন্দ্র। সেই অবলম্বনকে এক গুলির শব্দে, এক রাষ্ট্রীয় মিছিলে, এক নির্মম নিঃশ্বাসে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এখন, মা বলেন, "আমি তো এখনও শ্বাস নেই, কিন্তু বেঁচে নেই কারণ আমি জানি, ও ছাড়া আমার কোনো দিন আর আসে না।"

মা এখন আশ্রিত। মেয়ে আছে, কিন্তু মেয়ের সংসারে মা যেন একটা বোঝা খরচ বাড়ে, সময় লাগে, দৃষ্টি এড়াতে হয়। জামাই মুখে কিছু না বললেও মা জানেন, তাঁর উপস্থিতি আজ অতিরিক্ত। তিনি এখন বুঝে গেছেন, ছেলে না থাকলে মা থাকেন না মা হয়ে ওঠেন অতীতের ছায়া। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি চুপচাপ ছেলের নাম ধরে ডাকেন, কেউ জবাব দেয় না, দেয়ার কেউ নেই। আর্থিক দুঃখকষ্টের কথা মা বলেন না, কিন্তু জানানো যায় একটা ভাঙা চায়ের কাপেও এখন ইতিহাস জমে থাকে। গ্যাসের বিল জমে যায়, ওষুধ কেনা হয় না, ফ্যান চলে না ঠিকমতো তবুও মা বাঁচতে চান, শুধু এজন্য যে তাঁর ছেলের নামটা কেউ যেন মনে রাখে। তিনি বলেন, "ও তো কোনো অপরাধ করেনি, কোনো রাষ্ট্রদ্রোহ করেনি। শুধু বলেছিল 'যারা মরছে, তারা তো কারও সন্তান। আমি কীভাবে চোখ বন্ধ করে থাকবো, মা?'"

সেই প্রশ্নটাই এখন বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। ইয়াকুব নেই, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন রয়ে গেছে আমাদের দিকে চেয়ে থাকা এক জ্বলন্ত চোখ হয়ে। সেই চোখে এখন আগুন নেই, আছে চিরস্থায়ী শোক, যা আমাদের নীরবতাকে অভিশাপ দেয়। মা শুধু চায়, কেউ যেন একবার উচ্চারণ করে "ইয়াকুব শহীদ, কারণ সে মানুষ ছিল।" এই দেশ যে আজও দাঁড়িয়ে আছে, তা ইয়াকুবদের মত নামহীন নায়কদের রক্তে ভেজা মাটি। কিন্তু মায়ের কাছে এসব কিছু না তিনি চান না ইতিহাস, চান না ছবি। তিনি শুধু চান রাতে ঘুমানোর আগে যেন কেউ একবার বলে, "তোমার ছেলেটা ন্যায়ের পক্ষে ছিল, মা।" আর এই চাওয়া এই ক্ষীণ আশ্রয়টাই, তাঁর জীবনের শেষ বেঁচে থাকা।

প্রস্তাবনা ও উত্তরাধিকারের দায়িত্ব

অন্তর থেকে বলি এই শহীদের জন্য রাষ্ট্র, সমাজ আর ইতিহাস তিন স্তম্ভই একত্রে দায়বদ্ধ। মোহাম্মদ ইয়াকুবের আত্মত্যাগ যেন মুছে না যায় এই ভাঙা দেওয়াল আর ধূসর জঙ্গলে। তার মায়ের দিনগুলো কেটে যায় এক অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মতো ধীরে, নীরবে, অদৃশ্য বেদনায়। প্রথম প্রস্তাব রাষ্ট্র যেন মা রহিমা আক্তারকে দেয় একটি স্থায়ী আশ্রয়। যেন আর বোনের জামাইয়ের সংসারে 'বোঝা' হয়ে থাকতে না হয়, যেন তার বুক ভরে শান্তি ও মর্যাদা। দ্বিতীয়ত, তার পরিবারকে অবশ্যই দেওয়া হোক মাসিক সম্মানভাতা এক রক্তসিক্ত ছেলের ত্যাগের বিনিময়ে যেন মা অন্তত ঔষধ কিনে নিতে পারেন, পেট ভরে খেতে পারেন, মানবিক জীবন যাপন করতে পারেন। ইয়াকুব মারা যাননি কেবল গুলিতে; তিনি মরে গেছেন সমাজের নিষ্প্রাণ নিরবতায়। আর আজ যদি আমরা অচেতন থাকি, কোনও পদক্ষেপ না নেই, তবে আমরা নিজেই হয়ে যাব তার হত্যার সহযোদ্ধা অভিশপ্ত হবে আমাদের বিবেক।

এই দায়িত্বের পালা এখন আমাদের হাতে নিরবতা নয়, কণ্ঠ ওঠার সময়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
DHAKA SOUTH CITY CORPORATION
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
ওয়ার্ড নং- ২৭, অঞ্চল-০৩
নবাবগঞ্জ সেকশন বেড়ীবাঁধ, ঢাকা-১২১১।

স্মারক নং ঃ

তারিখ ঃ ০২/১২/২০২৪

মৃত্যুর প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২৭নং ওয়ার্ডের আওতাধীন, মোঃ ইয়াকুব, পিতাঃ মৃত ইউসুফ মিয়া, মাতাঃ রহিমা আক্তার, বর্তমান ঠিকানাঃ ৫৮ নাজিম উদ্দিন রোড, ডাকঘরঃ ঢাকা সদর, থানাঃ বংশাল (সাবেক কোতয়ালী), জেলাঃ ঢাকা-১১০০। জাতীয় পরিচয়পত্র নং- ৬৪০ ৮৮৭ ৭৫১৯। তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এবং ২৭ নং ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা। আমার জানা মতে, তিনি ০৫/০৮/২০২৪ খ্রিঃ মৃত্যু বরণ করেন। তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

আমি মরহুম এর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

মোঃ শওকাত [illegible]
ওয়ার্ড সচিব, ওয়ার্ড নং-২৭
অঞ্চল-০৩, প্রশাসন শাখা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

০২/১২/২৪

[illegible]
(উপ-সচিব)
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
অঞ্চল-০৩
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম	: মো: ইয়াকুব
জন্ম তারিখ	: ০১ জানুয়ারি ১৯৮১
পিতা	: ইউসুফ মিয়া (মৃত)
মাতা	: রহিমা আক্তার
ভাই-বোন	: এক বোন: মোছা: শাহাজাদী বেগম, বিবাহিত
বর্তমান পারিবারিক অবস্থা	: মা রহিমা আক্তার বোনের বাসায় থাকেন
বর্তমান ঠিকানা	: হোল্ডিং: ৫৮, নাজিমউদ্দিন রোড, বংশাল (সাবেক কোতয়ালী), ঢাকা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল আনুমানিক ১১:১৫ টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: বাসার পাশে কলেজের সামনে; গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় মৃত্যুবরণ
আঘাতের ধরণ	: মাথায় গুলি; পেছনের অংশ উড়ে যায়
দাফনস্থল	: আজিমপুর কবরস্থান; সন্ধ্যায় দাফন, মিডিয়া ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে
অর্থনৈতিক অবস্থা	: চরম সংকটাপন্ন

শহীদ কারিমুল ইসলাম

ক্রমিক: ৭৫০

আইডি: সিলেট বিভাগ ০৩৩

শহীদ পরিচিতি

কারিমুল ইসলাম ২০০২ সালে ১৫ মে সিলেট জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর বাবার নাম মোঃ শাহাবুদ্দিন এবং মায়ের নাম সায়েদা বেগম। তাঁর স্ত্রীর নাম কোহিনুর আক্তার।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

কোটাপ্রথা নিয়ে টানা আন্দোলন শুরু হয় ৫ জুলাই। শুরুতে এই আন্দোলন অহিংস হলেও তা সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে ১৫ জুলাই থেকে। প্রথমে আন্দোলন প্রতিহত করতে নামেন ছাত্রলীগ ও দলীয় সমর্থকেরা। এই সন্ত্রাসী বাহিনী নির্দয়ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরদের পেটায়। শেখ হাসিনা ছাত্রদের নির্মূল করতে পরে রাজপথে নামান হয় পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীকে।

৬ জুলাই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম, 'বিএনপি তো একটি রাজনৈতিক দল। দেশের ভেতরে যা হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া তো বিএনপিকে দিতেই হবে। এটা ছাত্রদের আন্দোলন। এখানে বিএনপির সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই বলে ন্যায্য আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন করব না?'

৮ জুলাই ওবায়দুল কাদের বলেন, 'কোটা বাতিলের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

অপরদিকে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাশ করতে হবে। এটা করার দায়িত্ব কেবল নির্বাহী বিভাগ ও সরকারের। এখন আর আদালত দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।'

১১ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল বলেন, 'শিক্ষার্থীরা লিমিট ক্রস করে যাচ্ছেন।'

১৪ জুলাই শেখ হাসিনা বলেন, 'কোটা বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। মামলার পর আদালত যে রায় দেন, এতে নির্বাহী বিভাগের কিছু করার নেই। আদালতেই সমাধান করতে হবে।'

'তারা তো আইন মানবে না, আদালত মানবে না, সংবিধান কি তারা চিনবে না বা একটা কাজ করতে হলে কার্যনির্বাহীর কাজ কী, বিধিমালা বা ধারা থাকে, একটা সরকার কীভাবে চলে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা এদের নাই।' মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না? তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে?'

তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে সারাদেশে ছাত্র-ছাত্রীরা রাজপথে নেমে এসে স্লোগান দিতে থাকে, তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!

১৫ জুলাই ওবায়দুল কাদের বলেন, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের "রাজাকার" স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে।'

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম বলেন, 'কোটা সংস্কার আন্দোলনে যাঁরা "আমি রাজাকার" স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁদের শেষ দেখিয়ে ছাড়ব।'

তখনকার শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেল বলেন, যারা প্রকাশ্যে নিজের আত্মপরিচয়, জন্মপরিচয়, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে "তুমি কে, আমি কে রাজাকার! রাজাকার!" স্লোগান দিয়েছে, এরা সবাই এই যুগের রাজাকার। এ যুগের রাজাকারদের পরিণতি ওই যুগের রাজাকারদের মতোই হবে! ঘৃণা, ধিক্কার আর ক্রোধ এদের প্রতি! রাজাকারের দল তোরা, এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ছাড়!'

পরদিন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সরকারী সন্ত্রাসী বাহিনী যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে। অপরদিকে খালি হাতে সাধারণ ছাত্র-জনতা কাতারে কাতারে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে। ইসলামী ছাত্রশিবির সমন্বয়কদের সেফ হোমে রাখাসহ নিত্য নতুন ও অভিনব কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলনকে জাগিয়ে রাখে।

মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচির আহ্বান করা হয়। দেশবাসী হাসিনা খেদাও আন্দোলনে অতীতের যেকোনো সময়ের আন্দোলনের চেয়েও দুর্বার গতিতে নিজ নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

শহীদ কারিমুল ইসলাম অদম্য সাহস নিয়ে ৫ আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হন। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়, ২ মাস চিকিৎসাধীন থাকার পরে ১ অক্টোবরে ইন্তেকাল করেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ কারিমুল ইসলাম পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি আড়তে লেবু বিক্রি করতেন। তার গ্রামে ভিটে বাড়ি সংক্রান্ত সামান্য জায়গা আছে। সেখানে তার বাবা-মা থাকেন। কোন আয় উপার্জন না থাকায় তারা বর্তমানে খুব অভাবে দিন যাপন করছেন। শহীদের স্ত্রী বর্তমানে ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তিনি তার বাবার বাড়িতে আছেন। তিনিও খুব আর্থিক সংকটে দিন অতিবাহিত করছেন।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: কারিমুল ইসলাম
জন্ম	: ১৫/০৫/২০০২
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসা -আড়তে লেবু বিক্রি করতেন
পিতা	: মো: শাহাব উদ্দিন
মাতা	: সায়েদা বেগম
স্ত্রী	: কোহিনুর আক্তার ,বয়স: ১৯
সন্তান	: ৯ মাসের গর্ভবতী
ভাই-বোন	: ৩ ভাই
স্থায়ী ঠিকানা	: পশ্চিম রুহিতনসী, পশ্চিম রুহিতনসী, লাখাই, লাখাই, হবিগঞ্জ, সিলেট
বর্তমান ঠিকানা	: পশ্চিম রুহিতনসী, পশ্চিম রুহিতনসী, লাখাই, লাখাই, হবিগঞ্জ, সিলেট
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে।
আক্রমণকারী	: পুলিশের গুলিতে
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট দুপুর ১২ টা
আঘাতের ধরন	: বুক ও হাতে ৪ টা গুলি লাগে।
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১ অক্টোবর ২০২৪ সকাল ৫ টা, ঢাকা মেডিকেল
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম
প্রস্তাবনা	: ১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা
	: ২. পুনর্বাসন করা

শহীদ আব্দুল্লাহ বিন জাহিদ

ক্রমিক: ৭৫১
আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৪৮

শহীদ পরিচিতি

আব্দুল্লাহ বিন জাহিদ ২০০৮ সালে ১ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন । তার বাবার নাম জাহিদুল ইসলাম এবং মায়ের নাম ফাতেমাতুজ জোহুরা। বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ বিন জাহিদ এইচ এসসি ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার ছোট ভাই ১৪ বছর বয়সী মাহমুদুল্লাহ বিন জিসান ক্যানসারে আক্রান্ত। আব্দুল্লাহ বিন জাহিদ মা ও ছোট ভাইসহ আশকোনায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

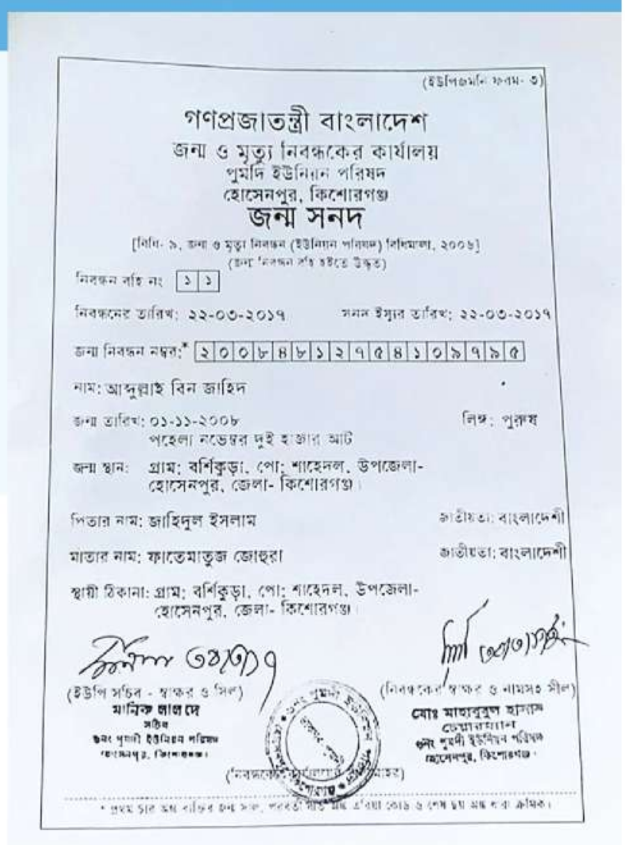
(ইউপিফর্মানি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
পুমদি ইউনিয়ন পরিষদ
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ
জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং: ১ ১

নিবন্ধনের তারিখ: ২২-০৩-২০১৭ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২২-০৩-২০১৭

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৮৪৮১২৭৫৪১০৯৭৯৫

নাম: আব্দুল্লাহ বিন জাহিদ

জন্ম তারিখ: ০১-১১-২০০৮ লিঙ্গ: পুরুষ
পহেলা নভেম্বর দুই হাজার আট

জন্ম স্থান: গ্রাম: বর্শিকুড়া, পো: শাহেদল, উপজেলা- হোসেনপুর, জেলা- কিশোরগঞ্জ।

পিতার নাম: জাহিদুল ইসলাম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: ফাতেমাতুজ জোহুরা জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: বর্শিকুড়া, পো: শাহেদল, উপজেলা- হোসেনপুর, জেলা- কিশোরগঞ্জ।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল)
মানিক লাল দে
সচিব

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
মোঃ মাহাবুবুল হাসান
চেয়ারম্যান

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

আবদুল্লাহ শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট সাবেক অবৈধ ও খুনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ আনন্দমিছিলে যাওয়ার জন্য মায়ের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। মা অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে মাগরিবের আজানের পরপরই যাতে বাসায় ফিরে আসে, সে শর্ত দিয়েছিলেন মা। সন্ধ্যা ৭টা ৩৬ মিনিটে তার মা ফাতেমা ছেলেকে ফোন দিয়ে ১৭ সেকেন্ড কথা বলে সন্ধ্যা হয়েছে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলে জানিয়েছিলেন, আর আধা ঘণ্টার মধ্যেই বাসায় ফিরবে। তবে রাত ৮টা ১০ মিনিটে অপরিচিত এক নম্বর থেকে ফোন করে একজন জানান, আবদুল্লাহ গুলিতে আহত হয়েছে। দ্রুত উত্তরার মা ও শিশু হাসপাতালে আসতে হবে। ফাতেমা হাসপাতালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আরও তিনবার ওই মুঠোফোন থেকে ফোন আসে। বলা হয়, দ্রুত না এলে আবদুল্লাহকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রায় ৯টার দিকে ফাতেমা যখন হাসপাতালে পৌঁছান, তখন দেখেন, ছেলের নিথর দেহের দুই পায়ের বুড়ো আঙুল সাদা গজ দিয়ে বেঁধে রাখা। মা জানান, উত্তরায় এপিবিএন সদর দপ্তরের উল্টো পাশে আবদুল্লাহ গলায় ও পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়। পিঠে যে গুলি লেগেছিল, তা আর শরীর থেকে বের করা যায়নি। ৫ আগস্ট রাতেই কিশোরগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে আবদুল্লাহকে দাফন করা হয়।

পরিবারের বক্তব্য

বড় ছেলে গুলিতে মারা যাওয়ার পর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছেলের মৃত্যুর জন্য মাকে দায়ী করেছেন। মা হয়ে তিনি কেন ছেলেকে আনন্দমিছিলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ফাতেমা বলেন, এই ছেলে মারা যাওয়ার পর আমার ৮০ ভাগ জীবনই অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। ছোট ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। ছোট ছেলের চিকিৎসার জন্য আমাকে মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে হবে, এ ছাড়া তো আর উপায় নেই। এই ক্যানসারের ভালো চিকিৎসা হয় সিঙ্গাপুরে। ছেলের হত্যাকারীদের ন্যায়বিচার চাওয়ার পাশাপাশি বর্তমান সরকার আমার ছেলেটার চিকিৎসায় যাতে একটু সহায়তা করে, সেটাই আমার চাওয়া।

এর আগে ৪ আগস্ট আবদুল্লাহ প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার কথা বলে আজমপুরে আন্দোলনে চলে যায়। ফোন করে বাসায় আসতে বললে ছেলে জানায় ঝামেলার জন্য আসতে পারছে না। বাধ্য হয়ে ফাতেমা তাঁর বড় ভাইকে ফোন করে ছেলের কথা জানালে বড় ভাই কৌশলে এক অফিসের ঠিকানায় কিছু জরুরি কাজের কথা বলে আবদুল্লাহকে যেতে বলেন। পরে রাতে বড় ভাই সেই অফিস থেকে আবদুল্লাহকে নিয়ে বাসায় ফেরেন। এর আগেও আন্দোলনে গিয়ে চোখের সামনে আবদুল্লাহ একজনকে গুলি লেগে মারা যেতে দেখেছে। নিজে কাঁদানে গ্যাস এবং পুলিশের লাঠিপেটা খেয়েছে।

ফাতেমা গুলি লাগার পর ছেলের অবস্থার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'হাসপাতাল থেকে যে ডাক্তার ফোন দিয়েছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন আবদুল্লাহ নিজেই তার নাম বলেছিল। বারবার নাকি বলেছিল, আমার আম্মুকে দ্রুত আসতে বলেন। আম্মু এলেই আমি ভালো হয়ে যাব। তবে এ কথাগুলো নাকি সে অনেক কষ্টে বলেছিল। আর তারপরই সে মারা যায়। আর যে ছেলে আবদুল্লাহকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, আবদুল্লাহর অবস্থা দেখে ওই ছেলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আব্দুল্লাহ বিন জাহিদের ইন্তেকালের এক সাপ্তাহ পরেই তার একমাত্র ছোট ভাইয়ের ক্যান্সার ধরা পড়ে ,তার বাবা- মায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছিল অনেক আগে। বর্তমানে ছোট ভাইকে নিয়ে শহিদের মা হাসপাতালে ক্যামো দিচ্ছেন, তাদের কোন আয়-উপার্জন নেই বর্তমানে পরিবারটি অসহায় অবস্থায় মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন।

নিউজ লিংক

https://www.prothomalo.com/bangladesh/f5hvbvrk0l
https://www.jugantor.com/capital/876656
https://www.facebook.com/share/p/14mb3gtjDk/?mibextid=wwXIfr

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: আব্দুল্লাহ বিন জাহিদ
জন্ম	: ০১/১১/২০০৮
পেশা	: ছাত্র HSC ২য় বর্ষ -ক্যান্টনমেন্ট রমিজুদউদ্দিন কলেজ
পিতা	: জাহিদুল ইসলাম
মাতা	: ফাতেমাতুজ জোহুরা
ভাই-বোন	: ১ ভাই
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বর্শিকুড়া, পো: শাহেদুল, উপজেলা: হোসেনপুর, জেলা: কিশোরগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বর্শিকুড়া, পো: শাহেদুল, উপজেলা: হোসেনপুর, জেলা: কিশোরগঞ্জ
ঘটনার স্থান	: উত্তরা-বিমানবন্দর
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট রাত ৮ টা
আঘাতের ধরন	: গলায় এবং পিঠের পিছনে গুলি লাগে
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট, রাত ৮.৩০, উত্তরা মহিলা মেডিকেল কলেজ
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম

প্রস্তাবনা

১. শহীদের ছোট ভাইয়ের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহন

২.পূনর্বাসন করা ও মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: আকাশ

ক্রমিক: ৭৫২

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৪৯

শহীদ পরিচিতি

মো: আকাশ পেশায় ছিলেন রিকশা চালক। ৩ সন্তান নিয়ে ঢাকা উত্তরার বাউনিয়ায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। ৫ আগস্ট রিকশার সরাঞ্জাম কিনে ফেরার সময় মাগরিবের আগে আজমপুর ওভার ব্রিজের নিচে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আশ্রয় থেকে বের হয়ে এসে নতুন দেশ বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যে মুজিব ও তার দলের দুর্নীতি ও অবিচারের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। মানুষ না খেতে পেয়ে কোলের সন্তানকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। স্বৈরাচারী মুজিব ও তার নিষ্ঠুর রক্ষী বাহিনীকে পরাজিত করা ছিল কল্পনার বাইরের কাজ। এই অসাধ্য সাধন করতে এগিয়ে আসেন সেনাবাহিনীর কিছু দেশপ্রেমিক অফিসার। মুজিব ও তার খুনি বাহিনী পরাজিত হলে শেখ হাসিনা ও তার বোন রেহানা ভারতে আশ্রয় নেন। সেখানে তারা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেন। দেশপ্রেমিক ও শাসক মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে তুলে ধরতে রাত-দিন পরিশ্রম করেন। তিনি মুজিব কন্যাদের দেশে ফিরিয়ে আনেন। দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। প্রকৃত হত্যাকারী সম্পর্কে দেশবাসী আজও জানে না। ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশকে ভারতের তাবেদার রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলে। ইসলামপন্থীদের নির্মূল করে। প্রতিবাদকারীদের জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে খুন করে। তাদের ১৬ বছরের শাসন পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্ট সময় হিসেবে স্থান লাভ করে। ছাত্র-জনতার একাংশ এই ঘাতক ও দেশবিরোধী অবৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করে। হাসিনার নির্দেশ ছিল যেকোনো আন্দোলন দমাতে প্রয়োজনে লাশ ফেলে দিতে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের কতিপয় জানবাজ নেতা-কর্মী। তারা সাধারণ ছাত্রদের ব্যানারে বিভিন্ন দাবি উপস্থাপন করতে থাকে এবং ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি দিয়ে দেশবাসীকে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানায়। ইন্টারনেট বন্ধ এবং কারফিউ চলাকালে সমন্বয়কদের রক্ষার পাশাপাশি অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের অপকর্ম বিশ্ব মিডিয়ায় তুলে ধরে নিয়মিতভাবে।

এসম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত নিউজ চ্যানেল আল জাজিরার কর্মকর্তা জুলকারনাইন সায়ের তার ফেইসবুক আইডিতে চার পর্বে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে-

পার্ট ১

ছাত্র আন্দোলন "স্টুডেন্টস অ্যাগেইনস্ট ডিসক্রিমিনেশন (ঝঅউ)" এবং "শিবির" এর মধ্যে জুলাই বিপ্লব এবং স্বৈরশাসক পতনের অবদানের নিয়ে চলমান বাদানুবাদ দেখে আমি ও আমার সঙ্গীরা সত্যিটা স্পষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি তখন অন্য মহাদেশে থাকতাম এবং আন্দোলনের সময় হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে ছিলাম, তাই মাঠ পর্যায়ের সমন্বয়ের দায়িত্ব পড়ে আমার দীর্ঘদিনের আস্থাভাজন এক বন্ধুর উপর, যিনি বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক।

ঘটনার শুরু হয় ২৬ জুলাই রাত ১০টা ১০ মিনিটে। আমার সেই আস্থাভাজন বন্ধুর কাছে একটি বার্তা আসে, যেখানে তাকে চারজন আন্দোলনকারীর জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়, যারা হাসপাতালে থেকে পালিয়ে পুলিশের নজরদারি এড়ানোর চেষ্টা করছিল। তারা তখন ইউএস এম্বেসির কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্সে আটকে ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে ফোন করে এবং সেই মুহূর্ত থেকে আমি সরাসরি এই ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি। আমি তাকে আমাদের ইউএস এম্বেসির পরিচিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে বলি। সে কর্মকর্তাকে মনে করিয়ে দেয় যে এর আগে ইমরান আহমেদ ভূঁইয়ার ক্ষেত্রেও ইউএস এম্বেসি আশ্রয় দিয়েছিল, যিনি সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধী বিবৃতি দেওয়ার কারণে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। তবে এবার কর্মকর্তাটি জানান যে, বিভিন্ন কারণে এটি সম্ভব নয়, যার মধ্যে একটি হলো সেই সময় দূতাবাসে কোনো রাষ্ট্রদূত ছিল না এবং চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হাসিনা সরকারের রোষানলে পড়তে চাননি। তবে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ করার আশ্বাস দেন।

এদিকে, আমার আস্থাভাজন বন্ধু তার অন্যান্য যোগাযোগসূত্রে চেষ্টা করে কিন্তু কোনো ফল মেলে না। শেষপর্যন্ত যদি কিছুই না হয়, তাহলে সে নিজেই আন্দোলনকারীদের তার বাসায় আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু প্রায় ২০ মিনিট পর ইউএস এম্বেসির কর্মকর্তার ফোন আসে। তিনি জানান, আন্দোলনকারীরা গুলশানের একটি বিদেশি সংস্থার অফিসে আশ্রয় নিতে পারবে এবং সেই অফিসের এক শীর্ষ কর্মকর্তা তাদের গ্রহণ করবেন। খবরটি পাওয়ার পর, আমি সেই ছাত্রদের একজন, সালমানের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করি। পরবর্তীতে জানা যায়, সে আসলে শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি সাদিক কায়েম। আমি ঢাকার বিভিন্ন সূত্রের সাথে কথা বলে গুলশান-২ এ নিরাপদে পৌঁছানোর রুট ঠিক করি। চারজন ছাত্রকে দুটি রিকশায় বিভক্ত করে পাঠানো হয় এবং রাত ১১টার মধ্যে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যায়। তবে, ২৮ জুলাই সকাল ৯টার মধ্যে তাদের সেই স্থান ছাড়তে হবে, কারণ তখন অফিস খোলার সময়।

পরের দিন, ২৭ জুলাই, শহিদুল আলম ভাই ছাত্রদের সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সন্ধ্যায় তাদের নিজের আশ্রয়ে নেন। এসময় আমরা ভেবেছিলাম তারা নিরাপদেই আছে। এদিকে, সালমান আমাকে ফোন করে জানতে চায়, তারা কি আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে আন্দোলন নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারবে? আমি আমার আস্থাভাজন বন্ধুকে সালমানের পরিকল্পনা জানার জন্য বলি। সে শফিকুল আলম (তৎকালীন এএফপি ব্যুরো প্রধান) এবং মানবাধিকার কর্মী রেজাউর রহমান লেনিনের সাথে কথা বলে। তারা জানায়, ইএমকে সেন্টার সম্ভব নয়, কারণ সব বুকিংয়ের জন্য নিরাপত্তা অনুমোদন প্রয়োজন, আর দ্রিক গ্যালারি ১০ আগস্টের

আগে খোলা হবে না। তারা এই পরিকল্পনা বাতিল করার পরামর্শ দেয় এবং তা সালমানকে জানানো হয়। ফলে, প্রদর্শনীর ধারণা তখনই বাদ দেওয়া হয়।

২৮ জুলাই দুপুর ১২:০৯ মিনিটে সালমান আমার আস্থাভাজন বন্ধুকে একটি বার্তা পাঠায়, যেখানে আব্দুল কাদেরের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার অনুরোধ করা হয়। আমি তখন ঢাকায় আমার এক পরিচিতের সাথে যোগাযোগ করি, যিনি একটি দূতাবাসে কাজ করেন। তিনি কাদেরকে গুলশানের নিজের বাসায় আশ্রয় দিতে সম্মত হন। তবে অফিস শেষে বিকাল ৪টার পরেই তিনি তাকে নিতে পারবেন। কাদের তখন শনির আখড়ায় ছিল, তাই সরাসরি গুলশানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে কাদেরকে মাঝপথে আসতে বলা হয়। এই পর্যায়ে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান আন্দোলনের খবরাখবর সরাসরি মনিটর করা শুরু করেন, মির হেলাল (বিএনপির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক)-এর মাধ্যমে, যিনি কাদেরের আশ্রয়দাতার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন।

সেই রাতে আমরা জানতে পারি যে ঝঅউ-এর ছয়জন সমন্বয়ক– নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আবু বকর মজুমদার এবং নুসরাত তাবাসসুম-ডিবি অফিস থেকে আন্দোলন বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। আমরা অবাক হয়ে যাই। তবে রাত ৯:৫০ মিনিটে সালমান আমাদের জানায় যে আন্দোলন চলবে এবং কাদের, হান্নান, রিফাত ও মাহিন নেতৃত্ব দেবে। আমি পরামর্শ দেই, চারজন নতুন নেতা যেখানে আছেন সেখান থেকেই একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড করতে। সালমান সেই বার্তার খসড়া পাঠায়, যা আমি সম্পাদনা করি এবং আমার আস্থাভাজন বন্ধু সেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে। রাত ১১:০৪ মিনিটের মধ্যে বার্তাটি সালমানের কাছে পাঠানো হয়। তবে, বার্তাটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। রাত ১১:৩৫ মিনিটে সালমান আমাদের জানায় যে, তাদের থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এখনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা কি এখনই শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করবে নাকি আগের নয় দফা দাবিতেই অটল থাকবে। শেষে তারা নয় দফাতেই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক রাত ১২টায় ঝঅউ-এর লেটারহেডে চূড়ান্ত বার্তাটি প্রকাশ করা হয়। কাদের বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় ভিডিও বার্তা রেকর্ড করে এবং আমি সেই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করি। বাকি তিনজনও তাদের ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে।

পরের দিন, ২৯ জুলাই, বিকাল ৪:৫০ মিনিটে সালমান আবার ফোন করে এবং হান্নান, রিফাত, মাহিন ও মেহেদীর (যিনি পরে চট্টগ্রাম ছাত্রদলের জাহাঙ্গীরনগর ইউনিটের আব্দুল গফ্ফার জিসান বলে পরিচিত হন) জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের অনুরোধ করে। তারা তখন গুলশানের নর্থ এন্ড কফি রোস্টার্স-এ বসে ছিল এবং দ্রুতই তাদের নিরাপদ স্থানে যেতে হতো, কারণ এক ঘণ্টার মধ্যে কারফিউ শুরু হবে। আমার আস্থাভাজন বন্ধু ভৎবহবঃরপভাবে তার পরিচিতদের ফোন করতে থাকে, কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। শেষ পর্যন্ত তার দুই বন্ধু ফাহিম আহমেদ এবং আন্দালীব চৌধুরী তাদের বনানীর বাসায় আশ্রয় দিতে রাজি হন। ছেলেরা তখন নর্থ এন্ড থেকে বেরিয়ে বনানীর এক কোচিং সেন্টারে লুকিয়ে ছিল। আন্দালীব তাদের সেখান থেকে নিয়ে আসে। আন্দালীব একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক এবং ১৮ জুলাই থেকে কোটা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ছেলেরা তার আশ্রয়ে নিরাপদ বোধ করে। তবে, আমার আস্থাভাজন বন্ধু জানায় যে, ফাহিমের

পেশাগত জীবনের ঝুঁকি এড়াতে পরদিন সকালে ছেলেদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর আবার শুরু হয় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ। কাদেরের আশ্রয়দাতাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে তার বাসায় আর জায়গা ছিল না। তবে তিনি পুরান ঢাকায় একটি নতুন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ছেলেদের বনানী থেকে পুরান ঢাকায় নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, তাই রেজার সহায়তা নেওয়া হয় এবং তিনি সম্মত হন। পাশাপাশি, আমি বিকল্প আশ্রয় হিসেবে মিরপুর ডিওএইচএস-এ একটি বাসার ব্যবস্থা করি ও আমার আস্থাভাজন বন্ধুর কাছে সেই ঠিকানা পাঠাই।

পার্ট ২

৩০ জুলাই সকালে রেজা ফাহিম এবং আন্দালীবের বাসায় (বনানী) পৌঁছায় ছেলেদের পরবর্তী নিরাপদ আশ্রয়ে (পুরান ঢাকা) সরানোর জন্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছে রেজা দেখতে পায়, লোকেশনটি (যা আদালতের খুব কাছেই) মোটেও নিরাপদ নয়। ছেলেরা থাকার জায়গার অবস্থা দেখে অখুশি হয় এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা ফাহিম ও আন্দালীবের বাসায় ফিরে যেতে চায়, যদিও আমার আত্মীয় (পড়হভরফধহঃব) এর তীব্র বিরোধিতা ছিল। তবুও ছেলেরা আন্দালীবকে ফোন করে এবং আন্দালীবও তাদের ফেরত আসতে বলে। কিন্তু আমার আত্মীয় এ বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেয়।

সে ওহাইদ আলমকে ফোন করে জানতে চায় তার দেওয়া আশ্রয়ের প্রস্তাব এখনো প্রযোজ্য কিনা এবং ওহাইদ খুব উদারভাবে রাজি হয়। রেজার কাছে ওহাইদের বিস্তারিত তথ্য পাঠানো হয় এবং রেজা ছেলেদের ওহাইদের আশ্রয়ে পৌঁছে দেয়। এই ফ্ল্যাটটি ওহাইদ আলমের বাইয়িং হাউসের হেডকোয়ার্টার। এটি খুবই নিরাপদ এবং ছেলেদের মান অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা ছিল, যা পুরান ঢাকার ঠিকানায় পাওয়া যায়নি। রেজা ছেলেদের ফোনে প্রিমিয়াম ভিপিএন ডাউনলোড করে দেয় আমার আত্মীয়ের আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে।

এদিকে রেজার সাথে যোগাযোগ করার সময় দুপুর ২:১৩ মিনিটে সালমান আমার আত্মীয়কে একটি বার্তা পাঠায়, পরের দিনের জন্য কী কর্মসূচি ঘোষণা করা যায় তা জানতে। ৩:২৪ মিনিটে সালমান দেশব্যাপী আদালতের সামনে বিক্ষোভ করার প্রস্তাব দেয়। আমার আত্মীয় এই ধারণাটিকে পছন্দ করে এবং পরামর্শ দেয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাইরের এলাকায়ও বিক্ষোভ করার জন্য, কারণ তখন ক্যাম্পাসগুলো ব্লক করা ছিল। ৪:৫৪ মিনিটে সালমান হান্নানের সাথে কথা বলতে বলে যেন সে এই কর্মসূচি ঝঅউ-এর ফেসবুক পেজ থেকে ঘোষণা করে। হান্নান লিফলেট বিতরণের কথা ভাবছিল, কিন্তু আমার আত্মীয়ের সাথে কথা বলার পর সে আদালতের সামনে বিক্ষোভের পরিকল্পনায় রাজি হয়। ৫:৩২ মিনিটে সালমান বাংলা কমিউনিকেশন পাঠায় ভেটিংয়ের জন্য এবং ইংরেজি অনুবাদ করতে বলে। সন্ধ্যার মধ্যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এদিকে হান্নান আমার আত্মীয়কে ছেলেদের জন্য নতুন পোশাক ও লুঙ্গি কিনে দিতে বলে এবং তাদের সাইজ পাঠায়। আমার আত্মীয় তার এক সহকর্মীকে টাকা দেয়, যে মিরপুরে থাকে, এবং তাকে পোশাক কিনে মিরপুর ডিওএইচএস-এ পৌঁছে দিতে বলে। তবে তখন কারফিউ চলছিল, ফলে সব দোকান বন্ধ ছিল। তার সহকর্মী এক বন্ধুর মাধ্যমে দোকানদারকে রাজি করিয়ে দোকান খোলায় এবং পরদিন সকালে ওহাইদ আলম সেসব পোশাক সংগ্রহ করে নেয়।

৩১ জুলাই দুপুর ১:৩১ মিনিটে সালমান জানায়, সেদিনের কর্মসূচিতে বিশাল সাড়া পাওয়া গেছে। এরপর সে পরদিনের জন্য "সফট"কর্মসূচি প্রস্তাব করে, যেমন লিফলেট বিতরণ। আমার আত্মীয় এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কারণ এটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং জেন-জেড হিসেবে তাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত। সেই সাথে আন্দোলনের গতি নষ্ট হবে বলেও সে সতর্ক করে। পরিবর্তে, সে জাতিসংঘের অফিসের সামনে বিক্ষোভ করার প্রস্তাব দেয়, যাতে তারা হত্যাযজ্ঞের স্বাধীন তদন্তের দাবি জানাতে পারে। কিন্তু সালমান জানায়, বাকিরা নরম কর্মসূচির পক্ষে এবং জাতিসংঘ অফিসের সামনে বিক্ষোভ একদিন পরে করা যেতে পারে। কিন্তু সেই দিনটি ছিল সপ্তাহান্ত, ফলে তা ফলপ্রসূ হবে না। বৃহস্পতিবারই এ কর্মসূচি পালন করতে হবে বলে সে জোর দেয়।

এই সময় আমার আত্মীয় কাদেরের আশ্রয়দাতার কাছ থেকে একটি ফোন পায়। তিনি জানান, নাহিদের "গুরু" আন্দোলনকে মন্থর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খোলার আন্দোলনে রূপান্তর করার পরামর্শ দিয়েছে। এই গুরু হলো মাহফুজ আবদুল্লাহ, এখন মাহফুজ আলম নামে পরিচিত। আমার আত্মীয় শফিকুল আলমকে ফোন করে মাহফুজ সম্পর্কে জানতে চায়। শফিকুল আলম জানায়, সে মাহফুজকে ভালোভাবে চেনে এবং দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় চাকরি পাইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মাহফুজ সেখানে টিকতে

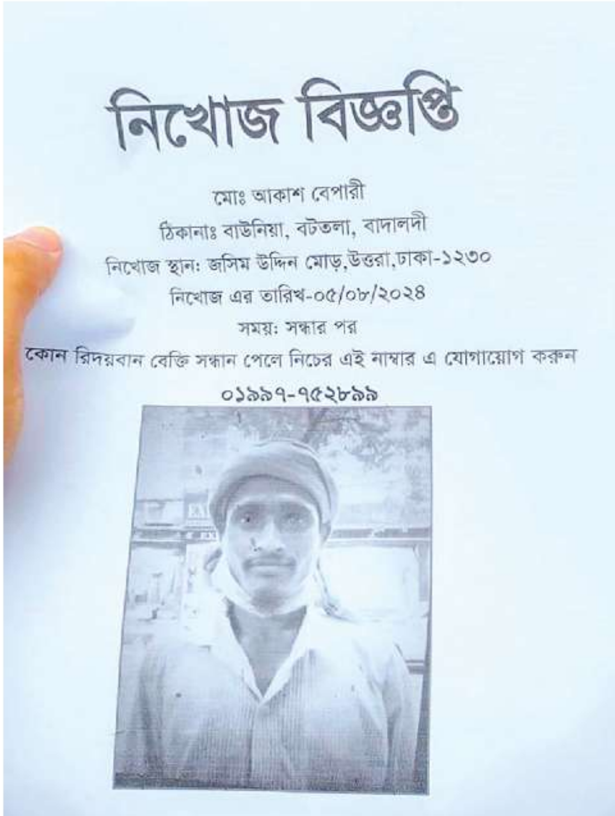

পারেনি। আমার আত্মীয় শফিকুলকে বলে মাহফুজকে আন্দোলনের পথে বাধা হতে না দেওয়ার জন্য সাবধান করতে। তিন ঘণ্টা পর শফিকুল জানায়, মাহফুজকে সতর্ক করা হয়েছে।

আমার আত্মীয় সালমানকেও মাহফুজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং আন্দোলন মন্থর না করার নির্দেশ দেয়। সালমান জানায়, আন্দোলনে অনেক স্টেকহোল্ডার রয়েছে এবং সবার মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছানো কঠিন। কিন্তু সে যতক্ষণ বেঁচে আছে, আন্দোলন চলবে। সে জানায়, ছাত্রদের নয় দফা দাবি সে-ই লিখেছে এবং ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের সময় নিজে গিয়ে মিডিয়াগুলোতে তা দিয়েছে। তবে ছেলেরা ক্লান্ত, তাই পরদিনের কর্মসূচি সফট রাখতেই হবে। সে একটি আকর্ষণীয় টাইটেল এবং হ্যাশট্যাগ চায়। আমার আত্মীয় ফাহিমকে জিজ্ঞেস করে এবং ফাহিম কিছু হ্যাশট্যাগ ও টাইটেল দেয়।

পরদিনের জন্য 'সফট' কর্মসূচি নির্ধারিত হওয়ায় আমার আত্মীয় রাত ৯টায় শহীদদের স্মরণে দেশব্যাপী ক্যান্ডেল লাইট ভিজিল করার প্রস্তাব দেয়, যা শক্তিশালী বার্তা দেবে। সালমানও এ ধারণা পছন্দ করে। কিন্তু রাত ৮:৫৬ মিনিটে সালমান জানায়, পরদিনের কর্মসূচি হবে 'রিমেম্বারিং দ্য হিরোস', যেখানে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে–ক্যান্ডেল লাইট ভিজিল নয়। শনিবারের জন্য 'মার্চ ফর ক্যাম্পাস'কর্মসূচি ঠিক করা হয়, যাতে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলার দাবি জানানো হয়।

আমার আত্মীয় কাদেরের আশ্রয়দাতাকে ফোন করে, যে এই পরিবর্তনে খুবই বিরক্ত। আমার আত্মীয় সালমানকে তিরস্কার করে আন্দোলনের গতি কমানোর জন্য। সে বলে, যদি আন্দোলন কেবল ক্যাম্পাস-কেন্দ্রিক হয়, তবে এটি থেমে যাবে। জনসমর্থন কমে যাবে এবং শেখ হাসিনা পুনরায় সংগঠিত হয়ে আন্দোলনকারীদের দমন করবে। সে জানায়, তার বন্ধুরা তাদের জীবন ও ক্যারিয়ারকে বিপন্ন করছে না শুধু কোটা পাওয়ার জন্য। রাত ১১:১৫ মিনিটে সালমান তাকে অনুরোধ করে একটি জুম মিটিংয়ে ছাত্রনেতাদের এসব বোঝানোর জন্য। সে রাজি হয়, কিন্তু সেই মিটিং আর হয় না।

পার্ট ৩

১ আগস্ট সকাল ১১:৩৬ মিনিটে সালমান আমার আত্মীয়কে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভের ছবি পাঠায়। সে ফাহিমের কাছ থেকে প্রস্তাবিত হ্যাশট্যাগগুলো সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করার অনুরোধও করে, যেন সেগুলো ছাত্র গ্রুপগুলোতে শেয়ার করা যায়। বিকেল ৪:২৩ মিনিটে আমার আত্মীয় সালমানকে আবারও বকাঝকা করে কারণ **"হিরোদের স্মরণ"** কর্মসূচিকে ঘিরে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ হয়েছিল। সে সালমানকে বলে যে, যতক্ষণ না তারা তাদের স্বার্থপর নয়-দফা দাবির জন্য চাপ দেবে, ততক্ষণ রক্তপাত চলতে থাকবে। এ ছাড়াও সে লেখে, "তারা খুনির কাছ থেকে ন্যায়বিচার দাবি করছে, এটা কতটা অযৌক্তিক!" সে আরও বলে, "ওরা তোমাদের খুব সহজেই খেলাচ্ছে।" বিকেল ৪:৪৫ মিনিটে সালমান আমার আত্মীয়কে ফোন করে অনুরোধ করে যেন সে এখনই তাদের ত্যাগ না করে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে এখান থেকে তার নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

প্রায় ৫টার দিকে হান্নান আমার আত্মীয়কে ফোন করে তাদের জন্য গাড়ি এবং আরেকটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে। কেন? কারণ পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র হান্নানকে খুঁজছিল – রিফাত, মাহিন বা কাদেরকে নয় – এবং সে মিরপুর ডিওএইচএস-এর

ফ্ল্যাটে নিরাপদ বোধ করছিল না। আমার আত্মীয় তাকে জিজ্ঞেস করে, সে কি তার অবস্থান কারও সাথে শেয়ার করেছে? হান্নান উত্তর দেয়, "না"। তখন আমার আত্মীয় তাকে বলে, বাংলাদেশের মধ্যে এর চেয়ে নিরাপদ কোনো জায়গা নেই।

এর কয়েক মিনিটের মধ্যে রেজা ফোন করে জানায় যে, হান্নান তাকেও একই অনুরোধ করেছে। মূলত, তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল কারণ তারা ফ্ল্যাটের চাবি হারিয়ে ফেলেছিল এবং ওয়াহিদ আলমের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিল না। কিন্তু পরে রেজা আবার ফোন করে জানায় যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, চাবি তাদের বেডসাইড ড্রয়ারে ছিল এবং ওয়াহিদ আলমকে ফোনে পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ওয়াহিদ আলম ছিলেন দায়িত্বশীল ও উদার স্বাগতিক। তিনি ছেলেদের জন্য দুই সপ্তাহের বাজার করে রেখেছিলেন, তাদের নিজ অফিসে থাকা নতুন পোশাক ব্যবহার করতে বলেছিলেন এবং ক্লিনারকে আসতে মানা করেছিলেন যাতে ছেলেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

সন্ধ্যায় ছয়জন সমন্বয়ককে ডিবি হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং হাসনাত ও সারজিস ফেসবুকে অস্পষ্ট পোস্ট দেয়, যা আমার আত্মীয়কে বিরক্ত করে। সে বিষয়টি তার সহকর্মীর সাথে আলোচনা করে, যিনি হান্নান ও তার সঙ্গীদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহকর্মীটি বলে যে এখন হাসিনার পদত্যাগ দাবি করার সঠিক সময় নয়। এরপর সে শফিকুল আলামের সাথে আলোচনা করে, যিনি বলেন; ছাত্রনেতারা এখন মুক্ত, এবং তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে তিনি এটাও বলেন, হাসিনা যেকোনো সময় পড়ে যাবে – এ থেকে তার আর কোনো রক্ষা নেই। ফাহিমও হতাশ হয়ে জানায় যে এখনো কেন হাসিনার পদত্যাগের দাবি ওঠেনি। কাদেরের স্বাগতিকও সম্মত হয় যে একদফা দাবি তোলা প্রয়োজন।

রাত ১০:২৪ মিনিটে সালমান আমার আত্মীয়কে রামপুরার ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এক মোমবাতি প্রজ্বালন অনুষ্ঠানের ছবি পাঠায়। এরপর নারায়ণগঞ্জে পুলিশের হামলার খবরের একটি লিংক পাঠায়। এরপর সে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মোমবাতি প্রজ্বালন অনুষ্ঠানের ছবি পাঠাতে থাকে।

২ আগস্ট দুপুর ১২:৫০ মিনিটে আমার আত্মীয় সালমানকে মেসেজ পাঠায়: "তারা যদি হাসিনার পদত্যাগ দাবি না করে, তবে এটা আত্মঘাতী মিশন হবে।" সালমান সাথে সাথে উত্তর দেয় যে এখন তারা নয়-দফা দাবিতে আছে, তবে দিনের শেষে এক দফা দাবি নিয়ে সভা হবে। আমার আত্মীয় আবারও বলে, "এক দফা দাবি তোলাটা দ্রুত করতে হবে কারণ হাসিনার সমর্থকেরা ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করেছে যে, বাংলাদেশের কোনো বিকল্প নেতা নেই।" সালমান উত্তর দেয় যে সে চেষ্টা করছে, তবে অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো আগে সমাধান করতে হবে – এবং সারজিস ও হাসনাত "দালাল"। তাদের শেষবারের জন্য সতর্ক করা হয়েছে এবং যদি তারা বাড়াবাড়ি করে, তবে তাদের ঝঅউ থেকে বের করে দেওয়া হবে।

বিকেল ২:০৮ মিনিটে সালমান হান্নানের পোস্ট করা একটি ভিডিওর লিংক পাঠায় যেখানে ছাত্রদের নয়-দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু আমার আত্মীয় উত্তর দেয়, "এটা খুব স্বার্থপর ভিডিও।" সে আরও লেখে, "ধরো হাসিনা তোমাদের নয়-দফা দাবি মেনে নিল, কিন্তু যারা ছাত্র নয়, তাদের মৃত্যু? তাদের জন্য ন্যায়বিচার চাইবে না? অনেক শিশু, পেশাজীবী মারা গেছে এবং অনেকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়েছে।" সালমান তাকে আশ্বস্ত করে যে, সে এই বিষয়গুলো তাদের মিটিংয়ে তুলবে।

বিকেল ২:৩৬ মিনিটে সালমান জানায়, সারজিস ও হাসনাত ঝঅউ-এর সেদিনের কর্মসূচি বাতিল করেছে এবং কাদের ও হান্নানের সাথে এক দফা দাবি নিয়ে কথা বলার জন্য অনুরোধ করে। সালমান আরও জানায়, আসিফ মাহমুদের জন্যও নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আমার আত্মীয় তাকে বলে, "এটি তখনই সম্ভব যদি তোমরা এক দফা দাবি তোল।" তবে কাদেরের স্বাগতিক জানান যে আসিফের পিছু চষধরহপষড়ঃযবং পুলিশ লেগে আছে। তাই আসিফকে অন্য কোনো আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া সবার জন্য বিপদ ডেকে আনবে।

এর মধ্যে ফাহিম মেসেজ করে: "আজ দুই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ দিন। দুই সপ্তাহ পার হলে পরিস্থিতি স্থির হতে শুরু করে। আজই সেই দিন। তারা হাসিনার পদত্যাগের দাবি তুলল না কেন?"

সন্ধ্যা ৪টার দিকে আমার আত্মীয় কাদেরের স্বাগতিকের বাসায় যায় এবং সেখান থেকে তারা আমাকে ফোন করে। আমরা সিদ্ধান্ত নিই, এক দফা দাবি আজকেই তুলতে হবে মাগরিবের নামাজের পর। কারণ তখন প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে। শফিকুল আলামও ফোন করে বলে, "এখনই সময়।" এরপর ফাহিমও মেসেজ করে বলে, "এখনই সময়।" তারা কাদের, হান্নান, মাহিন ও রিফাতকে আহ্বান জানায় এক দফা দাবি তোলার জন্য। সালমান জানায়, দাবি উঠলে সে মাঠে সমর্থন দেবে।

কিন্তু হান্নান আবার ফোন করে নতুন নতুন দাবি তোলে। এক পর্যায়ে তারা বলে, "আমাদের পরিবারকে দূতাবাসে সরিয়ে দাও, তারপর আমরা দাবি তুলবো।" কাদেরের স্বাগতিক তাদের বোঝায়, "এটা এখন সম্ভব নয়, তবে দাবি তোলার পর দূতাবাস তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবে।" তারা রাজি হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ফোন করে কমিউনিকেশনটির ভাষা নিয়ে আপত্তি জানায়। তারা চায় একটি রূপরেখা যেখানে হাসিনার পদত্যাগের পর রাষ্ট্র কিভাবে চলবে তা উল্লেখ থাকবে। শেষে আমরা একটি লাইন যোগ করি: "হাসিনার পদত্যাগের পর দেশ চলবে রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সিভিল সোসাইটি, সশস্ত্র বাহিনী এবং ছাত্রদের সমন্বয়ে।"

তবে এখানেও তারা চায় "ছাত্রদের" নামটি আগে রাখতে। রাত প্রায় ১১টা বেজে যায় এবং তখন আমাদের সবাই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। আমি সাফ জানিয়ে দেই: "এই ছেলেদের কোনো রকম জোর করা হয়নি। তবুও হান্নান মিথ্যা বলে বেড়ায় যে আমি নাকি তাদের হুমকি দিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই হাসিনাকে সরানো। অন্য কোনো লোভ বা স্বার্থ আমাদের ছিল না।"

"আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি – আমাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি, শুধু শান্তি এসেছে যে হাসিনা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী শেষ।"

পার্ট ৪

মজার বিষয় হলো, এসএডি পরের দিন, অর্থাৎ ৩ আগস্ট, বিকেল ৩টায় শহীদ মিনারে একটি প্রোগ্রামের ডাক দেয়। দুপুর ১:০৫ টায় হান্নান আমার আস্থাভাজনকে ফোন করে তাদের জন্য নাহিদের ব্যবস্থাপনায় আরেকটি নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে অনুমতি চায়। শহীদ মিনারে বিকেল ৩টায় নাহিদ হাসিনার পদত্যাগের দাবি তোলে। তখন আর কিছুই সধঃঃবৎবফ করছিল না, ঢাকা এবং অন্যান্য শহরের রাস্তাগুলো হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানে মুখরিত ছিল। আমরা পরে কাদেরের কাছ থেকে জানতে পারি যে নাহিদ, মাহফুজ, আসিফ এবং এসএডি সমন্বয়কারীরা একদফা দাবিতে যেতে চাননি। আমাদের আগের দিনের চাপের কারণেই তারা বাধ্য হয়। নাহিদ সব আলো নিজের দিকে টানতে চেয়েছিল–সে চায়নি কাদের, হান্নান, রিফাত এবং মাহিন হাসিনার পদত্যাগের ডাক দিয়ে সেই স্বীকৃতি পাক। কাদেরের জন্য এটা বিশেষভাবে মজার ছিল যে, হান্নান আগের দিন সন্ধ্যায় কাদের, রিফাত ও মাহিনকে সেই ডাক দিতে বাধা দিয়েছিল কারণ সে তার "নাহিদ ভাই"ছাড়া কিছু করতে চায়নি। কিন্তু সেই নাহিদ ভাই-ই পরের দিন শহীদ মিনারে হান্নান ছাড়া সেই ডাক দিল। এসএডি পরের দিন এক অসহযোগ আন্দোলনেরও ডাক দেয়, যা বিদেশি মিশনগুলো ভালোভাবে নেয়নি, যেমনটা আমার আস্থাভাজন তার সংযোগ থেকে জানতে পারে।

বিকেল ৭:৫৬ টায় সালমান আমার আস্থাভাজনকে এসএডি'র দাবি-দাওয়ার একটি তালিকা পাঠায় এবং তার মতামত চায়। আস্থাভাজন সালমানকে পরামর্শ দেয়, এসএডি যেন সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশে যায় এবং হাসিনার পদত্যাগ ছাড়া আর

কোনো দাবি না তোলে। এখনই আলাদা কোনো দাবি করলে তারা আত্মকেন্দ্রিক এবং ক্ষমতালোভী মনে হবে এবং জনগণ তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করবে। তাদের পুরো জীবন সামনে পড়ে আছে ক্ষমতায় আসার জন্য। হাসিনা চলে গেলে তারা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় এবং জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর রাজনীতিতে আসে। সালমান এতে সম্মতি জানায় এবং বলে যে তারা কোনো আলাদা দাবি তুলবে না। এরপর সালমান জিজ্ঞেস করে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত। আস্থাভাজন তাকে পরামর্শ দেয় গণভবন ও সকল মন্ত্রীদের বাসভবন ঘেরাও করার জন্য। সে আরও ব্যাখ্যা করে যে হাসিনা/আওয়ামী লীগ তখনও আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়ে যাচ্ছিল কারণ পশ্চিমা দেশগুলো এখনও তার পদত্যাগ বা স্বাধীন তদন্তের দাবি জানায়নি; তারা শুধু বলেছিল যেসব মৃত্যুর তদন্ত হওয়া উচিত এবং হাসিনাকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংলাপে বসতে হবে। এটা এমন যেন খুনিকে খুনের তদন্ত করতে বলা হচ্ছে। সালমান জানতে চায় কী করলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিবর্তন করা সম্ভব। আস্থাভাজন তখন বলে, শুধু হাসিনাকে সরানোর ওপর মনোযোগ দিতে হবে। রাত ৯:২১ টায় সালমান জানায় যে পরের দিন সকাল ১০টা থেকে শহরের ১২টি পয়েন্টে সমবেত হয়ে গণভবনের দিকে মার্চ করা হবে। এদিকে, আমার সূত্র থেকে জানতে পারি যে আওয়ামী লীগ ৪ আগস্ট ঢাকায় প্রায় ১৫,০০০ জন দলীয় কর্মী নামানোর পরিকল্পনা করেছে। আস্থাভাজন সালমানকে এ তথ্য জানিয়ে দেয়।

৪ আগস্ট গণভবন ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারেনি কারণ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীরা রাস্তায় নেমে রক্তপাত শুরু করে। দুপুর নাগাদ আসিফ ও নাহিদ পরের দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে, যা আস্থাভাজনকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। গুলশানের কমেপ্তায়ার রিচার্ডসে বসে আস্থাভাজন বিকেল ২:১৬টায় ওহাইদ আলমকে ফোন করে জানায়, এসএডি এইভাবেই চলতে চাইছে এবং তাদের গণভবন ঘেরাওয়ের কোনো পরিকল্পনা নেই। সে ওহাইদ আলমকে বলে যেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্ব নেয় এবং এই আন্দোলন এসএডি'র হাতে না ছাড়ে। ওহাইদ তাকে আশ্বস্ত করে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে; হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিকেল ৩:২০টায় সে সালমানকে ফোন করে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং জানায় সে এই আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছে। সালমান তাকে অনুরোধ করে যেন এখনই সরে না যায় এবং বলে, সে কিছু করার চেষ্টা করবে। ঠিক ৩:২৫ টায় আমি আমার আস্থাভাজনকে আমার এক সূত্র থেকে বার্তা পাঠাই–আওয়ামী লীগ পুনরায় দল সাজাচ্ছে, এসএডি'কে ঢাকা মার্চের কর্মসূচি একদিন এগিয়ে আনতে হবে, আর দেরি করা যাবে না, জনগণ কালই সেই কর্মসূচি চায়। সে বার্তাটি রেজা ও ওহাইদ আলমকে পাঠিয়ে দেয়। রেজা তাকে ফোন করে শান্ত হতে বলে। কিন্তু আস্থাভাজন জানায়, সে এই আন্দোলন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। রেজা জিজ্ঞেস করে, সে কী চায়। আস্থাভাজন জানায়, তার একটাই দাবি–পরের দিন থেকে গণভবন ঘেরাও করে বসে থাকা যতক্ষণ না হাসিনা পদত্যাগ করে। রেজা তাকে শান্ত থাকতে বলে কারণ এমন বড় পদক্ষেপের জন্য অনেক কিছুর সমন্বয় প্রয়োজন। ঠিক ৩:৫২টায় রেজা তাকে মেসেজ করে: "উড়হব. ঐধঢ়ঢ়?" কিভাবে সম্ভব হলো? এক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে নাহিদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি করানো হয়। সন্ধ্যা ৫:২১টায় আসিফ তার ফেসবুক পেজে ঘোষণা দেয় যে ঢাকা মার্চ কর্মসূচি একদিন এগিয়ে ৫ আগস্ট করা হয়েছে।

এরপর সব এসএডি সমন্বয়কারীরা ভিডিওবার্তায় ঢাকা মার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করতে থাকে। তবে আমরা চাইছিলাম কাদেরের ভিডিওটি সবার থেকে আলাদা হোক–শান্ত, সংযত ও ন্যায়পরায়ণ। আমার আস্থাভাজন তার সহকর্মীকে কাদেরের বাংলায় বক্তব্য লিখতে বলে, যা সে ইংরেজিতে অনুবাদ করে। আমি কাদেরের বাংলা ও ইংরেজি ভিডিওবার্তা আমার সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করি। রাত ১১:১১টায় আমি আস্থাভাজন, ফাহিম ও সালমানের সাথে গ্রুপ কলে যুক্ত হই পরদিনের গণভবন ঘেরাওয়ের লজিস্টিকস নিয়ে আলোচনা করতে। রেজা ও ওহাইদ আলম কাদেরের আশ্রয়দাতার ফ্ল্যাটে আরও পরিকল্পনার জন্য যান।

৫ আগস্ট সকালে ফাহিমের কাছ থেকে আস্থাভাজন শোনে যে পুলিশ বসুন্ধরায় ঢুকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে গুলি ছুঁড়ছে। চারপাশ থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর আসতে থাকে। সকাল ১১:৩২ টায় ওহাইদ আলম মেসেজ করে, "আজকের পর হাসিনা ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। আমরা চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।" দুপুর ১:৩৫ টায় সালমান আস্থাভাজনকে ফোন করে

কোনো আপডেট আছে কি না জানতে চায়। আস্থাভাজন বলে সবাইকে বের করে আনতে। ১:৫৯টায় সালমান আবার মেসেজ করে জানায়, তারা সবাই গণভবনের দিকে যাচ্ছে। ঠিক ২:৩০টায় আস্থাভাজন শফিকুল আলামের কাছ থেকে মেসেজ পায় যে হাসিনা ও রেহানা গণভবন ছেড়ে পালিয়েছে। এরপর সালমান ফোন করে আনন্দে কাঁদতে থাকে। পরের দিন ভোর রাতে সালমান আবার ফোন করে জানায় যে, "নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনুস অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দিতে রাজি হয়েছেন–সালমান তার সঙ্গেই ফোনে কথা বলে উঠেছে।"

রিকশাচালক আকাশের মৃত্যু

ছাত্র নেতাদের আহ্বানে সাধারণ জনতা রাজপথে নেমে আসার পরে অবস্থা বেগতিক দেখে ৫ আগস্ট মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে ছোটবোনসহ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুপুরের দিকে হাসিনার পলায়নের সংবাদ পেয়ে দেশের মানুষ খুশিতে আনন্দ মিছিল করে। মিষ্টি বিতরণ হয়, নারায়ে তাকবীর স্লোগানে জনতা রাস্তায় আনন্দে মেতে উঠে। সেদিন স্বৈরাচার বিরোধী বিজয় মিছিলে মো: আকাশও শামীল হন। পাশাপাশি তার রিকশার সরাঞ্জাম ক্রয় করতে টঙ্গী যান। সাথে ছিল প্রতিবন্ধী সন্তান। বিকেলে টঙ্গী থেকে ফেরার পথে আজমপুর ওভারব্রিজের নিচে আসার পরে পুলিশের নির্বিচারে গুলির মুখে পড়েন। এসময় ছেলেকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে লুকিয়ে পড়েন। ঘন্টাখানেক পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে কিনা দেখতে আসেন। রাজউক কমার্শিয়াল মার্কেটের কাছাকাছি আসার পরে ৪টি গুলি এসে তার দেহে বিদ্ধ হয়। মো: আকাশ ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। অনেক্ষন অপেক্ষা করার পর প্রতিবন্ধী ছেলে বাবাকে না দেখে কান্না করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা আরো বেগতিক হলে আকাশ ব্যাপারির ছেলেকে তার প্রতিবেশী বাড়িতে পৌঁছে দেয়। রাতে আকাশের জন্য তার পরিবার উদ্বিগ্ন হতে থাকে। নিরাপত্তার অভাবে তার স্ত্রী ও কন্যারা খোঁজ নিতে ব্যর্থ হয়। খোঁজাখুঁজি কয়েকদিন ধরে চলে। পরিবার ছবিসহ নিখোঁজ সংবাদ ছাপিয়ে প্রচার করে। উত্তরার আশেপাশের হাসপাতাল গুলোয় আকাশ নামে কাউকে পাওয়া যায় না। একপর্যায়ে ছাত্র সমন্বয়কেরা সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে সমন্বয়ক রায়হান বলেন, "এক মহিলা আমাদের কাছে আসেন। তার দুই কন্যা ও এক প্রতিবন্ধী সন্তান।"

ঘরে তাদের খাবার নেই। তাদের গৃহকর্তার ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানতে চায়। আমরা হাসপাতাল গুলোয় খোঁজ নিয়ে কিছু অজ্ঞাত লাশের কথা জানতে পারি। লাশ গুলো ঢাকা মেডিকেলের মর্গে আছে। পরিবারটিকে সেখানে নিয়ে গেলে তারা অনেক লাশের মধ্যে একটি লাশকে চিহ্নিত করে। অবশেষে ১০ আগস্ট ঢামেক মর্গ থেকে লাশ বুঝে পায় পরিবার ।

কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ভাষ্য: ৫ আগস্ট সন্ধ্যার কিছু আগে লাশটা আসে। এরপর কোনো আইডেন্টিটি না পাওয়াতে গভীর রাতে লাশ ঢামেক মর্গে পাঠিয়ে দেই। তার শরীরে ৪ জায়গায় বুলেট এফোড় ওফোড় হয়ে বের হয়ে গিয়েছিলো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মো: আকাশের স্ত্রী লাকি আক্তার দুইটি বাসায় গৃহস্থালীর কাজ করে সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করছেন। ঢাকা উত্তরায় ভাড়া বাসায় থাকেন। তার প্রথম সন্তান প্রতিবন্ধী। ছোট দুই মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করছে। গ্রামে কোন সম্পদ নেই।

নিউজ লিংক :

https://youtu.be/Afx2cAY5JZc?si=E8WrP8iRlg7YhnWz

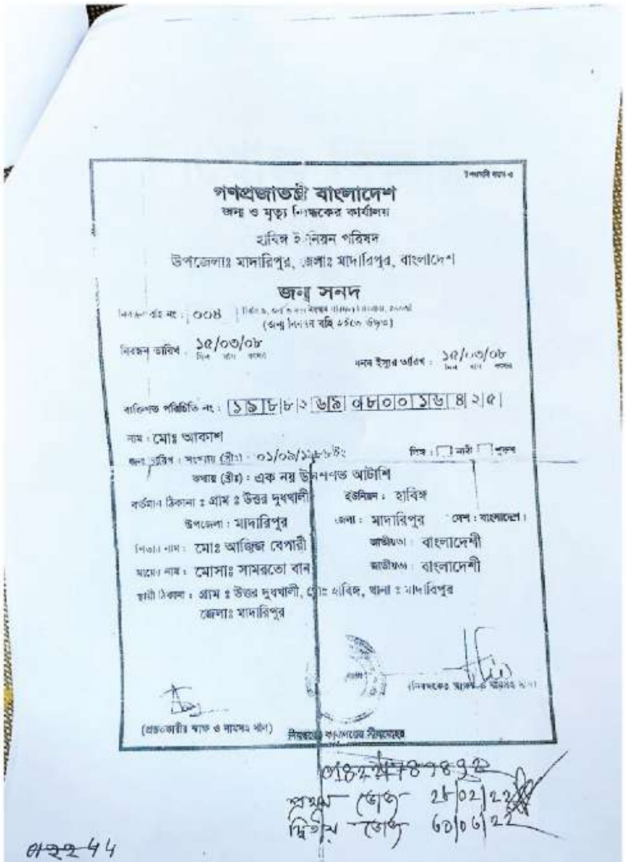
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
হাবিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মাদারিপুর, জেলাঃ মাদারিপুর, বাংলাদেশ
জন্ম সনদ
নিবন্ধন তারিখ : ১৫/০৩/০৮
সনদ ইস্যুর তারিখ : ১৫/০৩/০৮
ব্যক্তিগত পরিচিতি নং : ১৯৮৮২৬৯৫৮০০১৬৪২৫
নাম : মোঃ আকাশ
জন্ম তারিখ : সংখ্যায় (খ্রীঃ) : ০১/০৯/১৯৮৮ইং
কথায় (খ্রীঃ) : এক নয় উনিশশত আটাশি
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম ঃ উত্তর দুধখালী, ইউনিয়ন : হাবিগঞ্জ
উপজেলা : মাদারিপুর, জেলা : মাদারিপুর, দেশ : বাংলাদেশ।
পিতার নাম : মোঃ আজিজ বেপারী, জাতীয়তা : বাংলাদেশী
মাতার নাম : মোসাঃ সামরতো বানু, জাতীয়তা : বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ঃ উত্তর দুধখালী, পোঃ হাবিগঞ্জ, থানা ঃ মাদারিপুর
জেলাঃ মাদারিপুর

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম : মো: আকাশ
জন্ম : ০১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
পেশা : রিকশাচালক
পিতা : মো: আজিজ বেপারী
মাতা : মোসা: সামরতো বান
স্ত্রী : লাকি আক্তার
সন্তান : ১. বাপ্পী (২২), শারীরিক প্রতিবন্ধী, ২. শারমিন আক্তার (১৫) ৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ, আবদুল জলিল উচ্চ বিদ্যালয় বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা ৩. শাহনাজ আক্তার, (১৪), ৮ম শ্রেণি, আবদুল জলিল উচ্চ বিদ্যালয়, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : উত্তর দুধখালী, হাবিঙ্গ, মাদারীপুর
বর্তমান ঠিকানা : বাউনিয়া, বটতলা, বাদালদী, তুরাগ, ঢাকা
ঘটনার স্থান : ওভারব্রিজের নিচে, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা
আক্রমণকারী : পুলিশ
আহত হওয়ার সময় : ৫ আগস্ট, বিকেল ৬টা
আঘাতের ধরন : হাতে, বুকে, পিঠে ও কোমরে গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান : ৫ আগস্ট, বিকেল ৬ টা, ওভারব্রিজের নিচে, আজমপুর
শহীদের কবরের অবস্থান : বাউনিয়া বটতলা মসজিদের পেছনের কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
২. সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় প্রদানে সহযোগিতা করা।

শহীদ মো: শুভ

ক্রমিক: ৭৫৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১৫০

শহীদ পরিচিতি

জুলাই বিপ্লবে যারা রাজপথে নিহত হয়েছেন মো: শুভ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রিকশার মিস্ত্রী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম আবুল খান এবং মায়ের নাম রেনু বেগম। তাঁর বাবাও পেশায় ছিলেন রিকশাচালক।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

হাসিনা দেশ ছেড়ে পলায়নের পরে দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি শান্ত করতে সেনাপ্রধান যেসব রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান করেছিলেন তার মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাক্তার শফিকুর রহমান ছিলেন অন্যতম। দেশবাসী আগে আবছা আবছা ভাবে অনুমান করলেও সেদিনই বুঝে গিয়েছিল স্বৈরাচার খুনি দেশের অর্থ লুণ্ঠনকারী বাংলার ফেরাউন শেখ হাসিনাকে হঠাতে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। আল জাজিরার সাংবাদিক জুলকার নাইন সায়ের জুলাই আন্দোলনে যাকে কৃতিত্ব দেন তিনি ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২০২৪ সেশনের সভাপতি সালমান ওরফে সাদিক কায়েমকে। সাদিক কায়েম একাধারে ছাত্রদের প্রত্যেকটি সমাবেশে তার কর্মী বাহিনী নিয়ে সক্রিয় থাকেন, জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়কদের রক্ষা করেন এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আওয়ামী লীগের নির্যাতন তুলে ধরেন।

জুলকারনাইন সায়ের ২০২৪ সালে পার্সন অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করেছিলেন সাদিক কায়েমকে।

আন্দোলনের সময় সাদিক কায়েম সালমান নাম নিয়ে জুলকারনাইন সায়ের এবং প্রভাবশালীদের সাথে সমস্ত যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। সমন্বয়কদের জন্য সেইফ হাউজের ব্যবস্থা করতে যা যা প্রয়োজন তা তিনি করেছিলেন। এক দফা ঘোষণা দেওয়ার আগে কিছু সমন্বয়ক দাবি করে বসে তাদের ফ্যামিলিকে এম্বেসিতে আশ্রয় না দিলে তারা এক দফার ঘোষণা দিবেন না। এখানে একজন রহস্যময় নারী চরিত্র আছে। যিনিই মূলত সাদিক কায়েমকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন আন্দোলনের ব্যাপারে এবং উনিই মূলত সেইফ হাউজের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই রহস্যময় নারী বারবার সমন্বয়কদের উপর বিরক্ত হয়ে সহযোগিতা বন্ধ করতে চাইছিলেন। কিন্তু সাদিক কায়েম বারবার অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, "এখানে অনেক স্টেক হোল্ডার আছে। কাজ করা খুবই পেইন হয়ে যাচ্ছে। বাট আমি এই আন্দোলনের জন্য আমার জীবন দিয়ে দিতেও প্রস্তুত।" এখানে এসে বুঝেছি কেন সাদিক কায়েমই পার্সন অব দ্য ইয়ার।

কারণ, যখন এখনকার স্টার নেতারা সেইফ হাউজে বসে এম্বেসিতে পরিবার না নিলে খেলবো না বলে জেদ ধরেছিলেন, তখন সাদিক জেদ ধরেছিলেন যে আন্দোলন করতেই হবে। অন্যরা নিজের পরিবারের চিন্তা করেছে, সাদিক চিন্তা করেছে আন্দোলনটা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এতো সেক্রিফাইস করেও আজ পর্যন্ত এই বিপ্লবে সাদিক বা শিবিরের অন্য কোনো নেতা নিজের ভূমিকা নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি, সরকারে যাননি, নিজের জন্য কিছু দাবিও করেননি। অথচ আমরা আজ আবিষ্কার করলাম, সবার সেইফ থাকার ব্যবস্থা করে সাদিক ফাঁসির দড়িটা তার গলাতেই টেনে রেখেছিলেন। দুনিয়ার সবার সাথে যোগাযোগ করেছেন নিজের নাম্বার থেকে। যেই নাম্বার খুঁজে বের করে সাদিককে গুলি করে মারতে খুনি হাসিনার খুব অল্প সময় লাগতো। শুভ ছিলেন সকল নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক। যেখানে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা দলের চাটুকারিতার পাশাপাশি সর্বত্র চাঁদাবাজি, লুটপাটে ব্যস্ত থাকতো। শুভ সেখানে নিজের পরিশ্রম দিয়ে হালাল ইনকামের চেষ্টা করতেন।

১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল দিনে শুভ তাঁর আত্মীয়সহ কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছিলেন। ঐ মুহূর্তে ঢাকা মহানগরীর সায়েন্স ল্যাবে চলছিল গুলিবৃষ্টি। অস্ত্র বিহীন সাধারণ ছাত্রদের দমন ও খুন করতে শেখ হাসিনার বাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুর পন্থায় যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করছিল। পুলিশের ছোড়া একটি গুলি শুভর মাথায় বিদ্ধ হয়। গুলিবৃষ্টি থামার দীর্ঘক্ষণ পরে ঘটনাস্থল থেকে তাকে প্রথমে পপুলার হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে পরদিন ২০ জুলাই বিকাল ৪.১০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু ঘটে। জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা : তাঁর পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। বাবা রিকশা চালক।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মোঃ শুভ
পেশা	: রিকশার মিস্ত্রী
পিতা	: আবুল খান
মাতা	: রেনু বেগম
ভাই-বোন	: জান্নাত (বিবাহিত), মিম (২য় শ্রেণিতে পড়ে এবং বেলুন বিক্রেতা), সোহাগ (বেকার)
স্থায়ী ঠিকানা	: চরসোনাপুর, শ্যামেরহাট, কাজীরহাট, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: ৮৬/১, রায়ের বাজার, ঢাকা
ঘটনার স্থান	: সায়েন্স ল্যাব, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: বিকেল ৪ টা
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলি
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০ জুলাই, বিকাল ৪.১০ মিনিট
শহীদের কবরের অবস্থান	: আজিমপুর কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী

ক্রমিক: ৭৫৪
আইডি: ঢাকা সিটি ১২৫

শহীদ পরিচিতি

আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী বাগেরহাট জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চোরমোনাই পীরের খাটি একনিষ্ঠ মুরিদ ছিলেন। মিরপুরে তাঁর কম্পিউটার কম্পোজের দোকান ছিল। ৫ আগস্ট হাসিনা খেদাও আন্দোলনে তাঁকে শেখ হাসিনার নির্দেশে সরাসরি গুলি করে হত্যা করা হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ২০০৮ সালে ক্ষমতার মসনদে বসে। পরে জানা যায় নির্বাচন কমিশনে আওয়ামী লীগকে জয়ী করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত নির্বাচনী আসনগুলোকে আওয়ামী লীগের সুবিধানুযায়ী রূপ দিয়েছিলেন। যার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে। ক্ষমতায় এসেই শেখ মুজিবকে হঠাতে যেসব বীর সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকে ৫ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সাধারণ মানুষসহ ৭৬ জনকে তাৎক্ষণিক নৃশংসভাবে হত্যা করে। জামায়াত নেতাদের একে একে গুম, খুন ও হত্যা করতে থাকে। প্রতিবাদকারীদের গুম করে রাখার জন্য তারা গোপন স্থানে আয়নাঘর তৈরি করে। এতে আটক রাখা হয় সৎ ব্যক্তিদের। হারিয়ে যাওয়াদের জন্য "মায়ের ডাক" নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। তারা তাদের সন্তান, বাবা, ভাইদের ফিরে পেতে আকুতি জানায় সরকারের কাছে। ৫ আগস্টে দেশে ২য় স্বাধীনতার পরে আয়নাঘর থেকে কিছু মানুষ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। তারা গুমঘর বা আয়নাঘরে অবস্থানকালীন ভয়ানক বীভৎস অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে থাকে। ঘাতক হাসিনার নির্দেশে বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলির গুম ও হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ তথ্য ফুটে আসে জনতার সামনে। বাংলাদেশের অন্যতম সেরা উদ্যোক্তা জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার পরে তার সন্তান ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাশেম আরমানকে আটক ও গুম করে রাখা হয় ৮ বছর। তিনি গুম থাকাবস্থায় জানতেন না তার বাবার হত্যাকাণ্ডের কথা। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক জনপ্রিয় আমীর অধ্যাপক গোলাম আজমের সন্তান সেনাবাহিনীর মেধাবী ও জনপ্রিয় কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল্লাহিল আমান আজমীকে ২০১৬ সালের ২৩ আগস্ট নিখোঁজ হন। তাকে আয়নাঘরে গুম করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘ ৮ বছর।

আফজাল বিন আকরাম হোসাইন নামক একজন তার আয়নাঘরে অবস্থানকালীন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন নিজের ফেইসবুক আইডিতে। তিনি লিখেন-

আপনাদের ইতিমধ্যেই বলেছি, অনেকটা এরকম রুমে আমি আর মীর ইবরাহীম দুজন ছিলাম। এখানে আবছা আলো আর ২০১৯-এর জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে টিকতে না পেরে আমরা ফ্যানের বাতাস চাইতাম। আমাদের যিনি খাবার দিতো, সে দরজার নিচ দিয়ে ফ্যান শুইয়ে রেখে বাতাসের ব্যবস্থা করতো, সেই ফ্যান ছাড়লে,প্রচণ্ড বিকট মাথা ধরা শব্দ হতো, আর বাতাসের গরম এতোটাই বেশি ছিলো যে, সেই বাতাসে মনে হতো আমাদের শরীরে যেন শত শত শুই ফুটিয়ে দিচ্ছে কেউ।

২. আমাদের রুমের ঠিক বাম পাশে ফারুক থাকতো, ফারুকের বাড়ি ছিলো কক্সবাজার, ফারুক গাজীপুরে গার্মেন্টস এ জুটের ব্যাবসা করতো। ফারুকের ভাষ্যমতে ফারুক সেখানে কমপক্ষে ৫ বছর ধরে গুম আছে, তার ব্যাবসায়িক পার্টনার জধন কে মাত্র এক লক্ষ টাকা কনটাক্ট দিয়ে তাকে গুম করে ফেলে। সে যেহেতু কোন রাজনীতি করে না তাকে উদ্ধারের জন্য কেউ হয়তো এগিয়ে আসবে না। ফারুক প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে প্রায় বলতো, তার মলদ্বার দিয়ে আস্ত মাছ বের হয়েছে, আবার সাপ বের হয়েছে, আমরা যাতে পানি পড়া দেই।। আমি বোঝতাম, ফারুকের হয়তো মতিভ্রম হচ্ছে, নয়তো কৃমি রোগ হয়েছে, কিন্তু আয়নাঘরে কোন চিকিৎসা করা হয় না। তাই দাওরা হাদীসের ছাত্র ইব্রাহিম, ফারুক ভাইকে ছোট বোতলে পানি পড়া দিতো, এটা খেয়ে ফারুক খুব আত্মতৃপ্তিতে বলতো, পানি পড়া খেয়ে সে ভাল হয়ে গেছে, আমরা নিশ্চয় আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা, আমাদের শীঘ্রই ছেড়ে দিবে ইনশাআল্লাহ।

৩. আমাদের রুমের ডান পাশে থাকতো জামাল ভাই, তার ভাষ্যমতে, সে দেড় বছর ধরে সেখানে থাকছে। তার পকেটে জঅই ইয়াবা ঢুকিয়ে দিয়ে এখানে তুলে আনে। আমাদের দেখা আয়নাঘরে যাকে যে পোশাকে তুলে আনা হতো, সপ্তাহ হোক, মাস হোক কিংবা বছরের পর বছর হোক তাকে সে পোশাকেই থাকতে দেওয়া হতো। চুল কাটা, ব্রাশ করা, ভালভাবে গোসল করা, গোপনাঙ্গ পরিষ্কার করা, মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর এসবের কিছুই ঘটতো না।। এভাবে থাকতে থাকতে ইব্রাহিমের দাঁত গুলো কালো হয়ে ওঠেছিলো, Saiful আর হেমায়েত ভাইয়ের শরীর সাপের খোলস পড়ার মতো ময়লা হয়ে ফেটে গিয়েছিলো!

৪. ওদের নির্যাতন তো আছেই, সাথে তীব্র গরম থেকে বাঁচতে জামাল, ফারুকসহ আয়নাঘরের অনেক বন্দি উলঙ্গ থাকতো। আমি কখনও শুধু শার্ট পরতাম, কখনও শুধু প্যান্ট, নিরুপায় হয়ে পড়লে বাধ্য হয়ে কখনও অন্তর্বাস পড়ে কম্বলে জড়িয়ে থাকতাম। মাস্ক পড়ে টর্চ লাইট দিয়ে আমাদের উলঙ্গ শরীর দেখতে আসা RAB কর্মকর্তারা হয়তো পৈচাশিক আনন্দই পেতো। আমাদের টর্চ লাগতো না, অন্ধকারে থাকতে থাকতে সবাই বেশ ভালই দেখতাম, বরং আমাদের চোখে আলো সহ্যই হতো না।

৫. বছর চুল দাড়ি না কাটা ফারুক দেখতে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা নিয়ে আমার বেশ কৌতূহল ছিলো। কিন্তু আমাদের যখন টর্চার/জিজ্ঞাসাবাধে নিয়ে যেতো, তখন কয়েকজন এসে এই রুমে থাকতেই পিছনে হাত নিয়ে হ্যাণ্ডকাফ পড়িয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে যেতো। তাই টর্চারসেলে নেওয়ার সময় ফারুক আমাকে দেখলেও আমার আর দেখা হয়নি। ফারুক ভাই, আমাদের কাছে তার পরিবারের নাম্বার মুখস্থ বলে অনুরোধ করেছিলো, আমরা যাতে সুযোগ পেলে তার বউকে জানাই "ফারুক তার তিন সন্তান আর বউকে অনেক ভালবাসে,বউ যাতে ফারুককে তালাক না দেয়।" দেড় বছরে জামাল মাইরের চোটে সব ভুলে যাওয়াতে আমাদের কোন নাম্বার দিতে পারেনি। পরবর্তীতে একই রকম টর্চারে আমরাও ফারুকের দেওয়া নাম্বার মনে রাখতে পারিনি। যখন বিদুৎ চলে যেতো, তখনি কেবল আমরা কথা বলার সুযোগ পেতাম, বিদ্যুৎ আসলেই ফ্যানের গরম বাতাস আর বিকট শব্দে বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে দাঁড়াতো।

৫. আপনি যদি প্রশ্ন করেন আয়না ঘরের সব থেকে বেশি নির্যাতন কিভাবে করা হয়। আমরা বলবো, আয়নাঘরের অবস্থান করা প্রতিটা মুহূর্ত এতো বড় নির্যাতন যে মুক্তজীবন দিয়ে এর তুলনায় করা যায় না। সেখানে অসুস্থ হলে কোন ডাক্তার বা চিকিৎসা দেওয়া

হয় না,আমি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে ইব্রাহিম অনেক বলে কয়ে দুটো প্যারাসিটামল নিয়েছিলো সেটাও ছিলো মেয়াদোত্তীর্ণ। একটা ভেজা গামছা মুখের উপর দিয়ে তারা অল্প অল্প করে পানি ঢালতো, আমরা শ্বাস নিতে গেলেই দম বন্ধ হয়ে মনে হতো মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যেতাম, পিছনে হাত মুড়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে দুজন করে সে হাতের উপর দাঁড়িয়ে যেতো, উপুর করে ফেলে পায়ের উপর ডাণ্ডা দিয়ে দুজন দাঁড়িয়ে যেতো, তাদের মনমতো উত্তর না হলেই চুল টেনে এলোপাতাড়ি চড় মারতো, এতো নির্যাতনেও তারা মজা না পেলে তলপেটে আর অণ্ডকোষে লাথি মারতো এভাবে চলতো যতদিন ভিক্টিম তাদের মনমতো না হয়ে ওঠে।

৬. আয়নাঘরের সমাপ্তি ঘটতো মূলত তিন ভাবে; এক: এরকম অমানবিক নির্যাতন থেকে বাঁচতে আয়নাঘরে বন্দি ভিক্টিম যেকোনো শর্তে রাজি ছিলো, সেই সুযোগে তাদের থেকে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি নিয়ে তাদের মনমতো স্ক্রিপ্ট সাজিয়ে মামলা দিয়ে নতুন করে গ্রেফতার দেখাতো। এর ফলে ভিক্টিম সরাসরি কারাগারের সেলে চলে যাওয়াতে গণমাধ্যম বা মিডিয়াতে কোন মন্তব্য করতে পারতো না, সহসা তাদের জঙ্গি ও মাদক মামলা দেওয়াতে তাদের অপরাধকেও অনেক বড় করে দেখানো হতো। হেমায়েত আর ইব্রাহিমকে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালের একটা কাউন্টারে সিভিলে জঅই এভাবেই একটা কালো ব্যাগ দিয়ে রেখে আসে, ১০ সেকেন্ড না যেতেই সেখানে পোশাকধারী জঅই এসে তাদের নাটক সাজিয়ে গ্রেফতার দেখায়, পাবলিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের স্বাক্ষর নিয়ে সাক্ষী বানিয়ে, তাদের মনগড়া মামলা সাজায়। একই ভাবে সাইফুলকে সিভিল পোশাকে রাস্তায় ছেরে কয়েক সেকেণ্ড না যেতেই পোশাক পরিহিত জঅই দিয়ে হৈ চৈ করে গ্রেফতার করায়, যেন মাত্রই ধরে নিয়ে আসলো। বিশেষ করে আয়নাঘর থেকে বেঁচে যাওয়া, নিরীহ মাজলুম ও তার পরিবারের সদস্যদের পরবর্তী জঅই এর মনগড়া জঙ্গি মামলার অপবাদ বয়ে বেড়াতে হতো আজীবন। কোন গণমাধ্যম, ভালো আইনজীবী, প্রভাবশালী আত্মীয়, রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংস্থা তাদের নিয়ে কথা বলতো না। অনেক ক্ষেত্রে কারাগারে থাকা সিরিয়াল কিলার এবং সত্যিকার জঙ্গিদের দ্বারা তাদের প্রতিনিয়ত নতুন ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হতো। দুই: ঐ যে বললাম, চুল দাড়ি কাটার কোন সুযোগ মাসের পর মাস আয়নাঘরে থাকতো না। এর ফলে গ্রেফতার দেখানো বা ক্রসফায়ারে দেওয়ার আগে তাদের চুল দাড়ি সাইজ করে দেওয়া হতো, এর ফলে একদিকে মনে হতো তারা বুঝি মুক্তই ছিলো, নইলে চুল কাটতো কিভাবে? আবার বড় চুল দাড়ির কারণে প্রফেশনাল মাদক ব্যাবসায়ী বা জঙ্গি হিসেবে মিডিয়াকে সহজে বিশ্বাস করানো যেতো। এর মাঝে কাউকে ইব্রাহিম আজিমের মতো গুলি করে মেরে ফেলে মিডিয়া কাভারেজ দিতো বন্দুকযুদ্ধ বলে। আবার কাউকে ইলিয়াস আলীর মতো ঠাণ্ডা মাথায় মেরে, পেটের নারীভূড়ি কেটে চিরস্থায়ী ভাবে নদী বা সমুদ্রে ফেলে দিতো, কখনই তাদের বিষয়ে মিডিয়া প্রশ্ন করলে দায় স্বীকার করতো না।

তিন: অনেকের শেষ পরিণতি হতো ব্যারিস্টার আরমান, জেনারেল আযমীদের মতো, মানে কোনদিনই আর আয়নাঘর থেকে বের হতে পারবে না। এই ক্যাটাগরিতে সাজেদুল, শিবির নেতা ওয়ালিউল্লাহ, মোকাদ্দাস ও আমাদের সাথের ফারুক ও জামাল ভাইয়েরা পড়ে। এই ক্যাটাগরির লোকেরা বেঁচে আছে না মরে গেছে তারা দায় স্বীকার না করলে আপনি নির্দিষ্ট করে বলতেও পারবেন না।

৭. আমি এতক্ষন যা লিখলাম খুব দায়িত্ব নিয়ে আমরা এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবো। গতকাল থেকে আয়নাঘরের অনেক ভিক্টিম আমাদের মতো লিখছে, উনাদের মাঝে যারা মোহাম্মদপুর, বসিলা জধন ক্যাম্পে ছিলো তারা আশা করি আমাদের দেওয়া বিবরণে একমত হবেন। এর প্রতিটা বাক্যের সত্যতা নিশ্চিতে ২০১৯-এর জুন-জুলাইতে মোহাম্মদপুর, বসিলা জঅই ক্যাম্পে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মধ্যস্থতায় আমাদের মুখোমুখি করুন। গুম পরবর্তী দায়েরকৃত সকল মিথ্যা, বানোয়াট মামলা প্রত্যাহার করুন, হাসিনাসহ দোষীদের গ্রেফতার করুন, এখনো নিখোঁজদের দ্রুত উদ্ধার করুন। আমার এই লিখা তাদের পক্ষ থেকে, যারা আয়নাঘর অমানুষিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েও আমাদের মতো লিখতে বা বলতে জানেন না। নেত্রনিউজ প্রথম আয়নাঘর সম্পর্কে আমাদের তথ্য প্রদান করে। সাধারণ মানুষের মতো আনোয়ার হোসাইনও সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধী ছিলেন। তিনি ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবাদও করতেন। আনোয়ার হোসেন সুযোগ খুঁজছিলেন স্বৈরাচার হটানোর। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তাকে এই সুযোগ এনে দেয়। মার্চ ফর ঢাকা কর্মসূচির আহ্বানে তিনি সাড়া দেন। ৫ আগস্ট হাসিনার পলায়নে আনন্দ মিছিলে অংশ নেন। মিরপুর ১০ এলাকায় আনন্দ মিছিলরত অবস্থায় পুলিশের গুলিতে আহত হন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা : ৪ ভাইয়ের মধ্যে ৩য় ভাই জাকির হোসেন ডিপ্লোমা প্রজেক্ট ইঞ্জিয়ার তিনি একটি বেসরকারী কোম্পানীতে চাকুরী করেন। গ্রামে ভিটেবাড়ি সংশ্লিষ্ট তাদের ৩ কাটা জমি আছে।

শহীদ সম্পর্কে আনুভূতি

শহীদের পিতা, 'আমি কি বলব, ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না। দেশ আজকে স্বাধীন হয়েছে। ছাত্ররা যদি আন্দোলনের ডাক না দিত, তারা যদি ঝাপায়ে না পড়ত। যদি দেশ স্বাধীন না হতো। তাহলে খালেদা জিয়া লন্ডন যেতে পারত না। তারেক রহমান মামলা থেকে খারিজ পেত না। বাবরের জামিন হতো না। এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে যারা মামলা থেকে খারিজ পেয়ে বিদেশে যেতে পারছেন। তাদের উচিত ছাত্রদেরকে স্বরণ করা। আমি কি বলব, আপনাদের বুঝতে পারছি না। আমার ছেলের জন্য মনটা কানতেছে। যারা শহীদ হয়েছে তারা এখন নিরপেক্ষ। কিছুদিন তাদের স্বরণ করবে। এরপর আর কেউ স্বরণ করবে না। বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে- যারা শহীদ হয়েছে তাদের জন্য কারও ভাবনা-চিন্তা কিছুই নাই। কবে নির্বাচন হবে, কবে ভোট হবে এই চিন্তায় পেরেশান।' শহীদের ভাই আব্দুল্লাহ আল মারুফ বলেন- 'ভাইয়া যেদিন শহীদ হয়েছে সেইদিন আমি তাকে ছুয়ে শপথ নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ তার রক্ত বৃথা যেতে দেব না। তার মুখোশধারী মানুষরা ভাইয়ার ত্যাগকে বাঞ্চাল করার চেষ্টা করছে। ইনশাআল্লাহ এটা হতে দেব না'। শহীদ হওয়ার দশ মিনিট পূর্বে আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী তার ফেসবুকে লিখেছিলেন-

'দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা, রাজপথে জনতার উল্লাস।'

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী
পেশা	: ব্যবসা (কম্পিউটার কম্পোজ)
পিতা	: মো: আল-আমীন পাটোয়ারী
ভাই-বোন	: ৪ ভাই এবং ৩ বোন।
স্থায়ী ঠিকানা	: কবরস্থান পূর্ব এলাকা ০১, শেহলাবুনিয়া, ওয়ার্ড নং ০৩, মোংলা, বাঘেরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: কবরস্থান পূর্ব এলাকা ০১, শেহলাবুনিয়া, ওয়ার্ড নং ০৩, মোংলা, বাঘেরহাট
ঘটনার স্থান	: মিরপুর -১০
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট বিকাল ৪ টা
আঘাতের ধরন	: কিডনির পাশে-রানে
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট স্পটে, মিরপুর- ১০ আজমল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিলো
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম

আওয়ামী লীগের নির্যাতনের ভয়ে ভীত হয়ে তার পরিবার পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করতে অনিহা প্রকাশ করেছেন

প্রস্তাবনা : ১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

শহীদ গঙ্গা চরন রাজবংশী

ক্রমিক : ৭৫৫

আইডি : ঢাকা সিটি ১২৬

একজন শ্রমজীবী নাগরিক, যিনি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ছায়ায় ঢেকে গেলেন

শহীদের পরিচিতি

গঙ্গা চরন রাজবংশী একটি নাম, এতদিন পর্যন্ত ছিল শুধু এক পুরনো হাইভিজ জ্যাকেটে আটকে থাকা চালকের পরিচয়পত্রে লেখা কিছু শব্দ। একটা নাম, যার ওজন ছিল না রাষ্ট্রের কোনো নথিতে, যার অস্তিত্ব ছিল না সমাজের গর্বের তালিকায়। আজ, মৃত্যুর পরে, সে নামটিই হয়ে উঠেছে এক নীরব বিস্ফোরণ। প্রতিবাদের প্রতীক, যন্ত্রণা ও অবহেলার প্রতিচ্ছবি। জন্ম ৮ জুন ১৯৬৬, পিতা কালু লাল রাজবংশী, মাতা নিপদা রাজবংশী। এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন ছিল নিঃশব্দ, তাঁর বিদায়ও হলো এক অবর্ণনীয় নীরবতায়। পেশায় তিনি ছিলেন একজন ড্রাইভার। তা কোনো গর্বের পেশা নয় এই সমাজে। কিন্তু তাঁর গর্ব ছিল তাঁর পরিবার। পরিবারটি থাকত ঢাকার বৈঠাখালি, মধ্য বাড্ডার ভাঙাচোরা এক ভাড়া বাড়িতে। যেখানে টিনের চাল ফুটো হলে বর্ষায় ঘরের ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা করে জমত কষ্টের জল। যেন কোনরকম দিনাতিপাত। কোনো কিছু হাতে এলে রান্না হত, না এলে ঘরের বাতি নিভে যেত অনাহারের অন্ধকারে। কেউ জানত না তাঁদের গল্প, কেউ শুনত না তাঁদের কান্না। কারণ এই পরিবার "গরিব", আর গরিবদের গল্প হয় না। গরিবরা শুধু সংখ্যা।

তাঁর বড় ছেলে মিঠু রাজবংশী, বয়স ৩২, এখনো বেকার। ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ (২৫) বি.এ পড়ছে আবুজর গিফারী কলেজে। পড়ালেখার খরচ যোগাতে বাবাকে কত রাত, ভোর পর্যন্ত বাস চালাতে হয়েছে সেই ক্লান্তির হিসেব কোনো নথিতে নেই। সরকারের চোখে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায়ও নেই। শুধু ছিল এক নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ব্যস্ততা ও পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর সংগ্রাম।

আর তারপর হঠাৎ একদিন, এক গুলির শব্দ থামিয়ে দিল সেই সংগ্রাম। গঙ্গা চরন শহীদ হলেন, তবে কোনো স্বীকৃতি ছাড়া, কোনো তদন্ত ছাড়া। পোস্টমর্টেম হয়নি কারণ তিনি "ড্রাইভার"। তাঁর লাশ নিয়ে পরিবার থানায় গেলে পুলিশ আমলে নেয়নি। শেষে কাউন্সিলরের সুপারিশপত্র নিয়ে শ্মশানে যেতে হয়। মৃত্যুর পরেও তাঁকে "যাচাই করে" মরতে হয়। রাষ্ট্র তাঁকে চিনল না, সমাজও নয়। অথচ তাঁর রক্তে মিশে আছে মধ্যবিত্তের নীরব ক্রন্দন, নিম্নবর্গের আর্তনাদ। এই মৃত্যু শুধু একটি দেহ থামায় না। এই মৃত্যু থামিয়ে দেয় শ্রেণীসংগ্রামের এক অলিখিত ইতিহাস। সে ইতিহাসে লেখা থাকে, কীভাবে এক মানুষকে জীবদ্দশায় উপেক্ষা করা হয়, আর মৃত্যুর পরেও তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না। গঙ্গা চরন রাজবংশী আজ নেই, কিন্তু তাঁর নাম লেখা রইল। একটি হারিয়ে যাওয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে, নীরব শহীদের তালিকায়, যেখানে প্রতিটি নাম একেকটি অজানা অভিশাপ হয়ে বাতাসে ভাসে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

গঙ্গা চরনের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা ছিল না। এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় লাশের রাজনীতি। নরম জুতোয় হাঁটা এক নির্মম ফ্যাসিবাদের নগ্ন উদাহরণ। ২০২৪ সালের জুলাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তমাখা একটি মাস। সেদিনের রোদ যেন ছিল বিদ্রোহের আগুনে জ্বলা, বাতাসে মিশে ছিল দীর্ঘদিনের চাপা কান্না। ১৫ বছরের আওয়ামী শাসন তখন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি, গুম, ভোট ডাকাতি, বিচারহীনতার মহোৎসব চলছিল খোলাখুলি। আদালত ছিল বন্দি। সাংবাদিকেরা নিঃশব্দ। আর পুলিশ বাহিনী যেন ক্ষমতার বেসরকারি আর্মি।

এই নিপীড়নের বিপরীতে উঠে দাঁড়িয়েছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন। প্রথমে নেহাত ছাত্রদের দাবি মনে হলেও, তাতে খুব দ্রুত রক্ত মিশে যায় দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের। কেননা এই আন্দোলন ছিল শুধুই শিক্ষানীতির জন্য নয়, এটি ছিল সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ব্যথিত চিৎকার। শহীদ আবু সাঈদের রংপুরে হত্যার পর, আর তা ছাত্রদের আন্দোলন থাকে না–তা হয়ে ওঠে এক গণবিদ্রোহ। শ্রমজীবী, বেকার, শিক্ষক, নার্স, অবসরপ্রাপ্ত সেনা, দিনমজুর, এমনকি রিকশাচালকও তাতে শরিক হন। এই আন্দোলনের উত্তাপে জেগে উঠেছিল গঙ্গা চরনের মতো মানুষ, যাদের প্রতিদিনই এক জীবনমরণ যুদ্ধ।

গঙ্গা চরণ যিনি কোনো সংগঠনের নেতা ছিলেন না, কোনো দলীয় কর্মী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই নিরব বিপ্লবীর প্রতিচ্ছবি, যার শরীরে ঘাম জমত সারাদিনের পরিশ্রমে, আর মন ভেঙে যেত ছেলেদের মুখে খাবার না দিতে পারলে। কিন্তু তাঁর হৃদয় বুঝেছিল এই লড়াই শুধু কোটা সংস্কারের না, এটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে, এটি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যে রাষ্ট্র সবসময় গরিবকে গোনে না, খেয়াল করে না, শেষমেশ গুলি করে থামিয়ে দেয়।

তাই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন হয়তো একা, হয়তো নিরবে। কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন সেই দিন দক্ষিণ বনশ্রীর মোড়ে, যেখানে ছাত্রদের মিছিল হঠাৎ থমকে গিয়েছিল পুলিশের ব্যারিকেডে। সেখানে গুলি চলে। আর সেই গুলি লাগে গঙ্গা চরণের ঠোঁটের বাঁ পাশে। কেউ জিজ্ঞেস করেনি কেন তিনি সেখানে ছিলেন। রাষ্ট্র জবাব দেয়নি। কিন্তু উত্তর ছিল রক্তে লেখা। তিনি ছিলেন- কারণ এটা তাঁর লড়াইও ছিল। রুটি, ন্যায্যতা, সম্মান, এবং জীবিত থাকার অধিকার এই সব কিছুর জন্যই তিনি নেমেছিলেন রাস্তায়।

এ দেশে এখন দাঁড়ানোতেও গুলি লাগে। প্রশ্ন করলেও গুলি লাগে। কিছু না করলেও গুলি লাগে, যদি তুমি গরিব হও, শ্রমিক হও, দলবিহীন হও। গঙ্গা চরনের মৃত্যু সেই নির্মম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে লাশ পড়ে থাকে রাস্তায়, কিন্তু ইতিহাস জেগে ওঠে জনতার হৃদয়ে। জুলাইয়ের বিদ্রোহ ছিল গঙ্গা চরনেরও বিদ্রোহ। একজন সাধারণ মানুষের বুক দিয়ে লেখা অসাধারণ প্রতিবাদের কাহিনি।

এই আন্দোলনের ইতিহাস তাঁকে কখনো ভুলবে না, যেমন করে বাতাস ভুলে না ঝড়ের গর্জন।

যেভাবে শহীদ হন

১৮ জুলাই, ২০২৪। ঢাকার রামপুরা ব্রিজ তখন বিপ্লবের ঝাঁঝে উত্তপ্ত। চারদিকে পুলিশের ঘিরে রাখা রাস্তা, ছাত্রদের মিছিলের গর্জন, আর মাথার ওপরে নির্দয় সন্ধ্যার ছায়া। শহর যেন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে শোষণ, অন্যদিকে প্রতিবাদ। আর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন গঙ্গা চরন রাজবংশী। একজন নিরীহ শ্রমিক, যিনি হয়তো সেদিন বাসা ফিরছিলেন, অথবা থেমে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য, দেখে নিতে কী ঘটে যাচ্ছে তাঁর দেশটাতে।

তাঁর হাতে ছিল না কোনো ব্যানার, মুখে ছিল না কোনো স্লোগান, তবুও গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। হঠাৎ এক এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তে ভেসে যায় রাস্তাটুকু। চারপাশের হাহাকার আর পুলিশের বুটের শব্দ মিলে এক বিভীষিকাময় গর্জনে রূপ নেয়।

তবে মৃত্যু তাঁর জন্য সহজ আসেনি। গঙ্গা চরন লড়েছেন, ১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত টানা ১৮ দিন। এই সময়টা ছিল এক নীরব যুদ্ধক্ষেত্র, আইসিইউর নিঃসঙ্গতা, দেহের প্রতিটি কোষের সঙ্গে লড়াই, রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততা, এবং পরিবারের হতবিহ্বল কান্নার এক নির্মম প্রেক্ষাপট। চিকিৎসা ঠিকভাবে হয়নি, সংবাদমাধ্যম তেমন কিছু বলেনি, পুলিশ তো একবারের জন্যও মুচকি ক্ষমাও চায়নি।

তাঁর সন্তানেরা হাসপাতালের করিডোরে কেবল প্রার্থনা করে গেছে, "আব্বা একটু চোখ মেলে দেখেন, আমরাই আছি।" কিন্তু সাড়া আসেনি। চিকিৎসা ব্যয় চালাতে গিয়ে পরিবার দেউলিয়া। রক্ত

দিলেন প্রতিবেশীরা, ওষুধের পয়সা জোগাতে বন্ধক পড়লো স্ত্রীর সোনার কানের দুল। কিন্তু রাষ্ট্র? রাষ্ট্র ছিল নিঃশব্দ, যেন এ মৃত্যুতে তার কিছু যায় আসে না।

৫ আগস্ট, ২০২৪, একটি শববাহিনী হাসপাতাল ছাড়ে, যেখান থেকে জীবিত কেউ আর ফিরবে না জানে সবাই। কোনো রাষ্ট্রীয় শোক নেই, নেই কোনো প্রতিবাদের ব্যানার, কেবল ছোট করে লেখা, "ড্রাইভার গুলিতে আহত, ১৮ দিন পর মারা যান" সংবাদপত্রের এক কোণে।

পুলিশ এই মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করেনি। মৃত্যুর পরও পরিবারকে লাশ নিয়ে করতে হয় দরজায় দরজায় ঘোরা। থানা নেয়নি, হাসপাতাল চাপ দেয় না বলতে, শেষে কাউন্সিলরের লিখিত অনুমতি নিয়ে পোস্তাগোলা শ্মশানে দাহ করতে হয়। এই মৃত্যু শুধু একটি জীবন থামায়নি, থামিয়েছে আমাদের সভ্যতার মুখোশটাও।

একজন মানুষ যখন রাস্তায় গুলি খায়, ১৮ দিন বাঁচার চেষ্টা করে, আর আমরা কেবল তাকিয়ে থাকি–তখন বুঝতে হয়, বিপ্লব দরকার। এই মৃত্যু কেবল একটি ট্র্যাজেডি নয়, এটি রাষ্ট্রীয় পাপের ক্যানভাসে আঁকা এক অসীম আর্তনাদ। গঙ্গা চরন ছিলেন না কোনো রাজনৈতিক নেতা, ছিলেন না কোনো সংগঠনের মুখপাত্র–তবু তিনি হয়ে ওঠেন বিপ্লবের সলিলচিত্র।

তাঁর মৃত্যুর প্রতিটি মুহূর্ত যেন বলে- "তোমরা চুপ করে থেকো না। কারণ কাল তোমার গায়েও লাগতে পারে সেই গুলি, যেটি আজ গঙ্গা চরনের শরীর ভেদ করে গেছে।"

পরিবার ও বেদনাভরা বাস্তবতা

পরিবার ও বেদনাভরা বাস্তবতা, এই শব্দগুলো যেন মিথ্যে এক মধুরাস, যা গঙ্গা চরন রাজবংশীর পরিবারের কাছে পৌঁছতে পারে না, বা পৌঁছালেও তাতে কিছু পরিবর্তন হয় না। "নাজুক" বলার মাধ্যমে আমরা যেন তাদের করুণ অবস্থার ঠিক মূলে হাত দিতে পারি না, আসলে সত্যিটা সে চেয়ে অনেক গভীর, অনেক ধ্বংসস্তুপের গন্ধ মিশানো। গঙ্গা চরন রাজবংশীর পরিবার আজ অস্তিত্বের খামারে যেন একটা ম্লান আলো হিসেবে টিকে আছে, যা গলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে হতাশা আর দারিদ্র্যর চাপে।

তিনটি ছোট্ট প্রাণ, তাদের চোখে এখন কেবল অন্ধকারের রাজত্ব। বড় ছেলে মিঠু, তরুণ বয়সে কাজের অভাবে হেঁটে বেড়ায় একটি ভিন্ন পৃথিবীর সন্ধানে, যেখানে লাঠির বদলে একটা লেন্স থাকে, যেখানে রুটি থেকে বেশি কিছু জোটে, কিন্তু সে পৃথিবী যেন তাঁর জন্য ছিল না। আর ছোট ছেলে কলেজের ক্লাসরুমে বসে শূন্যতার মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। একটা ভবিষ্যত, যা আজ শুধুই কফিনের স্মৃতির ছায়ায় ঢাকা।

গঙ্গা চরনের ভাই নিশার মুখ থেকে যখন বেরিয়ে আসে সৎকারের স্মৃতি, সেই মুহূর্তে যেন সমস্ত রক্তক্ষরণের ব্যথা মিশে যায় গলায়। থানায় গিয়ে যখন তারা সাহায্যের আশায় হাত বাড়িয়েছিল, তখন পুলিশ তাদের দৃষ্টি ছিল কেবল কাগজের ফাঁকে। ময়নাতদন্তের আদর্শ কথা তো দূরের কথা, সেখানে গঙ্গার রক্তের কোনো হিসাবও নেওয়া হয়নি। কাউন্সিলরের একটি সনদ দিয়েই তারা সৎকার সম্পন্ন করেছে। যা রাষ্ট্রের এক কঠোর ঘোষণা, "আমরা তোমাদের মৃত্যু স্বীকার করি না।"

এই অবহেলা, এই নিঃশব্দ উপেক্ষা যা আজকের সমাজের নিম্নবিত্তের কষ্টের প্রতিচ্ছবি, সেখানে গঙ্গার পরিবার যেন একাকী। চাঁদার কোন দরকার নেই তাদের, প্রতিদানের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু চাই শান্তি, চাই ন্যায়বিচার, চাই সম্মান। একটি প্রাথমিক মানবিক অধিকার, যা রাষ্ট্রকে তাদের দিতে হবে। গঙ্গা চরন ছিলেন কোনো রাজনৈতিক নেতা না, ছিলেন না কোনো দলের মুখ; তিনি ছিলেন জনতার একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর শরীরের গুলির চিহ্ন সেই গল্প বলে দেয়। জনতার রক্তেই লেখা আছে ইতিহাসের সব অধ্যায়, কিন্তু আজ সেই রক্ত মাটির মধ্যে ঝরে যায় অজানায়, অস্বীকৃতিতে। তার সন্তানদের জীবনের ওপর ভর করে এখন রাষ্ট্রের বিবেক। তারা বাঁচবে কি না, তারা পাড়ি দেবে কি না এই অন্ধকারের থেকে, সেটা এখন আমাদের হাতে। সমাজের নীরবতা, রাষ্ট্রের অবহেলা যদি কাটিয়ে ওঠা যায়, তাহলে হয়তো তারা ফের পাবে জীবনের আলো, নয়তো তারা হারিয়ে যাবে আমাদের ভুলে যাওয়া নিকট অতীতে, একটি শোকের ছায়ায়।

এভাবেই নিপদা রাজবংশীর চোখে ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে স্বপ্ন, নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতার মাঝে প্রতিটি দিন কেটে যায় কেবল বেদনার সুরে। পরিবারটির জীবনে আজ শুধু রক্তের স্মৃতি, আর সেই স্মৃতির জ্বালা, যা সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছে, আর আমাদের সভ্যতার প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানবতার শেষ সীমা লণ্ডভণ্ড। এতটাই নিষ্ঠুর এই বাস্তব, যে যেখানে এক মানুষের মৃত্যু আজ হয় অস্বীকৃতির কারণ, সেখানে আমরা সবাই হারিয়ে যাচ্ছি মানবিকতার গ্লানি আর অবহেলার জালে।

প্রস্তাবনা ও শহীদের উত্তরাধিকার

গঙ্গা চরন রাজবংশীর শহীদত্ব যেন কখনো হারিয়ে না যায় গুলির ধোঁয়ার আঁধারে, যেন তার নাম শুধু স্মৃতিপটে নয়, জীবন্ত অনুপ্রেরণার আলো হয়ে জ্বলজ্বল করে থাকে। এই মানুষটির আত্মত্যাগ আমাদের প্রত্যেক দিন সতর্ক করে দেয়। সাধারণ মানুষের জীবন রাষ্ট্রের কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের অস্তিত্বও সমান মূল্যবান, তাদের বেদনা ও স্বপ্নও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাঁর সন্তানেরা যেন অচেনা, অজানার কোণে হারিয়ে না যায়, সেই জন্য জরুরি সরকারি বৃত্তির মাধ্যমে তাঁদের পড়াশোনার পথ সুগম করা। শুধু বইয়ের পাতা নয়, তাদের ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে তারা যেন অনুপ্রাণিত হয়, স্বপ্ন দেখে, এবং নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়।

শহীদ সন্তানের জন্য আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হোক যেন তা হয় রাষ্ট্রের কর্তব্য, ন্যায়ের মুখপাত্র। এই সহায়তা যেন করুণা বা দয়ালু মনোভাবের ফলাফল নয়, বরং জাতির এক শোধপুর্ণ ঋণ, যা আমরা শহীদদের কাছে চুকিয়ে দিতে বাধ্য। কারণ শহীদ মানে শুধুমাত্র মৃত, নয়; শহীদ মানে জীবন্ত ন্যায়বিচারের স্মারক। একটি অনন্ত প্রতিজ্ঞা যা আমাদের সমাজকে শক্ত করে, ভবিষ্যতকে আলোকিত করে। গঙ্গা চরন রাজবংশীর নাম যেন শুধু ইতিহাসের পাতায় গিলে না যায়, বরং প্রতিটি স্কুল, প্রতিটি কোণে তাদের স্মৃতির দীপ জ্বালিয়ে রাখি। যে দীপ আমাদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেয়, যে সাধারণ মানুষের রক্তেই গড়া হয় রাষ্ট্র, আর তাদের মর্যাদা না দিলে রাষ্ট্রের ভিত্তিই হয় দুর্বল। এই প্রস্তাবনা যেন সমাজের হৃদয়ে কড়া নাড়ছে। বলছে, আমরা শহীদের ভুলিনি, ভুলব না। তাদের উত্তরাধিকার আমরা বরণ করি, সম্মান করি এবং আমাদের সব শক্তি দিয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণে কাজ করব। সত্যিই, শহীদরা মারা যান না; তারা আমাদের বিবেকের গভীরে থেকে জীবিত থেকে যায়, একটি জ্বলন্ত বাতি যা সমাজকে তার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়। এখন সময় এসেছে, গঙ্গা চরনের স্মৃতি দিয়ে শুরু করে আমরা সকল শহীদদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করি। কেবল স্মরণ করাই নয়, তাদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করাই হলো আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

পোস্টমর্টেম ছাড়াই সৎকার

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়নি। ফলে তারা রাজবংশীর লাশ পূর্ব বাড্ডায় নিজের এলাকায় নিয়ে যান।

গতকাল শুক্রবার পোস্টমর্টেম ছাড়াই স্বজনরা রাজবংশীর লাশ শ্যামপুর পোস্তগোলা শ্মশানে নিয়ে সৎকার করেন। ভাই নিশা জানান, সৎকারের আগে তারা বাড্ডা থানায় গিঁয়েছিলেন বিষয়টি জানাতে। কিন্তু পুলিশ আমলে নেয়নি। পড়ে তারা স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুমতি ও সনদ নিয়ে লাশের সৎকার করেন।

রাজবংশী ছিলেন তিন সন্তানের বাবা। তার বাবার নাম কানন রাজবংশী। পূর্ব বাড্ডায় তাদের বাড়ি।

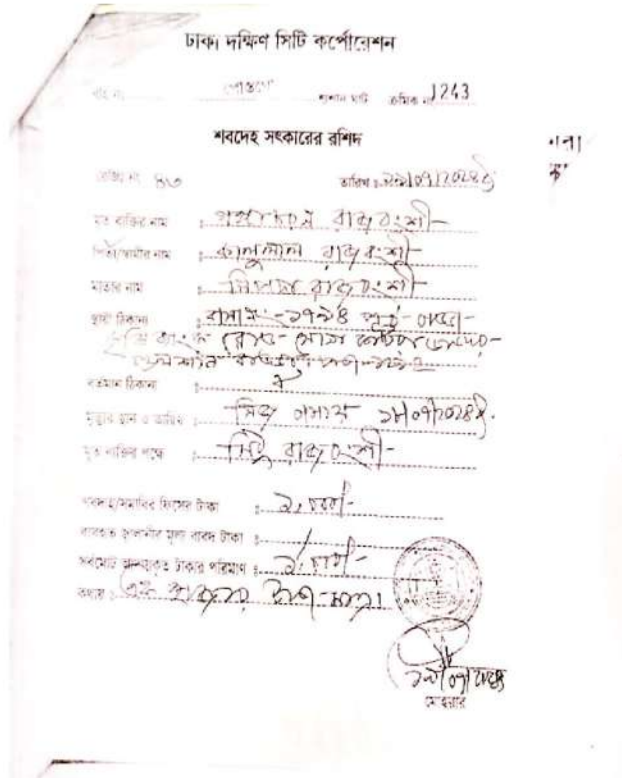
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

শবদেহ সৎকারের রশিদ

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: গঙ্গা চরন রাজবংশী, পেশা: ড্রাইভার
জন্ম তারিখ	: ৮ জুন, ১৯৬৬
পিতা	: কালু লাল রাজবংশী
মাতা	: নিপদা রাজবংশী
পরিবার	: ৩ সন্তান (মিঠু, বিশ্বজিৎ), স্ত্রী নিপদা
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পোস্ট অফিস গলি, বৈঠাখালি, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহতের সময়	: ১৮ জুলাই, ২০২৪, সন্ধ্যা ৭:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ১:৩০টা
মৃত্যুর স্থান	: রামপুরা ব্রীজ, রামপুরা, ঢাকা
দাহস্থল	: পোস্তাগোলা মহাশ্মশান

একনজরে প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।
শহীদের বড় ছেলেকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে।
শহীদের ছোট সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তির আওতায় নেওয়া দরকার।

মিডিয়ায় প্রকাশিত শহীদের নিউজ লিঙ্ক

https://www.facebook.com/share/p/1X6ck4Nqqh/
https://www.newagebd.net/post/country/250366/the-road-home-that-led-to-death

“মা, আমার পেটটা জ্বলতেছে”

শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম

ক্রমিক : ৭৫৬

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৮০

শহীদের পরিচিতি

জন্ম হয়েছিল তাঁর ১৯৯৭ সালের ৬ আগস্ট, যে মাসেই অনেক বছর পর, ২০২৪ সালে, তিনি শহীদ হবেন নিজের জন্মদিনের আগে, রাষ্ট্রীয় গুলির আগুনে। এ যেন পূর্বনির্ধারিত কোনো নিয়তির কাব্যিক নির্মমতা। বাড়ি ছিল বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বড় কোঠা গ্রামে, নদীর ধারে, গরিব মানুষের ঘামে ঘেরা এক সবুজ জনপদ। পিতা চাঁন মিয়া ছিলেন কৃষক, মৃত্তিকার সন্তান, আজ মৃত। মা সালেহা বেগম, এখনও ঢাকার এক বস্তিতে কাজ করেন, মানুষে মানুষে বাসা পাল্টে জীবন টানেন গামছায় জড়িয়ে। বয়স ৬২ পেরিয়েছে, চোখে ছানি জমেছে, কিন্তু কাঁধে এখনো সংসারের বোঝা, পিঠে এখনো জীবনের জরুরি আহ্বান। তাঁর একমাত্র ভাই আল আমিন একটি গ্যারেজে ম্যানেজার, কাজ করেন সকাল-সন্ধ্যার অন্ধকারে। চার বোন রুনা, সুমা, নিপা, শারমিন সবাই কোনো না কোনোভাবে শ্রমবাজারের চোখ এড়িয়ে বেঁচে আছেন গার্মেন্টসে কিংবা গৃহিণীর ভূমিকায়। এ এক সংসার, যেখানে প্রতিটি সদস্য জন্ম থেকেই দায়গ্রস্ত; যেখানে স্বপ্ন মানেই দায়, জীবন মানেই ক্ষয়।

এই সংসারের মধ্যম সন্তান ছিলেন সাইফুল ইসলাম। বাহ্যিকভাবে তিনি ছিলেন একজন গাড়িচালক। তাঁর কর্মজীবনের দৃশ্যপট ছিল ঢাকা শহরের যানজটে ঘেরা রাস্তাগুলি পেছনে স্টিয়ারিং, সামনে রিকশা, প্রাইভেট কার আর বাসের বিকট শব্দ। কিন্তু তার ভিতরে বাস করত এক বিশাল মানুষ একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, যার বিশ্বাস ছিল একদিন নিজের গ্যারেজ খুলবেন, যেখানে শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে দেখা হবে, মজুরিকে মূল্য বলা হবে।

তাঁর সেই স্বপ্ন ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায় ১৯ জুলাই ২০২৪। রামপুরার কাঁচাবাজারের পাশে, যখন আন্দোলন চলছিল চারদিকে, সাইফুল ছিলেন মিছিলে, ব্যানার হাতে। রাষ্ট্রের চোখে তাঁর অপরাধ ছিল অন্যরকম তিনি ছিলেন গরিব, তিনি ছিলেন যুবক, আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন অদৃশ্য শ্রেণির প্রতিনিধি। তাই রাষ্ট্র তাঁকে গুলি করেছিল তলপেটে সেই পেটে, যেটি চালাত একটি পরিবারকে, যেটি গিয়েছিল ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুবার। তাকে নেওয়া হয়েছিল বেটার লাইফ হাসপাতালে। গুলি তখনও পেটে, কিন্তু ডাক্তাররা সেটি বের না করে সেলাই করে দেন তাঁকে, যেন মৃত্যুটা একটু পরিণত হয়, একটু সময় নিয়ে আসে। রাষ্ট্রের এই চিকিৎসাহীন ঘৃণা, এই ঠান্ডা নির্যাতন, এক নবীন বিপ্লবীর মৃত্যুকে শুধু নিশ্চিতই করেনি, সেটিকে করে তুলেছে ধ্বংসাত্মক এক উদাহরণ।

বাসায় ফিরে তিনি ভুগেছেন ১২ ঘণ্টা। প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, চিৎকার করে বলেছেন "আমার পেট পুড়তেছে।" মা'র কোল ভিজেছে তাঁর রক্তে, তার মৃত্যুর হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশীদের ঘরে, গ্রামের বাতাসে, আর শহরের নিঃশব্দ প্রাচীরে।সাইফুল ইসলাম ছিলেন না শুধুই শহীদ। তিনি ছিলেন একটি শ্রেণির কণ্ঠ, এক নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাঁর মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই রাষ্ট্রের মৃত্যুপরোয়ানা শুধু গুলিতে লেখা হয় না, সেটা লেখা হয় হাসপাতালের নিষ্ক্রিয়তায়, মানুষের নির্লিপ্ততায়, আর আমাদের ভয়ভীত মুখে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাস বাঙালির ইতিহাসে এক নতুন জুলাইক্যালেন্ডার, যেখানে প্রতিটি দিন ছিল লাল অক্ষরে লেখা, আর রাত ছিল আগুন ও গুলির নিকষ কালো। কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের আগুন ধরিয়েছিল, তা আর শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ছুঁয়ে থাকেনি। তা ছড়িয়ে পড়ে নীচুতলার মানুষের ঘামঝরা ঘরে, ছিন্নমূলের কান্নায়, রিকশার টায়ারে আর গার্মেন্টসের সেলাই মেশিনে। শহরগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী জ্বলছিল ভেতর থেকে। এই ছিল এক গণজাগরণ, যেখানে "বৈষম্যের অবসান চাই!" ছিল কেবল একটি স্লোগান নয়, ছিল একটি বেঁচে থাকার প্রার্থনা, একটি মরার আগের শেষ আর্তি। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল না কেবল শিক্ষিত ছাত্ররা, ছিল একজন রিকশাওয়ালার ঘামে, একজন গাড়িচালকের ক্লান্ত চোখে, একজন চা-বিক্রেতার পুঁজিহীন পুঁজিতে। সাইফুল ইসলাম ছিলেন তাঁদেরই প্রতিনিধি নামহীন, পদবিহীন, তবু সাহসী। তিনি ছিলেন না কোনও মিছিলের নেতা, তাঁর হাতে ছিল না মাইক্রোফোন, তাঁর

ছবি ছিল না ফেসবুকের হেডলাইনেই, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল রাষ্ট্রের অসাম্য আর অবিচারের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ। আর এই নীরবতা থেকেই রাষ্ট্র ভয় পায় সবচেয়ে বেশি।

১৯ জুলাই, দুপুর আড়াইটায় ঠিক তখন যখন ঢাকার রাস্তায় ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হচ্ছিল পুলিশের জলকামানে, যখন ব্যারিকেডের ভেতর গর্জে উঠছিল জনতার কণ্ঠ, ঠিক তখনই সাইফুল ছিলেন রামপুরা কাঁচাবাজারে, ছিলেন মিছিলের অংশ, কিন্তু রাষ্ট্র কখনো নাম দেখে গুলি চালায় না, রাষ্ট্র দেখে শ্রেণি। গুলিটি তলপেটে ঢুকেছিল সেই পেটে, যা যুগের পর যুগ ধরে গরিবের পরিবারকে আগলে রেখেছে, অভুক্ত থেকে সন্তানকে খাইয়েছে, ভাঙা পাতে ভাত সাজিয়েছে। তাঁকে নেওয়া হয় বেটার লাইফ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে । গুলি বের না করেই, তাঁকে 'সেলাই' করে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বাসায়। এ যেন ডাক্তারি সনদে লেখা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুলি, আরও ঠান্ডা, আরও নিষ্ঠুর। এর নাম চিকিৎসা ছিল না, এর নাম ছিল শ্রেণিবৈষম্যের চিকিৎসাবর্জিত হত্যা। ১২ ঘণ্টা ধরে সাইফুল মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছেন, কাঁপতে কাঁপতে বলে গেছেন, "মা, আমার পেটটা জ্বলতেছে" এমন এক আর্তনাদ, যা রাষ্ট্রের কানে যায় না, সংবাদে আসে না, ইতিহাসে লেখা হয় না।

ভোর ৭টায়, ২০ জুলাই, গাবতলার বাসায়। তিনি মারা যান, মৃত্যুর আগেই রাষ্ট্র তাঁকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছিল। পাশে ছিল মা, ভাই, এবং একটি নীরব সমাজ। যা প্রতিবাদ করতে জানে না, জানে শুধু দেখেও চুপ থাকতে। কিন্তু জানে, এই মৃত্যু শুরু হয়েছিল কাঁচাবাজারের রাস্তায় গুলির আঘাতে, আর শেষ হয়েছিল হাসপাতালে রাষ্ট্রের নির্লিপ্ততায়। এই মৃত্যু কেবল সাইফুল ইসলামের নয়, এ ছিল একটি শ্রেণির মৃত্যু, একটি যুগের প্রতীকী সমাপ্তি। এভাবেই জুলাই বিপ্লব রক্ত দিয়ে লিখে গেছে শহীদদের নাম নয় বরং রাষ্ট্রের মুখোশও।

পরিবারের হাহাকার ও মৃত্যুর পরে নীরব অপমান

শহীদ সাইফুল ইসলাম একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের চালক, যিনি রাষ্ট্রের সকল অবহেলা ও বৈষম্যের প্রতীক হয়ে আজ কবরস্থ। কিন্তু তাঁর মৃত্যু আসেনি হঠাৎ ঝড়ে, এটি ছিল পরিকল্পিত, স্তব্ধ, আর্তনাদ-বিহীন এক নির্মমতা। তাঁর ভাই আল আমিনের জবানিতে ওঠে আসে সে নির্মম সত্য: "ডাক্তাররা গুলি না বের করেই পেট সেলাই করে দিয়ে আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দেন।" এটা কি কেবল চিকিৎসা-ব্যবস্থার ব্যর্থতা? না এটা এক নতুন ধরনের মৃত্যু নির্বাক হত্যার শৈল্পিকতা। রাষ্ট্র যেভাবে গুলি ছোঁড়ে, ঠিক সেভাবেই হাসপাতাল গুলি রেখে দেয় পেটের ভিতরে, যেন জীবন্ত রেখে কষ্টে মরতে দেয় মানুষটিকে। আর সেই কষ্টের রাতটা? একটি শবযাত্রার আগে দীর্ঘ যন্ত্রণার উপাখ্যান। শহীদ সাইফুল তাঁর বাসায় ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি ঘুমাতে পারেন না। চোখ খোলা রেখে ছটফট করেন, থেমে থেমে জিজ্ঞেস করেন, "জল দাও" কিন্তু তাঁর চোখের ভাষা বলে, এ জল নয়, এ দেশ তাকে কিছু দিতে পারবে না। তাঁর মুখে তৃষ্ণা, রক্তে বিষ, আর ঘরে এক সাগর নীরব কান্না। মা সালেহা বেগম চোখে ছানি, হাতে রান্নার পুরনো পোড়া দাগ সেই রাতে কেবল তাকিয়ে ছিলেন ছেলের কষ্টে মোচড় খাওয়া পেটে। আল আমিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার কোণে ভাইয়ের মুখের চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কতটা ব্যথা সহ্য করলে এক গরিব মানুষও বলতে পারে না, "বাঁচাও"।

২০ জুলাই, সকাল ৭টা। রাজধানী ঢাকা তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে রাস্তায় নাস্তার দোকান খুলছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, মেট্রো রেলের কাঁচে ঘাম জমছে। আর তখনই গাবতলার একটি ঘরে থেমে যায় সাইফুলের নিঃশ্বাস। তিনি মারা যান কিন্তু এ মৃত্যু ছিল না 'হৃদরোগে' বা 'রক্তক্ষরণে'। এই মৃত্যু ছিল রাষ্ট্রীয় অবহেলার, শ্রেণিবিভাগের, এবং ক্ষমতালিপ্সু প্রশাসনের হাতে এক পরিকল্পিত নির্মূল। হাসপাতালে গুলি রেখে দেওয়া হয়েছিল যেন মৃত্যুটাও গরিবের ঘরে হয় তাতে যেন জাতির তকমা না লাগে, কোনো দায় না পড়ে কারও ঘাড়ে। লাশ নেওয়া হয় বরিশালের বড় কোঠা গ্রামে। পথে কেউ জিজ্ঞেস করে না, "কে মারা গেছে?" কেউ চিৎকার করে না, "আর কত?" সবাই চুপ। যেন মৃত্যুই নিয়ম, যেন সাইফুলদের জন্য শহর শুধু কর্মস্থল, না ফেরার গলি। তাঁকে কবর দেওয়া হয় মাটির নিচে একটি টুকরো সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে, চোখে কাপড়ের উপর একবিন্দু তেলও না। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদেন মা, আর চার বোন, আর ভাই আল আমিন তাঁরা কাঁদেন না শুধু ছেলের জন্য, কাঁদেন নিজের শ্রেণির চিরস্থায়ী অসহায়ত্বের জন্য।

এই মৃত্যু সংবাদ কোথাও ছাপা হয়নি। কোনো টিভি চ্যানেল বলেনি, "আজ এক গরিব চালক শহীদ হয়েছেন।" কোনো মন্ত্রী ফোন করেনি, কোনো নেতা টুইট করেনি, কোনো পতাকা অর্ধনমিত হয়নি। অথচ এই পরিবার জানে তাদের সাইফুল কেবল একটি চালক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ২০২৪ সালের মুক্তিযুদ্ধের একজন অঘোষিত সৈনিক। তাঁকে কোনো সংগঠন চায়নি, কোনো পোস্টার তাঁকে সম্মান দেয়নি তবু তাঁর পেটের গুলির দাগটি আজও জনতার হৃদয়ে কাটা হয়ে আছে। এই মৃত্যু একা নয়। এটি একটি প্রজন্মের বেদনা, একটি শ্রেণির নীরব হাহাকার এবং একটি প্রশ্নের উত্তর: "আমরা কি গুলি খাওয়ার জন্যই জন্মাই?"

সাইফুল ইসলাম শুধু চালক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি হাইব্রিড রাষ্ট্রের মুখে তুলে ধরা সাধারণ মানুষের সাহস। তিনি গাড়ি চালাতেন, আজ তাঁর মৃত্যুই চালাচ্ছে আমাদের বিবেক। এমন শহীদকে স্মরণে না রাখলে, আমরা কেউই জীবিত নই, শুধু চলমান লাশ।

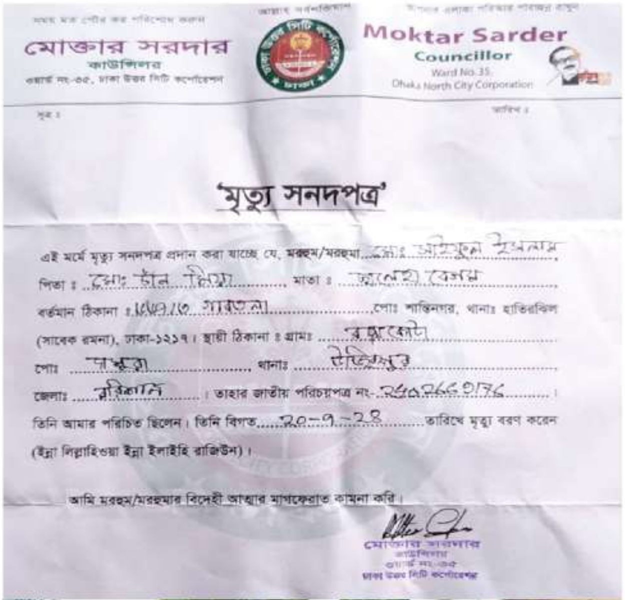

মোক্তার সরদার
কাউন্সিলর
ওয়ার্ড নং-৩৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

Moktar Sarder
Councillor
Ward No.35
Dhaka North City Corporation

সূত্র :

তারিখ :

'মৃত্যু সনদপত্র'

এই মর্মে মৃত্যু সনদপত্র প্রদান করা যাচ্ছে যে, মরহুম/মরহুমা মোঃ সাইফুল ইসলাম
পিতা : মোঃ চাঁন মিয়া মাতা : সালেহা বেগম
বর্তমান ঠিকানা : পোঃ শান্তিনগর, থানাঃ হাতিরঝিল
(সাবেক রমনা), ঢাকা-১২১৭। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রামঃ
পোঃ থানাঃ
জেলাঃ বরিশাল। তাহার জাতীয় পরিচয়পত্র নং-
তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। তিনি বিগত 20-7-24 তারিখে মৃত্যু বরণ করেন
(ইন্না লিল্লাহিওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আমি মরহুম/মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মোক্তার সরদার
কাউন্সিলর
ওয়ার্ড নং-৩৫
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শহীদের পূর্ণনাম : মো: সাইফুল ইসলাম
পেশা ও কর্মপরিচয় : গাড়ি চালক; ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট কারচালক
জন্ম তারিখ ও স্থান : ০৬ আগস্ট, ১৯৯৭; জন্মস্থান: বরিশাল
বয়স (শাহাদাতের সময়) : ২৬ বছর
পিতার নাম : মৃত মোঃ চাঁন মিয়া
মাতার নাম, বয়স ও পেশা : ছালেহা বেগম, বয়স: ৬২ বছর; পেশা: গৃহকর্মী
ভাইবোন : মোট ৫ জন (ভাই ১ জন, বোন ৪ জন)
ভাই: মো: আল আমিন (বয়স ২৮), পেশা: সিএনজি গ্যারেজ ম্যানেজার
বোন: রুনা বেগম (বয়স ৩৮), পেশা: গৃহিণী (বিবাহিত)
বোন: সুমা বেগম (বয়স ৩৭), পেশা: গৃহিণী (বিবাহিত)
বোন: নিপা বেগম (বয়স ৩১), পেশা: গার্মেন্টস কর্মী
বোন: শারমিন আকতার (বয়স ৩৩), পেশা: গৃহিণী (বিবাহিত)
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: বড় কোঠা, ডাকঘর: ধামুরা, ওয়ার্ড নং-০২, ইউনিয়ন: উত্তর বড় কোঠা, থানা/উপজেলা: উজিরপুর, জেলা: বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা (ঢাকায়) : বাসা নং-৬৬৭/৩, জাহাবক্স লেন, মগবাজার/গাবতলা (সাবেক রমনা), থানা-হাতিরঝিল (কাউন্সিলর সনদ ও জন্ম সনদ অনুযায়ী রমনা/মগবাজার), ঢাকা-১২১৭। (ওয়ার্ড নং-৩৫)
আহত হওয়ার স্থান : রামপুরা কাঁচা বাজার এলাকা, ঢাকা
আহত হওয়ার তারিখ ও সময় : ১৯ জুলাই, ২০২৪ (শুক্রবার), দুপুর ২:৩০ মিনিট।
আহত হওয়ার বিবরণ ও চিকিৎসা : জুমার নামাজের পর রামপুরা কাঁচা বাজার এলাকায় তলপেটে গুলিবিদ্ধ হন। বন্ধুদের সহায়তায় তাকে বেটার লাইফ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে (ভাইয়ের ভাষ্যমতে, পেটের ভেতর গুলি রেখেই সেলাই করে) বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
মৃত্যুর কারণ (বর্ণনা অনুযায়ী) : পেটে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর তিনি তীব্র যন্ত্রণায় ভুগতে থাকেন এবং পরদিন সকালে মৃত্যুবরণ করেন
আঘাতকারী : পুলিশ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান : ২০ জুলাই, ২০২৪, শনিবার, সকাল ৭:০০ টায়; ৬৬৭/৩, জাহাবক্স লেন, মগবাজার, ঢাকা)
দাফন/কবরের অবস্থান : নিজ গ্রাম (বড় কোঠা, উজিরপুর, বরিশাল)

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের জন্য এককালীন ক্ষতিপূরণ ও মাসিক ভাতা
২. মা সালেহা বেগমের জীবনসীমার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা
৩. শহীদের বড় ভাই আল আমিনের চাকরির ব্যবস্থা বা সরকারি সহায়তা প্রদান কড়া যেতে পারে

শহীদ মোহাম্মদ কালাম

ক্রমিক : ৭৫৭

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৬৩

মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় নৃশংসতায় নিজেই হারিয়ে গেলেন

শহীদের পরিচিতি

মোহাম্মদ কালাম, চায়ের কাপে যেন জ্বলন্ত বিপ্লব

কোনো কোনো নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় না, তা লেখা হয় রক্তে, চোখের জলে, আর নিঃশব্দ প্রতীক্ষার গভীর দীর্ঘশ্বাসে। মোহাম্মদ কালাম ছিলেন এমনই এক নামহীন বীর একজন রাস্তার চা-ওয়ালা, যাঁর গলা দিয়ে বেরোনো 'চা লাগবে ভাই?' এই প্রশ্নে জেগে উঠত শহরের ক্লান্ত মানুষ, অফিস ফেরত শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, কিংবা বিপ্লব-ভাসা ছাত্র। খুলনার খালিশপুর থেকে উঠে এসে ঢাকার মিরপুর-১০ এলাকায় তাঁর ঠাঁই, যেখানে তিনি প্রতিদিন সকাল বিকেল রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ গরম রাখতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গরম রাখতেন দেশের ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

দাবি আদায়ে একাট্টা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

দোসর কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বঞ্চনার বিচার করতে হবে

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির পদত্যাগ

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জয়

আন্দোলন সামলাতে ভুল পদক্ষেপ নেয় আ.লীগ সরকার

'আয়নাঘর'র হোতা কাজী মনিরের বরখাস্ত চান ছাত্ররা

জবি প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বৈঠক

কোটা সংস্কার আন্দোলন

মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ হারান কালাম

তাঁর বাবা প্রয়াত, মা আবেদা খাতুন আজো গাল ঢাকা ওড়নায় ছেলের গন্ধ খোঁজেন। স্ত্রী মোছা. সিতারা (৫২) যাঁর মুখে আজ কথা নেই, শুধু স্তব্ধতা। তাঁদের সংসার ছিল সরল, সংকুচিত, কিন্তু ভালোবাসায় পূর্ণ। চার কন্যা শারমিন (৩৭), পারভিন (৩৩), ইয়াসমিন (৩০), আর ছোট চাঁদনী (২০) চাঁদনিই ছিলেন বাবার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্বপ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কল্পনা নিয়ে চাঁদনির চোখে যেমন আলো ছিল, তেমনি ছিল কালামের চোখে দৃপ্ত অহংকার। তিনি বলতেন, "গরিবের মেয়েও ডাক্তার হতে পারে, যদি মন জাগে।"

কিন্তু রাষ্ট্র কখনোই চায় না গরিবের ঘরে স্বপ্ন জন্ম নিক। তারা চায়, স্বপ্ন থাকুক শুধু বিত্তবানদের ওয়ার্ডরোবের মধ্যে ভাঁজ করে রাখা দামি কোটের পকেটে। চা-ওয়ালার ঘরে উচ্চশিক্ষার গল্প তাদের কাছে বিদ্রোহ মনে হয়। তাই যখন কোটা সংস্কার আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ এসে পড়ে শহরের রাস্তায়, তখন কালাম আর শুধু চা বিক্রেতা ছিলেন না তিনি হয়ে ওঠেন আন্দোলনের অবিচল এক চিহ্ন। তিনি ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান, শুধু চা দিয়ে নয়, সাহস দিয়ে। গরম কাপ হাতে তুলে দিয়ে বলতেন, "নাও ভাই, আগুন লাগাও রক্তে।"

৩ আগস্ট ২০২৪ তপ্ত দুপুর, গোলাগুলির ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও কালাম মিরপুরে ছাত্রদের চা দিচ্ছেন। গুলির শব্দে থেমে গিয়েছিল অনেকের বুকের ধুকপুকুনি, কিন্তু তাঁর হাত কাঁপে না। তিনি ছিলেন না নেতা, না কোনো বক্তা কিন্তু তাঁর কর্মই ছিল অগ্নিমন্ত্র। যখন হঠাৎ একটি গুলি ছিন্ন করে দেয় তাঁর বুক, তখন চায়ের কাপ পড়ে যায় ধুলোয়, আর এক অমর প্রতীক জন্ম নেয়।

কালাম আজ আর চা বিক্রি করেন না তিনি বিক্রি করে গেছেন নিজের জীবন, স্বপ্ন, সন্তানদের ভবিষ্যৎ, যেন কোনো এক মহাবিপ্লবের প্রথম কবিতায় নিজের নাম লিখে দিতে পারেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের চোখে জল আনে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আমাদের অন্তরে রক্ত জাগায় কারণ চায়ের কাপ থেকে এই যে আগুন জ্বলে উঠেছে, তা নিভে যাবে না কোনো রাষ্ট্রীয় জল দিয়ে।

মোহাম্মদ কালামের নাম আজো অনেকে জানে না, কিন্তু এই বিপ্লব এই জুলাই রক্তপাতের ভোর তাঁর মতো মানুষেরাই লিখেছেন, যাঁরা বক্তৃতা দিতে জানতেন না, কিন্তু চুপচাপ নিজের জীবন রেখে গেছেন স্বাধীনতার বেদীতে। তাই বলি, শহীদ মোহাম্মদ কালাম শুধু চা-ওয়ালা নন, তিনি ছিলেন আমাদের বিবেকের অগ্নিস্নানে প্রথম গৃহস্থ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: চাঁদনির বাবার পথচলা এবং রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ জ্বলছিল, শুধু দাবিতে নয় মনের মধ্যে, রক্তে, কথায়, কল্পনায়। এই আগুন কোনো রাজনীতিবিদ জ্বালায়নি, কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাপা হয়নি কাগজে। এই আগুন এসেছিল মানুষের ভেতর থেকে, এক পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর অপ্রাপ্তির আর্তনাদ থেকে, যেখানে স্বপ্নগুলো ছেঁড়া রেজাল্ট কার্ডের মতো উড়ছিল রাস্তায় রাস্তায়। কোটা সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও, এই আন্দোলনের মর্মে ছিল এক গভীর চেতনাবোধ মানবিকতার, ন্যায়ের, আর রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধের। যাঁরা মিছিলে নামছিলেন, তাঁদের হাতে লাঠি ছিল না, কিন্তু শব্দ ছিল আগুনে পোড়া। চোখে জল থাকলেও সেই জলে ছিল প্রতিরোধের প্রতিফলন। সেই সময়, সেই দিনগুলো ছিল যেন এক ছিন্নমূল ভবিষ্যতের পুনর্জন্ম। ১৯ জুলাই, শুক্রবার। জুমার নামাজের ঠিক পরে মিরপুর-১০ এলাকা পরিণত হয় এক বিপ্লবী ক্ষেত্রভূমিতে। চারপাশে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, ককটেলের বিস্ফোরণ, আগুন আর পুলিশের বুটের শব্দে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। ছাত্ররা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল নির্ভীকভাবে। সেই ছাত্রদের ভিড়ে ছিলেন চাঁদনী আক্তার একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখা মেয়ে, শহীদ মোহাম্মদ কালামের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। বাবা জানতেন মেয়ের ইচ্ছা ডাক্তার হওয়ার, কিন্তু হয়তো তিনি কখনো ভাবেননি যে এই ইচ্ছার জন্য মেয়েকে একদিন রাজপথে দাঁড়াতে হবে।

যখন তাঁর কানে আসে, "চাঁদনী মিছিলে নেমেছে" তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারেননি। সেই মুহূর্তে মোহাম্মদ

কালাম ছিলেন না আর শুধু একজন চা বিক্রেতা, তিনি হয়ে ওঠেন এক উদ্বিগ্ন পিতা, এক আশঙ্কায় দগ্ধ হৃদয়। কোন রাজনীতি, কোন বিপ্লব, কোন কোটার ধারা সে মুহূর্তে তাঁর কাছে সব ছিল গৌণ। তিনি শুধু জানতেন মেয়ে রাজপথে গেছে, এবং চারদিকে গুলি, গ্যাস, দাহ্য বারুদের গন্ধ।

চায়ের কাপ ফেলে দিয়ে, রাস্তার মোড় পেরিয়ে তিনি ছুটে যান মেয়ের খোঁজে। মানুষের কাঁধে চেপে ওঠা এক সাধারণ অভিভাবক, যার বুকের ভেতর ছিল একটাই প্রশ্ন "চাঁদনী কোথায়?" তিনি কারও বিরুদ্ধে যাননি, কোনো দল কিংবা পতাকা নিয়ে আসেননি, তাঁর হাতে ছিল না কোন অস্ত্র তাঁর হাত খালি, কিন্তু হৃদয় ছিল ভালোবাসায় পূর্ণ। রাষ্ট্র এই ভালোবাসাকেই ভয় পায়। কারণ, রাষ্ট্র জানে, এমন এক পিতা যে নিজের জীবন দিয়ে মেয়েকে খুঁজতে রাজপথে নেমে আসে, সে কোনো রাজনীতির সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না।

তাই তারা গুলি চালায়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে, সমাজের শৃঙ্খলার নামে, তারা গুলি ছোঁড়ে একজন পিতার ভালোবাসার দিকে। চা-ওয়ালার বুকে গুলি করে তারা ঘোষণা করে দেয় "স্বপ্ন দেখা যাবে না, ভালোবাসা দেখানো যাবে না, প্রতিবাদ করা যাবে না।"

কিন্তু তারা জানে না, সেই গুলির শব্দ একদিন ইতিহাসের পাতা ফেঁড়ে বেরিয়ে আসবে। মোহাম্মদ কালাম পড়ে যান, কিন্তু মাটি তাঁকে ধরে রাখে না চুপচাপ। সেই মাটি আজো কাঁপে চাঁদনির কান্নায়, ছাত্রদের শপথে, আর জুলাই বিপ্লবের ঝলকে যেখানে একজন পিতার মৃতদেহ হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার নতুন ব্যাখ্যা।

যেভাবে শহীদ হন: রক্তের নিচে চাপা পড়ে থাকা এক অসীম পিতার নাম, মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশন সেদিন ছিল না কোনো যাত্রী, ছিল না কোনো গন্তব্য, শুধু ছিল এক অদৃশ্য মৃত্যুমঞ্চ। গরমে ঘামছিল শহর, কিন্তু রক্তে পুড়ছিল মানুষ। দুপুর আনুমানিক ২টা জুমার নামাজ শেষ হয়েছে, অথচ শহরের বাতাসে আজান নয়, শোনা যাচ্ছিল টিয়ার গ্যাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ, পুলিশের বুটের ঠকঠক, আর শাসকের ভয় পেয়ে গলা চেপে রাখা মিডিয়ার নীরবতা। চারদিকে এক অদ্ভুত শূন্যতা, যার মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোহাম্মদ কালাম একজন চা-ওয়ালা, একজন পিতা, যিনি মেয়ে খুঁজতে এসেছিলেন, অস্থির হয়ে, চোখভর্তি ভয় আর ভালোবাসা নিয়ে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the Peoples' Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ কালাম
Name: Md. Kalam
পিতা: মৃত মোঃ খলিল
মাতা: মৃত আবেদা খাতুন
Date of Birth: 21 Jan 1963
ID NO: 4794510350444

চাঁদনী আন্দোলনে ছিল পায়ের নিচে ফুটপাথ, কাঁধে জাতীয় পতাকার শাল, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু সে জানত না, ঠিক তার পেছনে হাঁটছেন তার বাবা, কোল থেকে নামিয়ে বড় করা মানুষটি। কালাম ছিলেন না কোনো সংগঠনের প্রতিনিধি, তাঁর নামে ছাপা হয়নি কোনো ব্যানার, কিন্তু তিনি এসেছিলেন ইতিহাসের গভীরতম হৃদয়ভূমি থেকে এক পিতার উদ্বিগ্ন ভালবাসা থেকে।

হঠাৎ করেই শুরু হয় গোলাগুলি। স্লোগানের মধ্যেই হানা দেয় শাসনের গর্জন। মিছিলে ছিল হাজারো স্বর, কিন্তু গুলি চিনে নেয় কাকে থামাতে হবে। কালাম তাকিয়েছিলেন মেয়ের দিকে, কিন্তু মেয়ের চোখ তাঁর ছিল না তখনো চাঁদনী জানত না, তাঁর পিতা তাঁর পেছনে আছেন।

প্রথম গুলি আঘাত হানে তাঁর বাম হাতে, দ্বিতীয়টি একই হাতে, আর তৃতীয় গুলি তাঁর বুক বিদ্ধ করে। কফিন তৈরি হয় চোখের পলকে এক কাপ চা বিক্রেতার শরীরে, যে মানুষদের জাগিয়ে রাখতেন প্রতিদিন সকালে, এখন নিজেই ঢলে পড়লেন চিরনিদ্রায়। মৃত্যু হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই না কোনো অ্যাম্বুলেন্স, না কেউ ছুটে আসা, শুধু ধুলোমাখা রাস্তায় পড়ে থাকা একটি নিথর দেহ, যার শরীরে তখনও গরম রক্ত টসটস করে গড়িয়ে পড়ছিল।

চাঁদনী তখনো জানত না তার পিতার গা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে জীবন। সন্ধ্যায় যখন পরিবার খুঁজতে শুরু করে, তখন জানতে পারে লাশ পড়ে আছে আজমল হাসপাতালে। কিন্তু তখন শহর জুড়ে কারফিউ, কেউ বের হতে পারছে না, হাসপাতালও রাজি নয় লাশ রাখতে মৃতদেহের উপরও যেন শাসকের ঘৃণা। রাষ্ট্র তখন চোখ বন্ধ করে, যেন এমন কিছু ঘটেনি।

একজন চা বিক্রেতা, যিনি প্রতিদিন মানুষকে জাগিয়ে রাখতেন গরম চায়ের কাপে, তাঁরই লাশ রাখা যায় না জীবনের কোনো কোণে। তাঁর মৃত্যু নেই কোনো খবরে, নেই কোনো ব্যানারে, নেই প্রেসক্লাবে মোমবাতির মিছিল। কিন্তু তাঁর রক্ত লেগে আছে আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি দেওয়ালে যেখানে কোনো মা সন্তান হারায়, কোনো মেয়ে বাবার পায়ের আওয়াজ শুনে আর দরজা খোলে না।

মোহাম্মদ কালাম ছিলেন 'নামহীন' শহীদ, কিন্তু ইতিহাস তাঁর নাম জানে। এই মৃত্যুই আমাদের দায়মুক্তি হীন নিঃশ্বাসের নিচে লুকিয়ে থাকা ক্ষোভের আগুন। তাঁর রক্তের দাগ এখনো মিরপুর-১০ এর ইটের মাঝে, এবং প্রতিবার যখন কেউ বলে, "আমার বাবাও একদিন ছিল," তখনই সেই রক্ত আবার জেগে ওঠে। এই মৃত্যু কোনো 'নিউজ ফ্ল্যাশ' নয়, এটি এক জাতির স্থায়ী ব্যর্থতা।

পরিবারের বাস্তবতা ও অনুতাপের আখ্যান: এক নিঃশব্দ কান্নার দীর্ঘ প্রতিধ্বনি সিতারা বেগম একটি নাম, যা আজ দাঁড়িয়ে আছে শূন্যতার পাহাড় ঘেঁষে। এক সময় যিনি ছিলেন স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘরের অন্দরমহলের গৃহিণী, এখন তিনিই এই পরিবারের মাথা, রুটি-রুজির শেষ ভরসা যদিও হাতে নেই কোনো উপায়, কাঁধে নেই কোনো শক্তি, আর চোখে নেই সেই পুরোনো আলো। মোহাম্মদ কালামের মৃত্যু শুধু একজন স্বামীকে হারানো নয়, বরং একটি পুরো আকাশ ভেঙে পড়ার গল্প। এখন চার মেয়ের মধ্যে তিনজনের বিয়ে হয়েছে, তারা নিজের সংসারে ব্যস্ত, আর যিনি রয়ে গেছেন সে চাঁদনী, সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে প্রিয়, বাবার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন আজ তিনিই লড়ছেন প্রতিটি নিঃশ্বাস ধরে রাখতে।

চাঁদনী এখনো বাবার ব্যবহৃত পুরোনো চায়ের কেটলিটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। প্রতিদিন সকালে সেই কেটলির পাশে বসে, চোখে পানি নিয়ে বলে ওঠে, "আব্বু, তুমি আজ থাকলে কী হতো?" কখনো উত্তর আসে না কেবল দেয়ালের ফাটলে জমে থাকা রোদ আর এক টুকরো নির্জনতা তাকে জবাব দেয়। তার মনে হয়, বাবা তার জন্যই মরেছেন। সে ভাবে, "আমি না গেলে, তিনি তো আসতেন না" এই অপরাধবোধ, এই না-পারার কষ্ট প্রতিদিন তাকে গিলে খায়, নিঃশব্দে। অথচ বাস্তবতা জানে, কালাম কোনো নেতা ছিলেন না, কোনো রাজনৈতিক চালচিত্রে আবদ্ধ যোদ্ধা নন। তিনি ছিলেন একজন বাবা ভালোবাসার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত একজন নিরীহ পিতা।

আজ এই পরিবারে নেই কোনো আয়ের পথ, নেই সহায়তার কেউ, নেই ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি। কেবল আছে স্মৃতি, আছে অভাব, আর আছে রাষ্ট্রের ভ্রুক্ষেপহীন অবজ্ঞা। চাঁদনির চোখে যে আলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার, আজ তা নিভু নিভু প্রদীপ। একটু হাওয়ায় যেন নেভে যেতে পারে। অথচ এই পরিবার কিছু চায় না না অর্থ, না করুণা, না মিডিয়ার ফুটেজ। তারা শুধু চায়, বাবার মৃত্যু যেন অর্থহীন না হয়।

চাঁদনী আজও কোনো প্রগতিশীল বক্তৃতা দেয় না, দেয় না কোনো রাজনৈতিক শ্লোগান। সে শুধু চায়, কেউ যেন তার পড়ালেখার দায়িত্ব নেয়। কেউ যেন বলে, "তোমার বাবার মৃত্যু ছিল এই রাষ্ট্রের বিবেকের জাগরণ।" কিন্তু রাষ্ট্র তো ঘুমিয়ে আছে, এতটাই গভীর ঘুম যে একজন শহীদের পরিবারের আর্তনাদও তার কানে পৌঁছায় না।

কালাম কখনো কিছু দাবি করেননি। তিনি শুধু দিয়েছেন চা, হাসি, ভালোবাসা। আর একদিন সেই ভালোবাসার খাতিরেই তিনি দিয়ে দিলেন নিজের প্রাণ। এখন এই পরিবার শুধু চায়, যেন সেই মৃত্যু একটি মেয়ে মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা হয়ে দাঁড়ায়। যেন একজন বাবার ভালোবাসা রাষ্ট্রের নির্লজ্জ চুপিকে ভেদ করে আলো হয়ে জ্বলে ওঠে।

এখন চাঁদনির দিন কাটে বাবার ছবির পাশে বসে, রাত কাটে স্বপ্নে বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে। সিতারা বেগম প্রতিদিন অপেক্ষা করেন কোনো সংবাদ, কোনো মানুষ, কোনো আলো আসবে বুঝি। কিন্তু কেউ আসে না। একা একা ঘরটায় জমে ওঠে ব্যথা, যা রাষ্ট্রের অজুহাত দিয়ে মোছা যায় না। এই একাকীত্বই হলো এই পরিবারের একমাত্র অবশিষ্টতা এবং এই নিঃসঙ্গতা আমাদের জাতিগত অপরাধের জীবন্ত সাক্ষী।

মোহাম্মদ কালাম যিনি কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন না, ছিলেন এক পিতা, এক প্রেমিক, এক চা বিক্রেতা। তাঁর মৃত্যু আজ একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলার ডাক হয়ে বেঁচে থাকবে, যতদিন কেউ "আব্বু" বলে দরজা খুলে দাঁড়াবে আর ভেতরে কেউ থাকবে না।

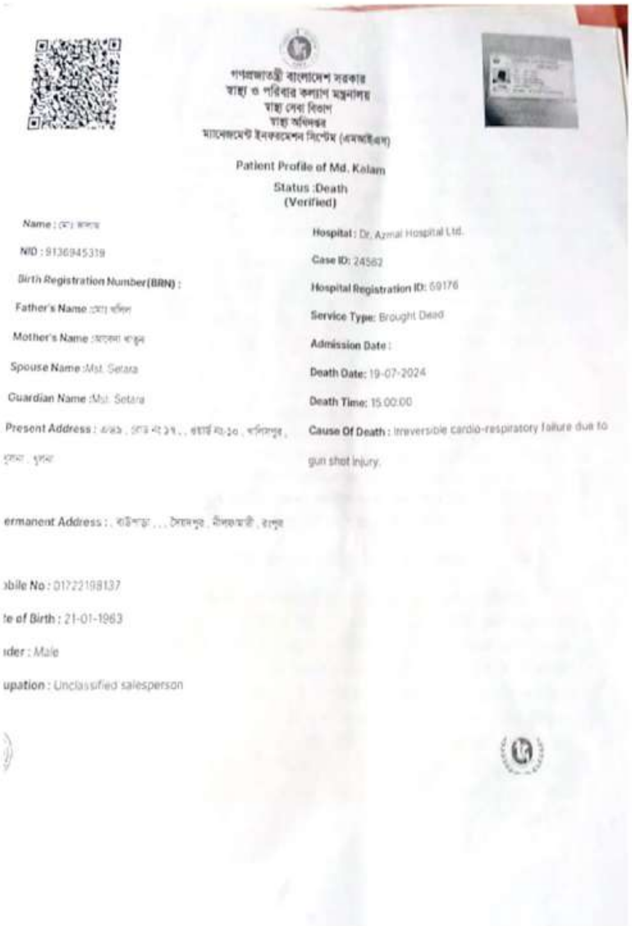

Patient Profile of Md. Kalam
Status :Death
(Verified)

Name :
NID : 9136945319
Birth Registration Number(BRN) :
Father's Name :
Mother's Name :
Spouse Name :Mst. Setara
Guardian Name :Mst. Setara
Present Address :
Permanent Address :
Mobile No : 01722198137
Date of Birth : 21-01-1963
Gender : Male
Occupation : Unclassified salesperson

Hospital : Dr. Azmal Hospital Ltd.
Case ID: 24562
Hospital Registration ID: 69176
Service Type: Brought Dead
Admission Date :
Death Date: 19-07-2024
Death Time: 15:00:00
Cause Of Death : Irreversible cardio-respiratory failure due to gun shot injury.

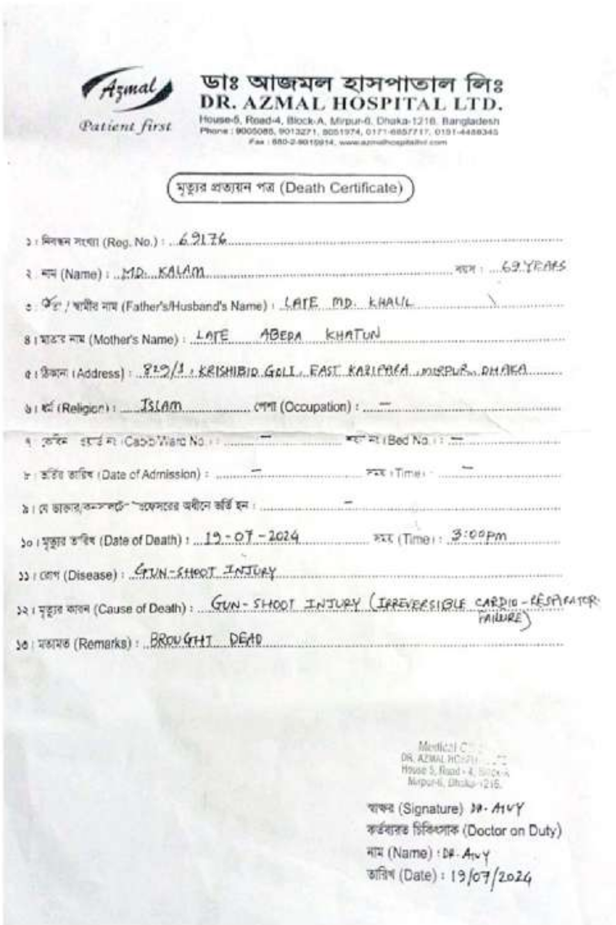

ডাঃ আজমল হাসপাতাল লিঃ
DR. AZMAL HOSPITAL LTD.
Patient first
House-5, Road-4, Block-A, Mirpur-6, Dhaka-1216, Bangladesh

মৃত্যুর প্রত্যয়ন পত্র (Death Certificate)

১। নিবন্ধন সংখ্যা (Reg. No.) : 69176
২। নাম (Name) : MD. KALAM বয়স : 69 YEARS
৩। পিতা / স্বামীর নাম (Father's/Husband's Name) : LATE MD. KHALIL
৪। মাতার নাম (Mother's Name) : LATE ABEDA KHATUN
৫। ঠিকানা (Address) : 829/1, KRISHIBID GOLI, EAST KAZIPARA, MIRPUR, DHAKA
৬। ধর্ম (Religion) : ISLAM পেশা (Occupation) : —
৭। কেবিন / ওয়ার্ড নং (Cabin/Ward No.) : — বেড নং (Bed No.) : —
৮। ভর্তির তারিখ (Date of Admission) : — সময় (Time) : —
৯। যে ডাক্তার/কনসালটেন্ট প্রফেসরের অধীনে ভর্তি হন : —
১০। মৃত্যুর তারিখ (Date of Death) : 19-07-2024 সময় (Time) : 3:00pm
১১। রোগ (Disease) : GUN-SHOOT INJURY
১২। মৃত্যুর কারণ (Cause of Death) : GUN-SHOOT INJURY (IRREVERSIBLE CARDIO-RESPIRATORY FAILURE)
১৩। মতামত (Remarks) : BROUGHT DEAD

স্বাক্ষর (Signature)
কর্তব্যরত চিকিৎসক (Doctor on Duty)
নাম (Name) : Dr. Aivy
তারিখ (Date) : 19/07/2024

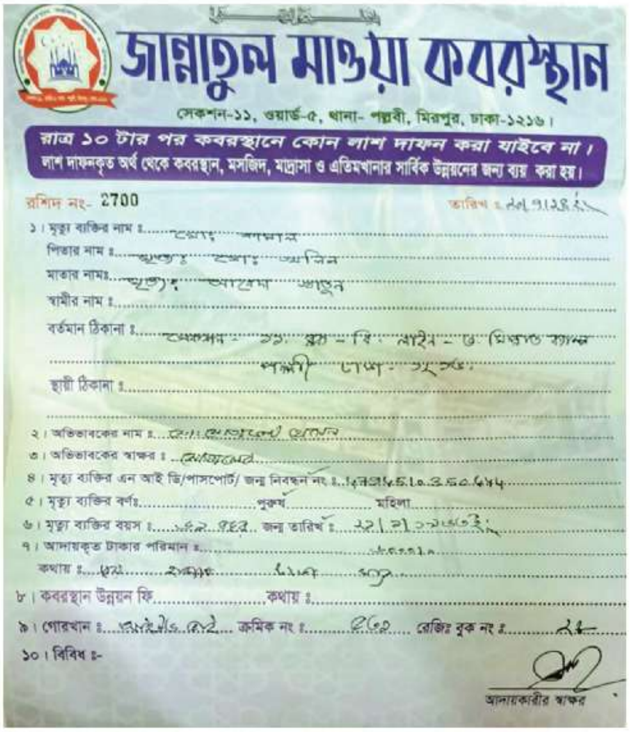

জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থান

সেকশন-১১, ওয়ার্ড-৫, থানা- পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

রাত্র ১০ টার পর কবরস্থানে কোন লাশ দাফন করা যাইবে না।
লাশ দাফনকৃত অর্থ থেকে কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়।

রশিদ নং- 2700 তারিখ :

১। মৃত্যু ব্যক্তির নাম : মোঃ কালাম
পিতার নাম :
মাতার নাম:
স্বামীর নাম :
বর্তমান ঠিকানা :
স্থায়ী ঠিকানা :
২। অভিভাবকের নাম :
৩। অভিভাবকের স্বাক্ষর :
৪। মৃত্যু ব্যক্তির এন আই ডি/পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন নং :
৫। মৃত্যু ব্যক্তির বর্ণ: পুরুষ মহিলা
৬। মৃত্যু ব্যক্তির বয়স : জন্ম তারিখ :
৭। আদায়কৃত টাকার পরিমান :
কথায় :
৮। কবরস্থান উন্নয়ন ফি কথায় :
৯। গোরখান : ক্রমিক নং : রেজিঃ বুক নং :
১০। বিবিধ :-

আদায়কারীর স্বাক্ষর

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: কালাম
পেশা	: চা বিক্রেতা
জন্ম	: ২১ জানুয়ারি ১৯৬৩
পিতা	: মৃত খলিল
মাতা	: মৃত আবেদা খাতুন
স্ত্রীর	: মোছা. সিতারা (বয়স ৫২, পেশা গৃহিণী)
সন্তান	: চার মেয়ে-শারমিন আকতার (৩৭, গৃহিণী), পারভিন খাতুন (৩৩, গৃহিণী), ইয়াসমিন (৩০, গৃহিণী) চাঁদনী আক্তার (২০, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু)
স্থায়ী ঠিকানা	: বাউপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী, রংপুর (যাতায়ত সীমিত)
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পোস্ট অফিস গলি, বৈঠাখালি, মধ্য বাড্ডা, উপজেলা: বাড্ডা, জেলা: ঢাকা (শাহাদাতের পূর্বে) এ/৪৯, রোড-১৭, ওয়ার্ড- ১০, খালিসপুর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা (শহীদ পরিবারের বর্তমান অবস্থান)
ঘটনার স্থান	: মিরপুর-১০, ঢাকা
আঘাতকারী	: পুলিশ
আঘাতের সময়	: স্পট ডেথ (ঘটনাস্থলেই মৃত্যু)
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, দুপুর ২টা
মৃত্যু পরবর্তী স্থান	: আজমল হাসপাতাল, মিরপুর-১০
কবরের বর্তমান অবস্থান	: জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থান, মিরপুর-১০

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে

প্রথমত, ছোট মেয়ে চাঁদনী আক্তারের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ
দ্বিতীয়ত, সিতারা বেগমের জন্য স্থায়ী বাসস্থান ও মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

ইতালির স্বপ্ন ছেড়ে শহীদের গর্ব নিয়ে চলে গেলেন চিরদিনের প্রবাসে

-শহীদ মোহাম্মদ সিফাত হোসেন

শহীদ মোহাম্মদ সিফাত হোসেন

ক্রমিক : ৭৫৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৫১

শহীদ পরিচিতি

সিফাত হোসেন। একটি নাম, একটি গল্প, একটি অসমাপ্ত দেশ। মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার রমজানপুর ইউনিয়নের ছোট্ট এক গ্রাম। সেই কাঁচা পথের ধারে জন্ম নেওয়া এক ছেলেটি বড় হচ্ছিল স্বপ্ন বুকে বেঁধে। বাবা মোহাম্মদ কামাল হাওলাদার ছিলেন স্যানিটারি মিস্ত্রি হাতে হাতুড়ি, মাথায় দায়ভার। মা পারভিন বেগম গৃহিণী দিনভর সংসারের চাকা ঘোরান যেভাবে নদী বইতে জানে শোক সহ্য করে। তিন ভাইবোনের সংসারে সিফাত ছিলেন সবচেয়ে বড়। ঠিক বড় ভাইয়ের মতোই ছায়া হয়ে থাকতেন দুই ভাইবোনের উপরে। ভাই রিফাত তখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী, বোন জান্নাত ক্লাস নাইনে। সিফাতের জীবন ছিল যেন সংসারের একটা নীরব প্রতিশ্রুতি যে ছেলেটা পড়েছিল বাংলা কলেজে, পেরিয়েছে ইন্টারমিডিয়েট, কিন্তু গরিবের ঘরে বইয়ের পাতায় জীবন থেমে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু মনের জানালা কখনো বন্ধ হয়নি। যখন ক্লাসরুম দেওয়া যায় না, তখন মানুষ বেছে নেয় পৃথিবীকে। তাই তিন বছর সৌদি আরবে কাটিয়ে ফিরে এসেছিলেন দেশে কোনো অপরাধে নয়, একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁর স্বপ্ন দেখা। সেদিন তাঁর পকেটে ছিল ইতালির ভিসা, হাতে ছিল ২৫ জুলাইয়ের টিকিট। ইউরোপের এক নতুন জীবনের পথে পা রাখার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই, ২০ জুলাই মাত্র পাঁচদিন আগে একটি বুলেট থামিয়ে দেয় সব। মাথায় গুলি লাগে মিরপুরের উত্তপ্ত ছায়ায়। দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক এক ঝলকে ছিন্ন হয়ে যায়। ইতালির স্বপ্নের কবর হয় আজিমপুরে।

তার ঠিকানা ছিল ১০২/১, সেনপাড়া, মিরপুর একটি ভাড়াবাড়ি, যেখানে দেয়ালে লেগে থাকে শ্রমিকের ঘাম, ছাদে জমে থাকে সংসারের হিসেব। সেই বাড়িতে এখন শুধু অনুপস্থিতি। বাবার কণ্ঠে কান্না জমে থাকে, যেন প্রতিদিন একটা শোকসভা হয় ভোরের আজানে। মা নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন ছেলের খালি বিছানায় তাঁর কান্না শোনে না রাষ্ট্র, শোনে না গণমাধ্যম, কিন্তু দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে সেই হাহাকার সুর হয়ে বাজে।

ভাই রিফাত কথা বলে না আর, শুধু তাকিয়ে থাকে শূন্য দেয়ালে যেখানে হয়তো সে ভাবতো ভাই একদিন ফিরে আসবে ইটালির কোনো স্টেশন থেকে ফোন করে। বোন জান্নাতের মুখেও একা বাতাস যেন তার ভাই চলে যাওয়ার পর শব্দ আর ফিরতে চায় না।

সিফাত ছিলেন না কোনো নেতা, না কোনো রাজনীতির পুতুল, না কোনো মঞ্চে চড়া নায়ক। তিনি ছিলেন একেবারে সাধারণ, একেবারে প্রকৃত রক্তমাংসের, ক্লান্ত হাতের, রুটি-চিবানো দিনের এক যুবক। তাঁর অপরাধ ছিল স্বপ্ন দেখা। তাঁর অপরাধ ছিল এক অচল রাষ্ট্রে সত্য ধারণ করা।

জুলাই বিপ্লব তাঁকে শহীদ বানায়নি তাঁকে শহীদ বানিয়েছে রাষ্ট্রের সেই চোখ, যেটি মানুষকে দেখে না, শুধু ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দেয়। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে ভুলবে না। কারণ যারা স্বপ্ন দেখে, এবং স্বপ্নের দাম দেয় রক্তে তাদের নাম কখনো মুছে যায় না মাটির বুক থেকে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ২০২৪ একটি রক্তাক্ত ক্যালেন্ডার, যার প্রতিটি পাতায় লেখা ছাত্রের কান্না, মায়ের প্রতীক্ষা, আর রাষ্ট্রের নীরব নিষ্ঠুরতা। এই বছরটিতে যেন রক্ত আর পতাকা একে অপরের ছায়া হয়ে ওঠে একটিকে স্পর্শ করলেই অন্যটি ভিজে যায়। কোটা সংস্কারের দাবি, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র সংস্কারের আওয়াজ সব মিলিয়ে ছাত্রজনতা নামিয়ে আনে এক বিদ্রোহ, যার দিকে তাকিয়ে থাকা মানে অতীতকে প্রশ্ন করা, এবং ভবিষ্যৎকে উলটে লেখা।

সেই বিদ্রোহের মিছিল শুধু ব্যানার বা স্লোগান নয় তা ছিল কবিতা, ভিডিও ফুটেজ, রক্তে লেখা প্রতিবাদ। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্লোগান দেয়, কেউ মোবাইলে ভিডিও করে, কেউ ভাঙা মাথা নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় রাস্তার ধারে, কেউ ডাল-ভাত এনে তুলে দেয় ক্ষুধার্তদের হাতে। এই নতুন প্রজন্ম জানে, রাষ্ট্রকে রক্ত দিয়ে নয়–ভিডিও দিয়ে, তথ্য দিয়ে, জনমত দিয়ে কাঁপানো যায়। কিন্তু যে রাষ্ট্র ভয় পায় সত্য, সেই রাষ্ট্র ভয় পায় মোবাইলের ক্যামেরা। সেই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে গর্জে ওঠে বুলেট।

২০ জুলাই, দুপুর ১টা। মিরপুর ১০। মেট্রোরেল ২৫২ নম্বর পিলারের পাশে চারতলা নির্মাণাধীন এক ভবনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সিফাত হোসেন ক্যামেরা হাতে, চোখে দৃঢ়তা। তার সঙ্গে ছিলেন বাবা কামাল হাওলাদার এবং বন্ধু সিয়াম। নিচে তখন উত্তাল ছাত্র মিছিল, শ্লোগানে শ্লোগানে ফেটে পড়ছে রাস্তাঘাট "রাষ্ট্রের সংস্কার চাই!", "কোটা সংস্কার চাই!" আর তার প্রতিউত্তরে ছোঁড়া হচ্ছে গুলি, টিয়ার শেল, লাঠিচার্জ। পুলিশ আর হেলমেট বাহিনী একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের ওপর।

সেই নির্মমতার প্রামাণ্যচিত্র হয়ে উঠছিল সিফাতের মোবাইল ক্যামেরা। নিচে যা ঘটছে, সেটি তো সে নিজে ঘটায়নি সে তো শুধু দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই রাষ্ট্র জানে, যারা সত্য দেখায়, তারাই সবচেয়ে ভয়ানক। হঠাৎ একটি গুলির শব্দ ছুটে আসে বাতাস চিরে। তারপর আরেকটি। একটি গুলি লক্ষ্য করে ক্যামেরা ঠিক সেই লেন্সের দিকে যেখানে গঠিত হচ্ছিল ইতিহাস। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে এক বুলেট ভেদ করে সিফাতের মাথা, ডান পাশ দিয়ে ঢুকে, বাম পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। রক্ত ছিটকে পড়ে পিলারের গায়ে, ক্যামেরার স্ক্রিনে, বাবার জামায়। আরেকটি বুলেট সিয়ামের চোখ ফুঁড়ে ঢুকে পড়ে মস্তিষ্কে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি স্বপ্ন নিমিষে ঝলসে যায়।

সিফাতের শেষ শব্দ "আব্বু..."। এরপর সে ঝরে পড়ে বাবার কাঁধে, যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে অপরিপক্ব ফল, যা এখনও পাকেনি, কিন্তু তবু ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে সময়ের আগেই। সেই গুলিটি শুধু রক্ত নিয়ে যায় না নিয়ে যায় একটি সম্ভাবনা, একটি পরিবারের স্বপ্ন, এবং একটি সমাজের মৌন বিবেক। বাবার কাঁধে তখন শুধু একটি মৃত শরীর নয়, একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবিষ্যৎ।

আর রাষ্ট্র? রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে নীরব, যেন সে কিছুই দেখেনি। কিন্তু আমরা যারা চোখে দেখি, হৃদয়ে শুনি- উই রিমিম্বার। এই গুলির শব্দ এখনও বাতাসে বাজে, ভিডিও ফুটেজে সঞ্চিত, কবিতার লাইনে জমে থাকে। এবং ইতিহাস একদিন এই বুলেটের দাগ ধরে বিচার করবে এক নিষ্ঠুর সময়ের। সেদিন, মিরপুরের রাস্তায়, কেবল একজন যুবক মারা যায়নি মরে গিয়েছিল রাষ্ট্রের সাহস, এবং জন্ম নিয়েছিল এক নীরব কিন্তু ধ্বনিময় বিপ্লব।

শহীদ হওয়ার মুহূর্ত ও পোস্টমর্টেমের যন্ত্রণাময় যুদ্ধ

সেই দিনটায়, ২০ জুলাই ২০২৪, আকাশ নীল ছিলো না ছিল ধূসর, ভারী আর রক্তের গন্ধে ভেজা। ঠিক দুপুর ১টা, মিরপুর ১০ নম্বরের ব্যস্ত রাজপথ থেকে একটু দূরে, ২৫২ নম্বর মেট্রোরেল পিলারের পাশে এক নির্মাণাধীন ভবনের চতুর্থ তলায় দাঁড়িয়ে ছিলো সিফাত এক হাতে মোবাইল, আরেক হাতে সত্যের দায়। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার বাবা, মোহাম্মদ কামাল হাওলাদার একজন স্যানিটারি মিস্ত্রি, কিন্তু সেই মুহূর্তে একটিমাত্র পরিচয়: তিনি একজন বাবা। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, বুকে হাত দিয়ে অনুভব করেছেন একটি বুলেট কীভাবে রাষ্ট্রের হিংসা হয়ে তার ছেলের মাথা চিরে প্রবেশ করে, কীভাবে মগজ ছিটকে পড়ে কংক্রিটের মেঝেতে, কীভাবে একটি যুবক, যার ভবিষ্যৎ ইউরোপমুখী, যাত্রা শুরু করে মৃত্যুর দিকে।

সিফাতের শেষ শব্দ ছিলো "আব্বু।" সেই একটি শব্দ, যেন ছুঁড়ে দেওয়া এক ছুরির মত, কামাল হাওলাদারের বুক চিরে দেয় চিরদিনের জন্য। ছেলের নিথর শরীর কোলে তুলে তিনি ছুটে যান আল হেলাল হাসপাতাল জবাব: "নিচ্ছি না, জায়গা নেই, নিয়ম নেই।" যেন একজন শহীদ নয়, একটা ঝামেলা রক্তাক্ত, অস্বস্তিকর, অপাংক্তেয়।

হাসপাতালে সেদিন চিকিৎসা মিলেনি কি নৈতিকতা, কি মানবতা, কিছুই ছিল না। সেদিনই মৃত্যু নিশ্চিত হয়। কিন্তু মৃত্যু মানেই তো শেষ নয় এরপর শুরু হয় এক নতুন যুদ্ধ, ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর, অবমাননাকর। লাশ দেওয়ার আগে চাওয়া হলো পোস্টমর্টেম। কামাল হাওলাদার প্রতিবাদ করেন "আমি দেখেছি, ছেলের মাথায় গুলি লেগেছে। কেন আরও কেটে দেখতে হবে?" কিন্তু সরকারি নিয়ম বলছে "কাগজ না হলে লাশ নয়।" সামনে জড়ো হওয়া মানুষজন বলেন, "দুই দিন ধরে পড়ে আছি, কেউ লাশ দিচ্ছে না। আপনি পারবেন না।"

অবশেষে অনেক তর্ক, কান্না, অনুরোধে লাশ নিয়ে বের হন। কিন্তু পথ থেমে যায় না পুলিশি বাধা আসে। কেউ বলে কাগজ ঠিক নেই, কেউ বলে অনুমতি নাই। হুমকি, গালাগালি, গা-ছাড়া ব্যবহার সবকিছু মিলে রাষ্ট্র যেন তার নিঃশেষিত সন্তানের

মৃতদেহকেও পুরোপুরি ছিনিয়ে নিতে চায় বাবার কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত, এক দুঃস্বপ্নের মতো সেই যাত্রা, গাড়ি ভাড়া করে, রাতে কাঁধে লাশ নিয়ে রওনা হন মাদারীপুরের দিকে। রাত ১০টার দিকে, নিজের হাতে, নিজের গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে মাটি দেন তিনি ছেলেকে।

এই রাষ্ট্র শুধু সিফাতকে হত্যা করেনি। সে কামাল হাওলাদারকেও প্রতিটি মুহূর্তে হত্যা করেছে–বারবার, কাগজের নামে, নিয়মের নামে, হুমকির নামে। তাকে একজন বাবার মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। এই পিতৃত্ব যেন একটি অপরাধ, এই শোক যেন রাষ্ট্রদ্রোহ। সিফাতের রক্ত একবার ঝরেছে, কিন্তু কামাল হাওলাদারের হৃদয় থেকে প্রতিটি দিন রক্তক্ষরণ হয়েছে, এখনো হয়। প্রতিটি দিনই তার চোখের সামনে ফিরে আসে সেই গুলি, সেই শব্দ "আব্বু..." আর তারপরে এক অনন্ত নীরবতা, যা না কোনো শব্দে ফোটে, না কোনো রাষ্ট্র বুঝতে পারে।

এবং সেই নীরবতাই আজ গর্জে উঠছে এক বিপ্লবের মেঘে। যেই বুলেট রাষ্ট্র ছুড়েছিল সত্যের দিকে, তা একদিন রাষ্ট্রকেই করবে বিবস্ত্র।

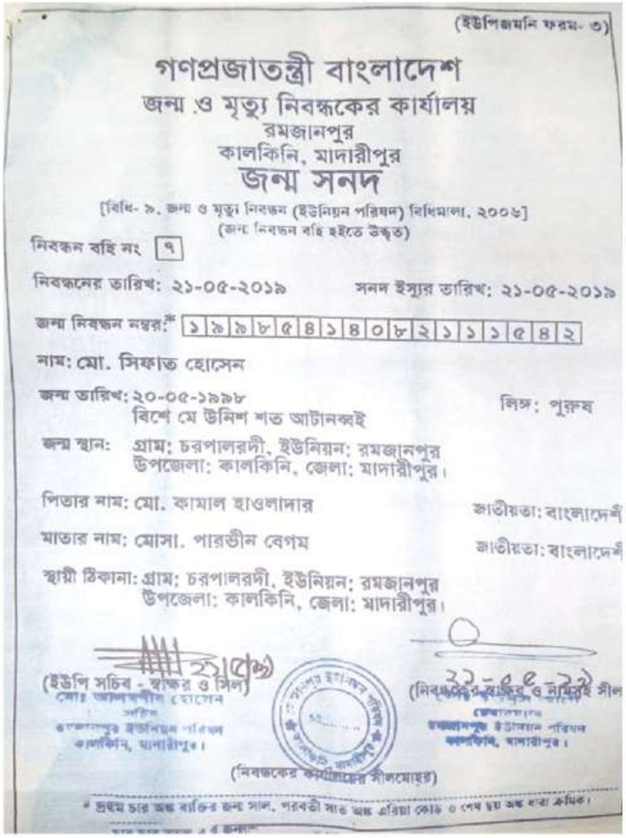
(ইউপিজমনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
রমজানপুর
কালকিনি, মাদারীপুর
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৭

নিবন্ধনের তারিখ: ২১-০৫-২০১৯ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২১-০৫-২০১৯

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ১৯৯৮৫৪১৪০৮২১১১৫৪২

নাম: মো. সিফাত হোসেন

জন্ম তারিখ: ২০-০৫-১৯৯৮
বিশে মে উনিশ শত আটানব্বই
লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম স্থান: গ্রাম: চরপালরদী, ইউনিয়ন: রমজানপুর
উপজেলা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর।

পিতার নাম: মো. কামাল হাওলাদার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোসা. পারভীন বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: চরপালরদী, ইউনিয়ন: রমজানপুর
উপজেলা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

* প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক হবে ক্রমিক।

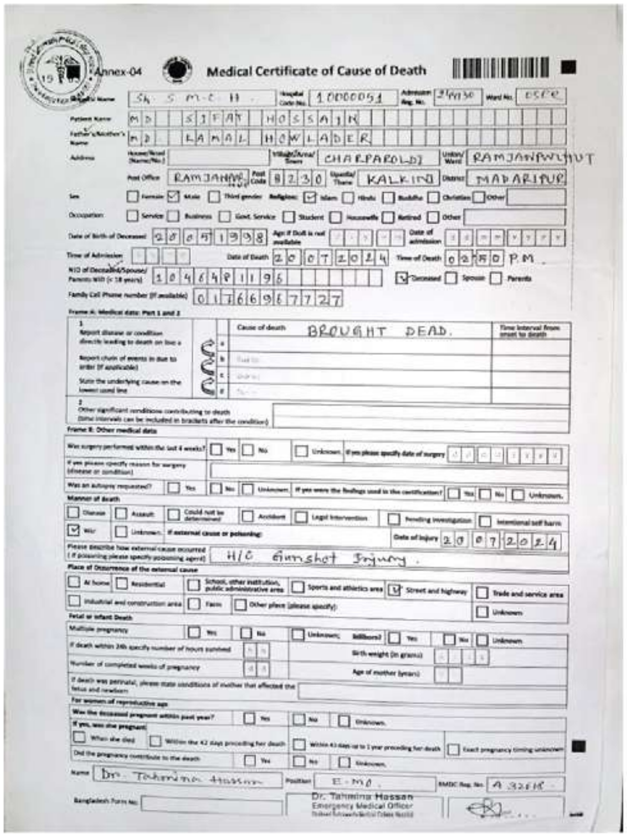
Annex-04

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: Sh. S. M. C. H. Hospital Code No.: 10000051 Admission Reg. No.: 2/4130 Ward No.: OSCC

Patient Name: MD SIFAT HOSSAIN

Father's/Mother's Name: MD KAMAL HOWLADER

Address: Village/Area/Town: CHARPAROLDI Union/Ward: RAMJANPUR

Post Office: RAMJANPUR Post Code: 8230 Upazila/Thana: KALKINI District: MADARIPUR

Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third gender Religion: ☑ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other

Occupation: ☐ Service ☐ Business ☐ Govt. Service ☐ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other

Date of Birth of Deceased: 20 05 1998

Date of Death: 20 07 2024 Time of Death: 02:50 P.M.

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 1046481196 ☑ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents

Family Cell Phone number (if available): 01766967727

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

Cause of death: BROUGHT DEAD.

Frame B: Other medical data

Manner of death: ☑ War

Date of Injury: 20 07 2024

Please describe how external cause occurred: H/O Gunshot Injury.

Place of Occurrence of the external cause: ☑ Street and highway

Name: Dr. Tahmina Hassan Position: E.M.O. BMDC Reg. No.: A 32618

Dr. Tahmina Hassan
Emergency Medical Officer

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মোঃ সিফাত হোসেন
জন্ম তারিখ ও স্থান	: ১৯৯৯ সাল; গ্রাম: চড়পালরদি, ইউনিয়ন: রমজানপুর,
	: উপজেলা: কালকিনী, জেলা: মাদারীপুর
বয়স (শাহাদাতের সময়)	: ২৫ বছর
পিতার নাম ও পেশা	: কামাল হাওলাদার (বয়স ৫১); পেশা: স্যানেটারি মিস্ত্রি
মাতার নাম ও পেশা	: পারভিন বেগম (বয়স ৪২); পেশা: গৃহিণী।
	: (পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শহীদের মায়ের মানসিক অসুস্থতা রয়েছে)
ভাইবোন	: সিফাত ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন
	: ছোট ভাই: মোঃ রিফাত হোসেন (বয়স ১৮); বরিশাল গৌরীদি সরকারি কলেজ থেকে
	: এই বছর (২০২৪) এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কথা। বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে
	: তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত
	: ছোট বোন: জান্নাত (বয়স ১৩); পূর্বে মিরপুরের মনিপুর স্কুলে অধ্যয়নরত থাকলেও,
	: সিফাতের শাহাদাতের পর থেকে গ্রামের বাড়িতে স্থানীয় একটি স্কুলে নবম শ্রেণীতে
	: পড়াশোনা করছে।
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চড়পালরদি, ইউনিয়ন: রমজানপুর, উপজেলা: কালকিনী, জেলা: মাদারীপুর
বর্তমান ঠিকানা (ঘটনার সময়)	: ১০২/১ সেনপাড়া, মিরপুর, ঢাকা। (এখানে তিনি পিতা ও এক ভাগ্নের সাথে থাকতেন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচএসসি পাশ (বাংলা কলেজ, ঢাকা)।
	: পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি
পেশা	: প্রায় তিন বছর সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন, দেশে ফেরার পর ইতালি যাওয়ার প্রস্তুতি
	: নিচ্ছিলেন শাহাদাতের পূর্বে তিনি কোটা সংস্কার ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে
	: অংশগ্রহণ করেন এবং খাবার ও পানি বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন।
শাহাদাতের স্থান	: মিরপুর-১০ নং গোল চত্বর, মেট্রোরেলের ২৫২ নম্বর পিলারের পাশে একটি নির্মাণাধীন
	: ভবনের চতুর্থ তলা
শাহাদাতের তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই, ২০২৪ (শনিবার), দুপুর আনুমানিক ১:০০-১:৩০ ঘটিকা
আঘাতকারী	: আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য (পুলিশ) ও ছাত্রলীগের সম্মিলিত গুলিবর্ষণ
হাসপাতাল/প্রাথমিক চিকিৎসা (তৎপরবর্তী)	: ঘটনার পর সিফাতের পিতা কামাল হাওলাদার বহু বাধা অতিক্রম করে তাকে
	: আল-হালাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে
	: মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে তিনি পোস্টমর্টেম ছাড়াই শহীদের মরদেহ গ্রহণ করেন।
দাফন	: শাহাদাতের দিন (২০ জুলাই, ২০২৪), রাত আনুমানিক ১০টার দিকে মাদারীপুরের
	: কালকিনিতে নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে শহীদ মো: সিফাত হোসেনকে দাফন করা হয়

প্রস্তাবনা

দাবিগুলোও পরিষ্কার কোনো বিলাসিতা নয়, শুধু ন্যায্য অধিকার:

১. রিফাত ও জান্নাতের পূর্ণ শিক্ষাব্যয় বহন করা

২. পরিবারের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য জীবিকার ব্যবস্থা, চাকরি হোক বা সরকারি সহায়তা।

৩. শহীদ জননী পারভিন বেগমের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা, যেন একজন মা আবার মানুষ হয়ে ওঠেন, ছেলেকে না হোক, নিজেকে অন্তত চিনতে পারেন।

মিডিয়ায় প্রকাশিত শহীদের নিউজ লিঙ্ক

https://www.facebook.com/Msuddin.Official/videos/1162801358279294/

https://www.bssnews.net/bangla/stories-of-mass-upsurge/176059

https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/campus/473853

শহীদ মো: রাব্বি মাতব্বর (গোলাম রাব্বি)

ক্রমিক : ৭৫৯

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৮১

শহীদ পরিচিতি

মো: রাব্বি মাতব্বর ওরফে মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি নামের ভেতর যেন এক কোমলতা, নিষ্পাপ একটি মুখ, আর ভবিষ্যতের আলো মাখানো এক কিশোর। বয়স? বড়জোর ১৪ কিংবা ১৫, এই ভগ্ন পৃথিবীতে বয়সের হিসেবটা কি এতই জরুরি? অনেক বড়রাও তো মানুষ হতে পারে না, অথচ রাব্বি শিখে গিয়েছিল মানুষ হওয়ার চর্চা। যেদিন সে শহীদ হয়, তার শরীরে কোনো রাজনৈতিক পতাকা ছিল না, মুখে কোনো স্লোগান ছিল না, ছিল না কোনো সংগঠনের পরিচয়পত্র ছিল কেবল একটা নিষ্পাপ হৃদয়, যেটা দেখতে পেয়েছিল মিছিল নামক জীবন্ত বিবেককে, আর সেই দেখায় তার ভিতর নড়ে ওঠে কিছু। খেলার ফাঁকে রাব্বি থেমে দাঁড়িয়েছিল, তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসার নিচে, চোখের সামনে দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল একদল ছাত্র, চোখে আগুন, মুখে স্লোগান, পায়ে বিপ্লবের শব্দ। সে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে, হয়তো প্রথমবারের মতো মানুষকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, যেমন শিশুরা প্রথম আকাশ দেখে থেমে যায়।

রাব্বির জন্ম পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার একটি অজপাড়াগাঁ বাশবাড়িয়া, কলা গাছিয়া। নদীর পাশের সেই মাটি তখনও জানত না, এই গ্রামের ছেলে একদিন শহীদ হবে রাজধানীর রাজপথে, ইতিহাসের একটি ব্যথাতুর অনুচ্ছেদ হয়ে। পরিবারটি ছিল সাধারণ পিতা মো. জুয়েল মাতবর, একজন কন্ট্রাক্টর; মা মোসা. ফিরোজা আক্তার, একজন সাদামাটা গৃহিণী; দুই বড় ভাই, রিয়াদ ও রিফাত যাঁরা জীবিকার তাগিদে চায়ের দোকান চালান। ছোট বোন জুঁই, শেরেবাংলা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের

ছাত্রী এখনও জানে না ভাইয়ের মৃত্যু কীভাবে হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে। আর রাব্বি? সে তো আলেম হওয়ার স্বপ্নে বুক বেঁধেছিল। বেহেশতের রাস্তা খুঁজে বেড়াতো হাদিসের পাতায়, কোরআনের আয়াতে। তবু সেই স্বপ্ন আজ থেমে গেছে। রাব্বি আর আলেম হবে না। কপালে তিলক নয়, আজ তার কপালে রক্তমাখা কাপড়, মাটির নিচে অনন্ত ঘুম। সে কি জানত রাষ্ট্র তাকে ভয় পাবে? সে কি জানত ভালোবাসা আর সততার শপথ নেওয়া একটি ছেলেও

হতে পারে রাষ্ট্রদ্রোহী? না, সে এসব কিছুই জানত না। তার দোষ ছিল সে দাঁড়িয়েছিল মানুষের পাশে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নয়, চোখে চোখ রেখে নয়, শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তার শিশু হৃদয়ের বিস্ময় নিয়ে। আর তাতেই রাষ্ট্র ভয় পায়, ভয় পায় নিষ্পাপ হৃদয়ের শক্তিকে। তাই গুলি চলে, আর এক ছেলেটি পড়ে থাকে রাস্তায় নির্বাক, নিথর, নির্বিচারে নিহত।

রাব্বির মৃত্যু কোনো দৈনিকের শিরোনাম হয়নি। টকশোতেও আলোচনা হয়নি। কোনো রাজনৈতিক ব্যানার তাকে শহীদ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। অথচ তার মৃত্যুই বলে দেয়, এই আন্দোলন ছিল নিঃস্ব, কিন্তু নির্মল; রাজনীতিহীন, কিন্তু ন্যায়ের দাবিতে উজ্জ্বল। রাব্বি হয়ে ওঠে আমাদের বিবেকের আয়না যেখানে আমরা নিজের মুখ দেখতে পাই, প্রশ্নের মুখোমুখি হই। আজ তার পরিবারে আর স্বপ্ন নেই, কেবল স্মৃতি, আর অসহ্য এক শূন্যতা। কিন্তু সেই শূন্যতাই আমাদের কানে কানে বলে এই মৃত্যু মিথ্যে নয়, এই শহীদ বেঁচে আছেন, মানুষের ভেতরে, প্রত্যেক প্রতিরোধের লড়াইয়ে। মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি এক নাম, এক নিঃশব্দ বজ্রনিনাদ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, শুক্রবার রাত আটটা। রাজধানীর আকাশ তখন কেবল গাঢ় ধোঁয়ার নয়, এক জাগ্রত জাতির গর্জনে কেঁপে ওঠা এক অনির্বচনীয় ঘোরের। কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া ছাত্রদের ছোট্ট মিছিল এক লাফে পরিণত হয়েছে এক সর্বাত্মক বিদ্রোহে যার ভাষা ছিল না কেবল পোস্টারে, ছিল না কোনো রাজনৈতিক ঘোষণায়, ছিল সরাসরি চোখে চোখ রেখে বলা সত্যে, বুকে বুকে বহন করা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে। মিরপুর, মোহাম্মদপুর, শাহবাগ প্রতিটি চৌরাস্তা তখন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের জন্মঘণ্টা বাজাচ্ছিল।

ঠিক এই সময়েই, তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসার নিচে, পৃথিবীর বিক্ষোভ-আক্রান্ত মানচিত্র থেকে কিছুটা দূরে, এক কিশোর খেলছিল। নাম তার মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি ১৪ থেকে ১৬ এর মাঝে কোনো এক নিষ্পাপ বয়স। চোখে ছায়া-ভরা স্বপ্ন, পায়ের ধুলায় স্কুল, মাদ্রাসা, মাঠ আর ঘামের গন্ধ। রাজনীতি বোঝার মতো বয়স হয়নি তার, ফ্যাসিবাদ শব্দটা উচ্চারণ করতেও জানত না। তবু তার নিয়তি তাকে একদিন সেই কথার এক নিঃশব্দ প্রতিচ্ছবি করে তুলবে সে জানত না। তার দোষ একটাই সে সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

জমজমাট আন্দোলনের মাঝ দিয়ে হঠাৎ এগিয়ে আসে সাঁজোয়া বাহিনী। স্লোগান আর ধোঁয়ার মাঝে ভেসে আসে বুলেটের হিসাব যেখানে মানুষের প্রাণ মানে কেবল একটি লক্ষ্যবস্তু। মডেল ডিক্রির সামনে দিয়ে রাব্বি দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো কোনো কৌতূহলে, হয়তো কেবল দাঁড়িয়ে থেকেই বুঝতে চাইছিল পৃথিবী এত অশান্ত কেন। তখনই ছুটে আসে একটি বুলেট, বিদ্ধ হয় তার কোমরে কিডনি ছিঁড়ে, মেরুদণ্ড ভেদ করে শরীরের আরেক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই ছিল তার স্বাধীনতার মূল্য।

রাব্বি তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ে। কেউ দৌড়ে আসে না, কেউ কাঁদে না কেননা সেখানে কাঁদার অধিকার নেই। আশেপাশে শুধু ধোঁয়া আর কুকুরের মতো গর্জে ওঠা রাষ্ট্রযন্ত্রের নিঃশ্বাস। ৩০ মিনিট পর খবর পায় পরিবার। বড় ভাই ছুটে আসে, মাটিতে পড়ে থাকা রক্তে ভেজা দেহ দেখে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। ডাক্তার তখনও কিছু বলেনি, তবু মায়ের বুক তখনই বুঝে যায় তার ছেলে আর ঘরে ফিরবে না। সবচেয়ে লজ্জাজনক ছিল এরপরের পর্ব। পুলিশ বলছে ছেলেটি নাকি গ্রেনেড ছুঁড়েছিল! চায়ের দোকান চালানো দুই ভাই, আলেম হওয়ার স্বপ্নে বড় হওয়া কিশোর রাব্বি তার গায়ে এমন তকমা? রাষ্ট্র এমন বানোয়াট গল্প লিখে দেয়, যেন মরার পরেও তার আত্মার ঘুম না আসে।

এই মৃত্যু ছিল শুধু এক কিশোরের না, এই ছিল হাজারো স্বপ্নের এক নিষ্ঠুর গলাকাটা। এই রাব্বির মৃত্যু আমাদের শেখায় এই দেশে নিঃশব্দ দাঁড়ানোও অপরাধ, আর ভালোবাসা-ভরা চোখে তাকানোও রাষ্ট্রদ্রোহ। সে মরে গেছে হয়তো, কিন্তু তার রক্ত এখন আমাদের চেতনায় মিছিল করে। প্রশ্ন রেখে গেছে, দায় রেখে গেছে আমরা কি সেই দায় শোধ করবো, নাকি আগামী রাব্বিদের জন্যও শুধু কফিনের পর কফিন গুনবো?

যেভাবে শহীদ হন এবং পরবর্তী নির্মমতা

রাব্বি শহীদ হয়েছিলেন এক অনাহূত সন্ধ্যায়, এক অচেনা গুলিতে, এক অনভিপ্রেত যুদ্ধে। কিন্তু যে যুদ্ধ তার দেহ থামিয়ে দিয়েছিল, তা তার পরিবারের জন্য ছিল কেবল শুরু। শহীদের রক্ত

তখনো শুকায়নি, তখনো জনতার ঢল ঢাকায় বয়ে চলেছে। অথচ তার পরিবার, এক কোণঠাসা ঘরের কোণে, জীবন বাঁচানোর জন্য, সম্মান রক্ষার জন্য, প্রিয়জনের মরদেহ নিয়ে যেন নতুন এক যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পড়ে।

রাব্বির নিথর দেহ প্রথমে নেওয়া হয় আজমল মেডিকেলে। ডাক্তার চেয়ে দেখে, মাথা নাড়ায় মৃত ঘোষণা করেন। সেই মুহূর্তেই যেন সময় থেমে যায়। মা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ভাইরা বোবা হয়ে যায়, আর ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়ায় একটি শব্দ "শেষ"। কিন্তু না, মৃত্যু এখানে চূড়ান্ত নয়, বরং রাব্বির শহীদ হওয়ার পরে যা শুরু হয়, তা এক দীর্ঘশ্বাসে চলমান রাষ্ট্রীয় নির্মমতার রূপকথা।

যখন পরিবার জানাজা ও দাফনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই হাজির হয় এক বেসরকারি হুকুম কাউন্সিলরের ভাই, যিনি তাদের বাসার মালিক, রক্তশীতল কণ্ঠে বলেন, "তাড়াতাড়ি দাফন করেন, না হলে লাশ পাবেন না।" শোকাহত পরিবার তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এই দেশে কি মৃতদেরও জিম্মি করা হয়? তাদের চোখে তখন কেবল ভয়, হাতে কেবল লাশ। এরপর আসে পুলিশের পালা। মৃত ছেলের বাবাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুই ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রাখা হয়, আর সাদা কাগজে জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয় এক অবিশ্বাস্য বাক্য: "আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য পুলিশ দায়ী নয়।" যেই বুলেটটি রাব্বির দেহের পাশে পড়ে ছিল যা তার মৃত্যুর নীরব সাক্ষী হতে পারত তাও তুলে নেয় রাষ্ট্র, যেন প্রমাণও আর জীবিত না থাকে। যেন ইতিহাস শুধু যারা বন্দুক ধরে, তারাই লিখবে।

এরপর শুরু হয় চরিত্র হননের অধ্যায়। আওয়ামী লীগের নেতারা, পুলিশের অস্পষ্ট চেহারায় ছদ্মবেশী মানুষ, এসে বলতে থাকে: "তোমার ছেলে ছাত্রলীগ করত। পুলিশের ওপর বোমা ছুড়েছিল।" যেন শহীদের মৃত্যুতে দায় এড়ানোর জন্য, নতুন এক নাটক রচনা করা হচ্ছে। অথচ রাব্বি কোনোদিন মিছিলে যায়নি, কোনো দলের ব্যানারে হাঁটেনি। তার জীবনের একমাত্র রাজনীতি ছিল নীরব ভালোবাসা আর সত্যের প্রতি স্নেহ। কিন্তু সে সত্য রাষ্ট্রের গায়ে লাগে। ফলতঃ একের পর এক হুমকি পুলিশ সহ যাদের নামে মামলা হয়েছে, তারা রাতভর ফোনে, দিনে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে যায়: "চুপ থাকেন, নইলে পরিণতি ভালো হবে না।" এমনকি দোকান মালিক বলে, "এই ঘটনার পর আপনারা থাকলে সমস্যা হবে।" বাড়িওয়ালা চাপ দেয়, "বাসা ছেড়ে দিন।" একে একে জীবনযুদ্ধের প্রতিটি আশ্রয় কেড়ে নেওয়া হয়।

একজন শহীদের পরিবারকে কেবল হত্যা করা হয় না তাদের প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে ভেঙে ভেঙে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। যেন রাব্বির মৃত্যু কেবল একটি দেহ থামানো নয়, একটি গরিব পরিবারের আশা, স্বপ্ন, বাসস্থান সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে ফেলা। রাষ্ট্রের বুলেট যাকে হত্যা করে, রাষ্ট্রের বুলেটের ভয়ে তাকে কবর দিতে হয় গোপনে। এই কোনো স্বাধীন দেশ নয়, এই এক আধুনিক গ্যাসচেম্বার যেখানে দম বন্ধ করে বাঁচতে হয়, আর শহীদের পরিবারের পরিচয় হয়ে যায়: 'বিপদ'।

পরিবারের অনাহার, অবমাননা ও আবর্জনায় বেঁচে থাকা

আজ মিরপুর ১৩ নম্বরের একটি জীর্ণ বাসায়, তীব্র আতঙ্ক আর থমথমে নীরবতার মধ্যে পড়ে আছে একটি পরিবার। সেই ঘরে এখন আলো আসে না, জানালার বাইরে থেকেও কেউ আর ডাক দেয় না। রাব্বির মা ফিরোজা আক্তার যার কোলের উষ্ণতা ছিল রাব্বির জীবনের প্রথম মাদ্রাসা, আজ তিনি নিজেই পঙ্গু হয়ে বসে থাকেন, হাহাকারে ভরা হৃদয়ে। তার পিঠ বাঁকা, চোখে সব ঝাপসা, আর গলার স্বর যেন কষ্টে সিক্ত হয়ে রুদ্ধ হয়ে আসে। বারবার বলেন, "ওরে আলেম বানাইতে চেয়েছিলাম। এখন শুধু কবরে গিয়া বলি বাবা, তুই ক্ষমা করিস।" পিতা মোঃ জুয়েল মাতবর, এক ভেঙে পড়া মানুষ। আগে যিনি কন্ট্রাক্টর হিসেবে দিন চালাতেন, এখন তিনি হাঁটেন না, শুধু কাঁপেন। কথা বলেন না, তাকান না কারো চোখে। কেবল কখনো কখনো রাব্বির একটা পাঞ্জাবি বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। মনে হয়, ঘরে কেউ নেই, শুধু একটা শোক হাঁ করে বসে আছে। দুই ভাই রিয়াদ আর রিফাত যাদের জীবন এক চায়ের দোকানের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, আজ তারা দুলে ওঠে হুমকির ঝড়ে। সেই ছোট দোকান যা ছিল সংসারের একমাত্র রুটির যোগানদাতা আজও টিকে আছে, কিন্তু কতদিন টিকবে, কেউ জানে না। স্থানীয় দলীয় ক্যাডাররা, পুলিশের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মুখোশধারীরা, রোজ এসে জিজ্ঞেস করে, "তোমরা থাকো এখনো এখানে? সাহস কই পাইছ?" মনে হয়, একটা

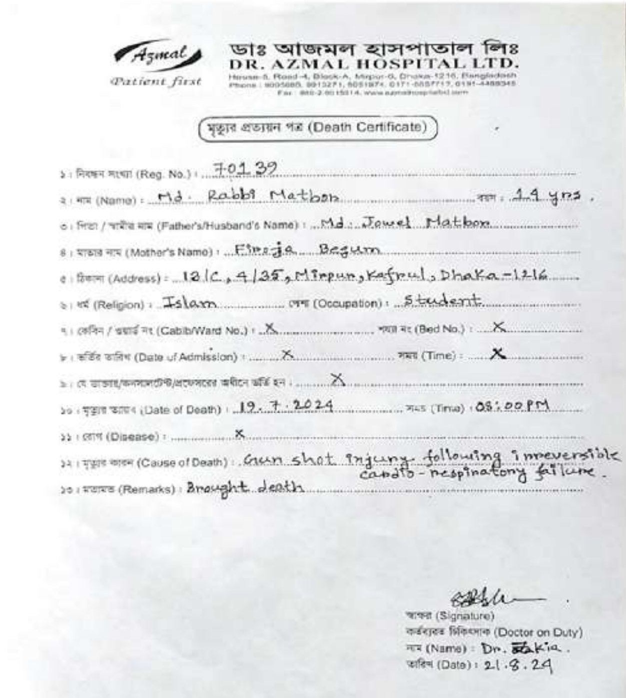

Azmal
Patient first

ডাঃ আজমল হাসপাতাল লিঃ
DR. AZMAL HOSPITAL LTD.
House-5, Road-4, Block-A, Mirpur-6, Dhaka-1216, Bangladesh

মৃত্যুর প্রত্যয়ন পত্র (Death Certificate)

১। নিবন্ধন সংখ্যা (Reg. No.) : 70139
২। নাম (Name) : Md. Rabbi Matbor বয়স : 14 yrs.
৩। পিতা / স্বামীর নাম (Father's/Husband's Name) : Md. Jowel Matbor
৪। মাতার নাম (Mother's Name) : Firoja Begum
৫। ঠিকানা (Address) : 12/C, 4/35, Mirpur, Kafrul, Dhaka-1216
৬। ধর্ম (Religion) : Islam পেশা (Occupation) : Student
৭। কেবিন / ওয়ার্ড নং (Cabin/Ward No.) : X শয্যা নং (Bed No.) : X
৮। ভর্তির তারিখ (Date of Admission) : X সময় (Time) : X
৯। যে ডাক্তার/কনসালটেন্ট/প্রফেসরের অধীনে ভর্তি হন : X
১০। মৃত্যুর তারিখ (Date of Death) : 19.7.2024 সময় (Time) : 08:00 PM
১১। রোগ (Disease) : X
১২। মৃত্যুর কারণ (Cause of Death) : Gun shot injury following irreversible cardio-respiratory failure.
১৩। মন্তব্য (Remarks) : Brought death

স্বাক্ষর (Signature)
কর্তব্যরত চিকিৎসক (Doctor on Duty)
নাম (Name) : Dr. Zakia.
তারিখ (Date) : 21.8.24

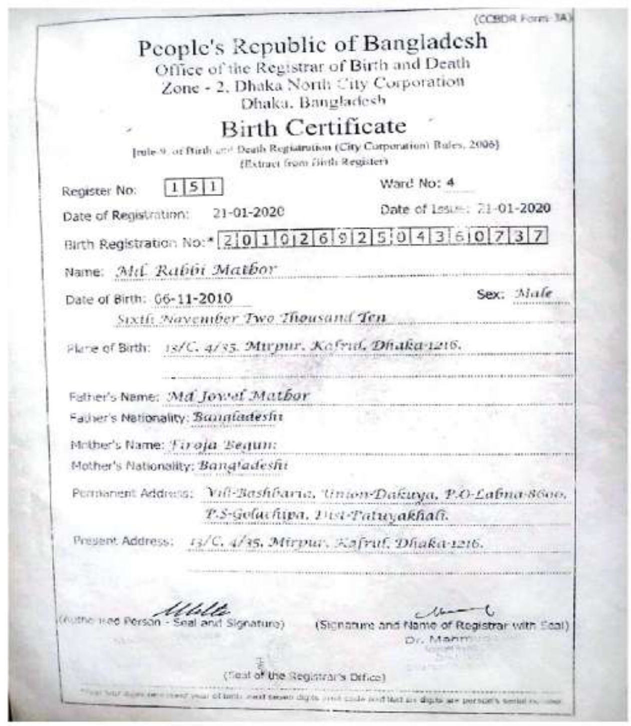

(CCBDR Form-3A)

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Zone - 2, Dhaka North City Corporation
Dhaka, Bangladesh

Birth Certificate
[rule 9 of Birth and Death Registration (City Corporation) Rules, 2006]
(Extract from Birth Register)

Register No: 151 Ward No: 4
Date of Registration: 21-01-2020 Date of Issue: 21-01-2020
Birth Registration No:* 20102692504360737
Name: Md. Rabbi Matbor
Date of Birth: 06-11-2010 Sex: Male
Sixth November Two Thousand Ten
Place of Birth: 13/C, 4/35, Mirpur, Kafrul, Dhaka-1216.
Father's Name: Md Jowel Matbor
Father's Nationality: Bangladeshi
Mother's Name: Firoja Begum
Mother's Nationality: Bangladeshi
Permanent Address: Vill-Bashbaria, Union-Dakuya, P.O-Labna-8600, P.S-Golachipa, Dist-Patuyakhali.
Present Address: 13/C, 4/35, Mirpur, Kafrul, Dhaka-1216.

(Authorised Person - Seal and Signature) (Signature and Name of Registrar with Seal)
Dr. Mahm

(Seal of the Registrar's Office)

লাশ দাফন হয়, কিন্তু তার গন্ধ জীবিতদের ঘিরে রাখে। সেই গন্ধই আজ ভয়, আতঙ্ক, অভুক্তি আর অপমান হয়ে চেপে আছে।

রাব্বির ভাইয়ের মুখ থেকে এই কথাগুলো বের হয় থেমে থেমে, চোখ ভিজে: "আমি আর বড় ভাই লেখাপড়া করতে পারি নাই। শুধু চেয়েছিলাম রাব্বি আলেম হোক। ওরে সব দিছিলাম। খাওয়াইছি, পরাইছি, বাইচা থাহছি যাতে ও পড়তে পারে। এখন ও নাই, স্বপ্নও নাই।"

এ পরিবার এখন আর জীবন চায় না তারা চায় মাথা গোঁজার ঠাঁই, নিরাপদ দোকান, আর একটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যাতে অন্তত বলা যায়, তাদের ছেলের মৃত্যু ব্যর্থ ছিল না। আজ এই পরিবার কোনো দল চায় না, কোনো শ্লোগান চায় না তারা চায় শুধু ন্যায়বিচার, একটু শান্তি, একটু রুটি, একটু ঘুম। যদি এই রাষ্ট্র যার পতাকা রাব্বি নিজের রক্তে রাঙিয়েছে এই পরিবারটির পাশে না দাঁড়ায়, তবে "শহীদ" শব্দটি একদিন হয়ে উঠবে এক ঠান্ডা, নির্জীব কাগজের টুকরো। কেবল এক ফ্রেমে আটকানো ভুয়া সম্মান যা দেয় কিন্তু দায়িত্ব নেয় না, কথা রাখে না, চোখের জল মোছায় না।

রাব্বির মৃত্যু শুধু তাদের নয়, আমাদেরও। কারণ তার রক্ত লেগে আছে আমাদের নির্লিপ্ত বিবেকের গায়ে। তার না-পাওয়া গুলোর ভার আমাদের কাঁধে। সে মৃত নয়, সে এখন রাষ্ট্রের প্রশ্নপত্র যার উত্তর আমরা দিতে না পারলে, সব লজ্জা আমাদেরই।

পরিবারের ভাষ্য

পরিবারটিকে বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, যেমন সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া এবং বাসা ও দোকান ছাড়তে চাপ দেওয়া হয়েছে। পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে খুবই নাজুক অবস্থায় আছে। গোলাম রাব্বি শহীদ হননি শুধু গুলিতে, তিনি শহীদ হয়েছেন এক জাতির মিথ্যে বিবেকের মুখে। তাঁর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে যদি কেউ চুপ থাকে, তবে আগামী প্রজন্মও জানবে না কাদের রক্তে লেখা হয়েছিল তাদের পথ।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: রাব্বি মাতব্বর
জন্ম	: ৬/১১/২০১০
জন্মস্থান	: গলাচিপা, পটুয়াখালী
পিতা	: মো: জুয়েল মাতবর
মাতা	: মোসা: ফিরোজা আক্তার
ভাই	: রিয়াদ মাতবর (২৫ বছর), রিফাত মাতবর (১৬ বছর) বোন: জুঁই আক্তার মিম (১৩ বছর)
বর্তমান ঠিকানা	: ৩৫ নং বাসা, রোড ৪, ব্লক সি, কাফরুল, মিরপুর ১৩, ঢাকা
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৮টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসা, মডেল ডিক্রির সামনে, মিরপুর ১৩
গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থান	: কিডনির ওপর, যা শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়
কবরস্থান	: মিরপুর ১৩ শিশু কবরস্থান
মৃত্যুর কারণ	: পুলিশের গুলিতে আঘাত
ঘটনার বিবরণ	: রাব্বি তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসার নিচে খেলছিলেন, যখন পুলিশের এলোপাতারি গুলিতে
	: তিনি আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।

প্রস্তাবনা

১. প্রথমত, শহীদ রাব্বির মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে অপরাধীর মতো নির্যাতন বন্ধ করা হোক। পরিবারকে হুমকিমুক্ত করতে হবে।

২. দ্বিতীয়ত, শহীদের ভাইদের দোকানপাট পুনঃস্থাপন করে একটি স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. কাউন্সিলরের দাপট, স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হুমকি সব রাষ্ট্রীয় নীরবতায় পুষ্ট। সেই নীরবতাই রাব্বির দ্বিতীয় মৃত্যু।

বিবেকের ডাকে রক্তে লেখা এক উচ্চবিত্ত বিপ্লব

-শহীদ মাহবুবুর রহমান সোহেল

শহীদ মাহবুবুর রহমান সোহেল

ক্রমিক : ৭৬০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৫২

শহীদ পরিচিতি

মাহবুবুর রহমান সোহেল এ নামটি আর কেবল একটি পরিচিতি নয়, আজ তা একটি প্রতীক, একটি প্রতিধ্বনি, একটি পবিত্র আগুনের নাম। পেশায় ছিলেন কর্পোরেট কর্মকর্তা, পদমর্যাদায় সম্মানিত, জীবনচর্চায় অভিজাত; কিন্তু অন্তরযাত্রী হিসেবে ছিলেন এক বিপ্লবী আত্মা, যিনি দামী স্যুটের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন শোষিতের প্রতি অসীম দরদের একটি ধুকপুক করা হৃদয়। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ত্রিশকাহনিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম, বাবা লুৎফুর রহমান খান ও মা সুরাইয়া আক্তার খানম দুজনেই প্রয়াত, কিন্তু যাঁদের হৃদয়ে ছিল সততার উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার সোহেল বয়ে বেড়িয়েছেন, শহরের আকাশচুম্বী দালানে থেকেও মাটির গন্ধ ভুলে যাননি।

তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত, গভীরভাবে সংবেদনশীল এক মানুষ। কর্মজীবনে ছিলেন ইত্তিহাদ এয়ারলাইন্সের মার্কেটিং বিভাগে, পরে দায়িত্ব নিয়েছেন নসট্রাম হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে। তবু তাঁর পরিচয় এখানেই থেমে যায় না। উত্তরার অভিজাত এলাকায় স্ত্রী মরিয়ম খানম রাখি ও তিন সন্তানের সাথে এক চমৎকার জীবনের ছায়া তিনি গড়ে তুলেছিলেন বড় ছেলে মাশরুর, মেয়ে রুবাইদা রওজা, আর ছোট্ট শিশু মারওয়া সূরা এই ছিল তাঁর অদ্ভুত সুন্দর সংসার, একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিপূর্ণ জগত।

গুলিতে আহত একজনকে ধরাধরি করে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। গতকাল রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে। ছবি : প্রথম আলো

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাইআগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসের বুকের ওপর রচিত হয় এক দগ্ধ শিরোনাম। এ ছিল শুধু আরেকটি আন্দোলন নয়, এ ছিল এক ফ্যাসিস্ট পর্দার চূড়ান্ত দৃশ্যপট উন্মোচনের মুহূর্ত, এক নিপীড়িত প্রজন্মের বিস্ফোরণ, যাদের দীর্ঘশ্বাস জমে ছিল বছরের পর বছর। কোটা সংস্কার আন্দোলন যেন ছাইচাপা আগুনের মতো বহুদিন ধরে জ্বলছিল অসাম্যের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক প্রতারণা আর একনায়কতান্ত্রিক নাটকের বিরুদ্ধে। শেখ হাসিনার একতরফা নির্বাচনের পরে যখন কোটা প্রথার পুরনো প্রেতাত্মাকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়, তখনই জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে।

কিন্তু ইতিহাস যাদের বেছে নেয়, তাদের শান্ত জীবন আর ধরে রাখা যায় না। জুলাই ২০২৪-এর বিপ্লব যখন রাজপথে আগুন হয়ে জ্বলছিল, নিরস্ত্র ছাত্রদের রক্তে যখন রাস্তাগুলো লাল হচ্ছিল, তখন মাহবুবুর রহমান সোহেল ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন বন্ধুকে "বিবেকের তাড়নায় ঘরে থাকতে পারছি না, আন্দোলনে যাচ্ছি। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।" কী অদ্ভুত, কী ভয়ংকর সত্যভেদী এই বিদায়বাক্য! যেন রবি ঠাকুরের কোনো চরণ, যেন প্রাচীন কোনো বিপ্লবীর অগ্নিঝরা কণ্ঠস্বর।

জীবন তাঁর জন্য অনেক কিছু সাজিয়ে রেখেছিল অফিসের এসি কেবিন, ড্রাইভারের গাড়ি, সাপ্তাহিক পারিবারিক ভোজন, ছুটির দিনে সিনেমা অথবা সমুদ্র কিন্তু তিনি তা সব ফেলে এসেছিলেন একটি সামষ্টিক বিবেকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেই বিবেক, যা আজকের সমাজে বিলুপ্ত প্রায়। রক্তাক্ত রাজপথে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি জাতির বিবেক হয়ে শুধু একজন সহানুভূতিশীল নাগরিক হয়ে নয়, একজন সক্রিয় সাক্ষী হিসেবে, যিনি না দেখে মুখ ফিরিয়ে নিতে জানতেন না।

এই মানুষটি আমাদের মনে করিয়ে দেন, শহীদ হওয়া মানে কেবল গুলি খাওয়া নয়; শহীদ হওয়া মানে জীবনের সব আরামের বিপরীতে গিয়ে একটা বৃহত্তর সত্যকে বেছে নেওয়া। তাঁর মৃত্যু আমাদের চোখে জল আনে, কিন্তু সেই অশ্রুতে রয়েছে আগুনের রঙ। কারণ সোহেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন বিবেক যার আছে, সে চুপ থাকতে পারে না।

আজ তাঁর তিন সন্তানের চোখে নেই বাবার হাসিমুখ, স্ত্রী মরিয়মের হাতে নেই সেই পরিচিত কফির কাপ, যেটা সোহেল অফিসে যাওয়ার আগে চেয়ে নিতেন। কিন্তু এই পরিবারের হৃদয়ে রয়েছে এক গৌরব তাঁদের বাবা, তাঁদের স্বামী, ছিলেন সেই মানুষ, যাঁরা ইতিহাস লেখেন নিজের রক্ত দিয়ে।

ছাত্রদের হাত ধরে শুরু হওয়া এই বিদ্রোহ অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে জনমানসে চেতনাতে, রক্তে, ঘুমহীন রাতের নিঃশব্দ আর্তনাদে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের মধ্যবিত্ত পাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার স্ক্রল সবখানে আলোড়ন তোলে এই আন্দোলন। তবে একে শুধুই রাজনৈতিক বলা ভুল হবে। এই ছিল শিক্ষা, সাম্য, ও মানবিক অধিকারকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এক নৈতিক অভ্যুত্থান, যেখানে কণ্ঠ ছিল নিরস্ত্র কিন্তু চেতনা ছিল আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

এই সময় অনেকেই আড়ালে ছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়ে হয়তো তীব্রতা বুঝে নিয়েছিলেন, কিন্তু রাজপথে নামেননি। সেখানে মাহবুবুর রহমান সোহেলের ভূমিকা ছিল অনন্য, অনড়, অভূতপূর্ব। তিনি শুধু প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেননি, তিনি ছিলেন আন্দোলনের নেপথ্য সেবক, এক সাহসী ছায়াযোদ্ধা। যখন ছাত্ররা পুলিশের কাঁদানে গ্যাসে দম আটকে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন সোহেল ছুটে যাচ্ছিলেন খাবার, পানি, ও ওষুধ নিয়ে। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বলেন, "বাড়িতে থাকতে পারত না, ছটফট করত।" সেই ছটফটানি কেবল এক ব্যক্তির অস্থিরতা ছিল না, তা ছিল জাতির বিবেকের ছটফটানি, এক নাগরিকের হৃদয় থেকে উঠে আসা চরম অনুশোচনা, যে দেখছিল তার দেশের সন্তানেরা রক্ত দিচ্ছে, আর সে অফিসে বসে শুধু ইমেইল পাঠাচ্ছে, এটা তো চলে না।

সোহেল অফিস থেকে হোম অফিসের ছুটি পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সময়ও কাটিয়েছেন রাজপথে। ১৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিনিমিষ তিনি ছিলেন ছাত্রদের ছায়া। এমনকি যখন গোলাগুলি, দমন-পীড়নের ভয় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখনো সোহেল পিছু হটেননি। তাঁর দেশপ্রেম কোনো

কূটনৈতিক পাসপোর্টে ছিল না, ছিল রক্তমাখা সড়কের ওপর, ছাত্রের কাঁদাভেজা জামার পাশে, ব্যানারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাধারণ মানুষের হৃদয়ে।

সোহেলের সেই সিদ্ধান্ত "বিবেকের তাড়নায় ঘরে থাকতে পারছি না" শুধু এক ব্যক্তির শব্দ নয়, তা ছিল পুরো প্রজন্মের আওয়াজ, যা আজও বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, গুলশানের টাওয়ারের আড়ালে, পুরান ঢাকার গলিতে, কিংবা পাবনার কোনো গ্রামে। তিনি নিজে থেকেই সেই চুক্তিতে সই করেছিলেন, যেখানে দেশের জন্য ভালোবাসা মানে ছিল প্রাণ উৎসর্গ। ইতিহাস এমন মানুষদেরই গ্রহণ করে, যারা নিজেদের ব্যথা নয়, জাতির যন্ত্রণাকে আগে অনুভব করে।

এই আন্দোলন তাই শুধু একটি রাজনৈতিক দাবি নয়, তা এক আত্মঘোষিত বিবেকের অভ্যুত্থান, যার নাম "জুলাই বিপ্লব"। আর সোহেলের মতো মানুষই সেই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

শহীদ হওয়ার করুণ কাহিনি এক অমর প্রস্থান, এক রক্তাক্ত প্রত্যয় (একটি জাতির বিবেকের শেষ নিঃশ্বাস)

৪ আগস্ট ২০২৪, বিজয়ের আগের দিন। দিনটি ছিল রোদের মতো অন্ধকার, বাতাস ছিল বুলেটের চেয়েও ভারী, আর রাজপথ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল ছাত্রদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস, জেগে থাকা চোখ আর অবিনাশী প্রতিজ্ঞা। উত্তরা আজমপুর বাসস্ট্যান্ড রবীন্দ্রস্মরণীর

প্রথম আলো
সোমবার
সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ, নিহত ৯৮
সিরাজগঞ্জে ১৩ পুলিশ নিহত, কুমিল্লায় ১
রাজধানীজুড়ে বিক্ষোভ, গুলি, সংঘাত
আরও শক্তি দেখাতে চায় আওয়ামী লীগ

কোণে বনফুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে, যেন ইতিহাসের নির্ধারিত এক মঞ্চ। দুপুর ঠিক বারোটা, সূর্য দাঁড়িয়ে আছে মাথার উপর, আর সোহেল দাঁড়িয়ে আছেন রাষ্ট্রের মুখোমুখি বুকে আগুন, চোখে নীরব বিদ্রোহ। পুলিশের গুলির মুখেও তিনি পিছু হটেননি, যেন চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, "তোমার ভয় দেখানো আমাকে স্পর্শ করবে না।"

সেই মুহূর্ত ছিল কোনও নাটকের দৃশ্য নয়, কোনও চলচ্চিত্রের সংলাপ নয় তা ছিল এক জীবন্ত হৃদয়ের অন্তিম ঘোষণাপত্র। যখন গুলির শব্দ রাজপথ কাঁপিয়ে দেয়, সোহেল পড়ে যান মাথায় গুলির আঘাতে। তাঁর দেহ রক্তমাখা রাজপথে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ, যেন রাষ্ট্র নিজেই চেয়ে দেখছিল–তাঁর রক্ত বইছে, অথচ কোনো সাহায্যের হাত বাড়ছে না। চারপাশে ছিল শুধু কাঁদানে গ্যাস, বুলেটের ঝড় আর পুলিশের অমানবিক ব্যারিকেড। সহযোদ্ধারা তাঁকে ছুঁতে পারেননি প্রেম, সাহস, শ্রদ্ধা সব কিছুই গুলির থাবায় জিম্মি হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে বহু ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয় প্রথমে নেওয়া হয় বাংলাদেশ মেডিকেলে, পরে কুচুক্ষেত হাইটেক হাসপাতাল, এবং শেষে ৫ আগস্ট স্থানান্তর করা হয় গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালের আইসিইউতে। প্রতিটি হাসপাতাল যেন হয়ে উঠেছিল ব্যর্থতার স্মারক, যেখানে প্রযুক্তি, চিকিৎসা, মানবতা সব মিলেও তাঁর রক্তক্ষরণ থামাতে পারেনি। তাঁর মাথায় যে গুলি লেগেছিল, তা শুধু তাঁর দেহে নয়, এই জাতির ভবিষ্যতের কপালেও এক কফিন সিল করে দিয়েছিল।

৯ আগস্ট, শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটায় তিনি বিদায় নেন। কারও অশ্রুর অপেক্ষা না করেই, কারও রাষ্ট্রীয় সালাম ছাড়া, নিঃশব্দে চলে যান এক পরবর্তী ইতিহাসে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর মুখে ছিল না নিজের সন্তানের নাম, স্ত্রীর আকুতি, কিংবা নিজের বেদনাবোধ। তিনি বলে গেছেন দেশের কথা "ওরা যেন পিছিয়ে না

পড়ে", "ওদের খাবার পৌঁছেছে তো?", "আমার জীবন শেষ হলে যেন আন্দোলন থেমে না যায়" এমন কথাগুলো বন্ধুরা আজও কাঁদতে কাঁদতে বলেন।

সোহেল কখনো বক্তা ছিলেন না। তিনি ব্যানারে ছিলেন না, সংবাদে ছিলেন না, দলের পোস্টারে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি ছিল পাথরের মতো অটল, পাহাড়ের মতো নীরব, অথচ প্রেরণার উৎস। তিনি নিজের কর্পোরেট জীবন, পরিবারের বিলাসিতা, তিন সন্তানের ভবিষ্যৎ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছিলেন এক জাতির স্বপ্নের পাশে দাঁড়ানো। তিনি দেশকে প্রেম করেছিলেন প্রেমিকার মতো, ভালবেসেছিলেন সন্তানের মতো, বাঁচাতে চেয়েছিলেন পিতার মতো।

এই মৃত্যু তাই একটি হৃদয় থেমে যাওয়ার গল্প নয়। এটি এক বিবেকের সশরীরে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ইতিহাস। এই মৃত্যু শুধু সোহেলের নয় এ রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারের, মানবিকতার, আর বিবেকেরও এক প্রকার পরাজয়।

আর আমরা, যারা এখনো বেঁচে আছি, আমাদের কাঁধে সেই রক্তের ভার। সেই প্রশ্নের ভার, "তাহলে আমরা কি সত্যিই একটি দেশ?"

পরিবারের বেদনা ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম: এক রক্তাক্ত নিঃসঙ্গতা, এক অপ্রশমিত অপেক্ষা

জীবনের প্রতিটি কাহিনি যখন রক্ত ও কাঁটার অক্ষরে লেখা হয়, তখন শব্দ হারিয়ে যায় থাকে শুধু নিঃশ্বাস, অশ্রু, আর সেই দীর্ঘ অপেক্ষা, যেটা আর কোনোদিন শেষ হয় না। শহীদ মাহবুবুর রহমান সোহেলের বিদায়ের পর সেই অনন্তকালব্যাপী শোক যেন বাসা বেঁধেছে একটি ভগ্ন গৃহে, একটি নিঃসঙ্গ হৃদয়ে। মরিয়ম খানম রাখি, তিনি এখন আর শুধুই একজন স্ত্রী নন; তিনি এক বিধ্বস্ত মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র, তিন সন্তানের মা, একজন যোদ্ধা, যিনি জীবনের প্রতিটি দিনে স্বামীর রক্তমাখা স্মৃতি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন।

"আমার বাচ্চারা যেন রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে বোঝা না হয়" এই বাক্য তিনি বলেন না, গলায় একধরনের আকুতি গড়িয়ে পড়ে। মরিয়ম নিজে অনার্স পাস, একসময়ে স্বপ্ন দেখতেন সংসার, সন্তান আর স্বামীর হাত ধরে কিছুটা আরামদায়ক জীবনের। কিন্তু আজ? আজ তাঁর সব স্বপ্ন কফিনবন্দি, রক্তরঞ্জিত একটি খাটের কোণায় পড়ে থাকা সোহেলের শেষ জামার মতো অব্যবহৃত, অপূর্ণ।

তিনি চান না দয়া বা করুণা তিনি চান কেবল একটি সম্মানজনক চাকরি, একটি নিরাপদ আশ্রয়। কারণ তাঁর কাছে এ লড়াই কোনো এক নারীর অভাবের গল্প নয় এ লড়াই এক শহীদের পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, যেখানে সন্তানদের চোখে বাবার ছবি শুধু ফ্রেমে নয়, ভবিষ্যতের প্রতিটি কোণায় বেঁচে থাকুক।

আর সেই ছোট্ট শিশুটি মারওয়া সূরা যার বয়স ছিল মাত্র এক বছর চার মাস, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি বাবার মৃত্যু কাকে বলে। দরজার কলিং বেল বাজলে সে ছুটে গিয়ে বলে, "বাবা!"–এই একটি শব্দে যেন হাজার বছরের কান্না জমে আছে। কিন্তু কোনো দরজা আর খোলে না, কোনো বাহুডোর আর প্রসারিত হয় না। সেই শব্দ শুধু এক অনুত্তর প্রশ্ন হয়ে দেয়ালে ধাক্কা খায় এই দেশে কি বাবারা সত্যিই ফিরে আসে?

বড় ছেলে মাশরুর, এখনো সরলভাবে বলে, "আমার বাবা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই ওনার জন্য ভালো রেখেছেন।" শিশুর মতো সেই বিশ্বাস যেটা টিকে আছে শুধু প্রার্থনায়, আশা আর বাবার রেখে যাওয়া সাহসিকতায়। এই পরিবারের স্বপ্ন এখন খুব ছোট একটি চাকরি, একটু সম্মান, কিছু সুরক্ষা, একটু ভবিষ্যৎ।

কিন্তু রাষ্ট্র? রাষ্ট্র কি সত্যিই এই শহীদের পরিবারকে মর্যাদা দিতে পেরেছে? নাকি শুধু শোকসভায় ফুল দিয়ে দায় সেরেছে? সোহেল ছিলেন না শুধুই একজন কর্পোরেট অফিসার, তিনি ছিলেন সমাজের প্রতিচ্ছবি একজন সাহসী, শিক্ষিত, ন্যায়নিষ্ঠ নাগরিক, যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন ভবিষ্যতের জন্য। অথচ সেই ভবিষ্যতের পথ আজ তাঁর পরিবার চলেছে নীরব, নিঃসঙ্গ, অবহেলিত।

মরিয়ম খানম রাখির চোখে কোনো জল নেই শুধু প্রতিজ্ঞা আছে, "ওর আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না, কোনোভাবেই না।" এই প্রতিজ্ঞার ভার নিয়েই তিনি বেঁচে আছেন একটি দেশের বিবেকের অবশিষ্ট আলো হিসেবে। তাই, এই পরিবারকে ভুলে গেলে আমরা শুধু একটি পরিবারকেই নয়, পুরো জাতিকেই ভুলে বসি।

এক নজরে শহীদ মাহবুর রহমান সোহেল

নাম	: মাহবুর রহমান সোহেল
পেশা	: মার্কেটিং ম্যানেজার, ইতিহাড এয়ার ওয়েস,
	: পরিচালক, নস্ট্রাম হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার
জন্মস্থান	: ত্রিশকাহনিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: ৬ তোরা, পূর্ব ঢাকা (পূর্বে উত্তরা নিজস্ব ফ্ল্যাট)
পিতা	: মৃত লুতফর রহমান খান
মাতা	: মৃত সুরাইয়া আক্তার খানম
স্ত্রী	: মরিয়ম খানম রাখি
সন্তান	: মাশরুর (১২ বছর), রুবাইদা (১০ বছর), মারওয়া (১ বছর ৪ মাস)
গুলিবিদ্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২টা
স্থান	: আজমপুর, উত্তরার বনফুল ভাণ্ডারের সামনে
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৯ আগস্ট ২০২৪, রাত ১১:৩০
মৃত্যুস্থান	: ইউনাইটেড হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: মায়ের কবরের পাশে,জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থান, মিরপুর ১১

প্রস্তাবনা

১। রাষ্ট্রের উচিত তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের স্বীকৃতি দেওয়া

২। শহীদের স্ত্রীর একটি স্থায়ী চাকরি দেওয়া

৩। তাঁর সন্তানদের জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা

একজন গাড়ি চালক যার স্টিয়ারিংয়ের পাশে আজ ইতিহাসের পতাকা উড়ছে

-শহীদ আমির হোসেন

শহীদ আমির হোসেন

ক্রমিক : ৭৬১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১১২

শহীদ পরিচিতি

৭ মে ১৯৯২, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার বরগাঁও গ্রামে একটি নিঃশব্দ জন্ম হয়েছিল, যেটা একদিন হয়ে উঠবে বিদ্রোহের রক্তমাখা সনদ। নাম আমির হোসেন। পেশায় গাড়িচালক, এক প্রাইভেট কোম্পানির স্টাফ কার চালাতেন, কিন্তু জীবনটা চালাতেন অনেক বেশি সততা, অনেক বেশি নীরব সংগ্রাম দিয়ে। প্রতিদিন শহরের ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার মধ্যে কেউ ভাবত না এই মানুষটিও একদিন এই রাষ্ট্রের অন্যায় ট্রাফিক সিগন্যাল ভেঙে বেরিয়ে আসবে, তার নিজের খরচে, নিজের রক্তে।

পিতা খোরশেদ আলম, পেশায় কৃষক। মাটি চষে জীবন তুলে আনতেন প্রতিদিন, আর মা রহিমা বেগম, সেই জীবনের রান্না করতেন তপ্ত চুলায়, মুখে ঝাপসা হাসি আর চোখে লুকানো ক্লান্তি নিয়ে। স্ত্রী ইয়াসমিন বেগম ছিলেন সেই কুড়েঘরের রাণী, যার সিংহাসন ছিল রান্নাঘরের মাটির খুন্তি, আর যার স্বামী ছিলেন জীবনযুদ্ধের রাজপথের সৈনিক। বড় ছেলে ইয়াসিন, বয়স মাত্র পাঁচ, চোখে অনন্ত বিস্ময়। ছোট ইব্রাহিম যার বয়স আড়াই, এখনো জানে না কীভাবে বাবা বলে ডাকতে হয়, কিন্তু জানে বাবার ছবি ছুঁয়ে কাঁদতে হয়। তাদের পরিবার আজ দয়ার দানায় চলে, যেখানে স্বপ্ন শব্দটি নিষিদ্ধ, আর স্কুল ড্রেস একটি বিলাসিতা যেটা এখন আলমারির সবচেয়ে উপরের তাকেই পড়ে থাকে, ধুলোয় ঢাকা।

আমির কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। ভোট দেওয়ার দিন ছাড়া তিনি কোনোদিন কোনো মিছিলে যাননি। তাঁর একমাত্র দল ছিল পরিবার, তাঁর একমাত্র বৈঠক ছিল সন্ধ্যার পর ঘরের বারান্দায় স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে বসা। অথচ, ২০২৪ সালের আগস্টে, রাজধানী ঢাকার রাস্তায় যখন ফ্যাসিবাদী সরকারের গুলির গর্জন উঠছিল, তখন স্টিয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে আমির গাড়ি থামালেন, নেমে দাঁড়ালেন সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তিনি নাম লেখাননি কোনো দলে, কোনো ব্যানারে নয় শুধু বিবেকের ব্যানারে দাঁড়িয়েছিলেন। আর সেই দাঁড়ানোই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়ে উঠল। রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হয়ে যখন তিনি পড়েন, তখন তাঁর চোখে একটিই প্রশ্ন ছিল: "আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, তাও কেন?" প্রশ্নটি আজও বাতাসে ভাসছে, কিন্তু উত্তর দেয়নি কেউ রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন সবার মুখে নীরবতার মুখোশ।

শহীদ আমির হোসেন ছিলেন না কোনো পোস্টারে ঝুলানো নেতা, ছিলেন না কোনো ভিডিও বার্তার জনসভা-প্রিয় বক্তা। তিনি ছিলেন সেই লক্ষ সাধারণ মানুষের একজন, যারা প্রতিদিন গাড়ি চালায়, ভাড়া মেটায়, বিদ্যুৎ বিল জমা দেয়, সংসার টানে তবুও যাদের কণ্ঠে জমে থাকা প্রতিবাদ একদিন বিস্ফোরণ হয়ে ওঠে। আজ তাঁর পরিবার কুড়েঘরে বেঁচে আছে, না-জানা এক অভিমান নিয়ে। তাঁর শিশুরা আজো জানে না, কীভাবে তাদের বাবা এই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জানা দরকার কারণ আমিরের মৃত্যু একটি ঘোষণাপত্র: এই দেশের ভবিষ্যত শুধু পলিটিক্যাল হ্যান্ডশেকে লেখা হবে না, তা লেখা হবে সেই হাতে যা একদিন স্টিয়ারিং ছেড়ে স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই থেকে আগস্ট বাংলাদেশ যেন এক নতুন মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেছিল। এই যুদ্ধে শত্রু কোনো বিদেশি সেনাবাহিনী ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাক্ষুসে শাসনব্যবস্থা একটি সরকার, যা দশকের পর দশক ধরে গণতন্ত্রের মুখোশে একনায়কতন্ত্রের থাবা বসিয়ে রেখেছিল। শেখ হাসিনা নামের এক নারীর অধীনে তিনটি একতরফা নির্বাচন, একটিও যাতে জনগণের অংশগ্রহণ বা সম্মতি ছিল না তা চূড়ান্ত দুঃশাসনের মহাকাব্য হয়ে উঠেছিল। মানুষ তখন আর চুপ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকে দিনমজুরের হাতঘড়ি পর্যন্ত সময় বলতে শুরু করে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে, চায়ের দোকান থেকে মসজিদের মিনারে: "এবার বৈষম্যের অবসান চাই।"

তখনই ৫ আগস্ট আসে–যেন কোনো মহাকালের নির্ধারিত তারিখ। ঢাকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে গুঞ্জন: "স্বৈরাচার পালিয়েছে।" কেউ বলে বিদেশে, কেউ বলে গোপনে সেনানিবাসে আত্মগোপনে। কিন্তু মানুষের মুখে তখন একটাই সুর বিজয়ের। রাজপথে নামে সাধারণ জনতা, রাজনৈতিক ব্যানারহীন, কেবল বুকভরা ক্ষোভ আর মাথাভরা স্বপ্ন নিয়ে। সেই উত্তাল ঢেউয়ের ভেতরে ছিলেন আমির হোসেন–একজন গাড়িচালক, এক সাধারণ পিতা, যার জীবনে কোনোদিন রাজনীতির আগুন ছুঁয়েও যায়নি। অথচ সেদিন তাঁর ভেতরের ন্যায়বোধ তাঁকে রাজপথে নিয়ে আসে, যেখানে কোনো বাহিনী তাঁকে ঠেলে দেয়নি–তাঁর বিবেকই তাঁকে দাঁড় করায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

বিমানবন্দর এলাকাটি তখন জনসমুদ্র। ঢাকার উত্তরে জড়ো হওয়া মানুষ তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেবল একটি দাবি তুলছে "গণতন্ত্র চাই, ইনসাফ চাই।" তখনই আকাশ ফেটে নামে রাষ্ট্রের আসল চেহারা। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, যারা মানুষ রক্ষার শপথ নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, তারাই অন্ধভাবে গুলি চালাতে থাকে। কোনো হুঁশিয়ারি নয়, কোনো ব্যাখ্যা নয় শুধু গর্জে ওঠা বন্দুক আর উড়ে আসা গুলির ঝাঁক। সেই মুহূর্তে, যখন সবাই দৌড়াতে ব্যস্ত, তখন আমির ছিলেন স্থির। তাঁর হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, মুখে কোনো স্লোগানও নয় শুধু এক গভীর দৃষ্টি, যেন বলছে: "আমার সন্তানদের আমি কেমন দেশ দিয়ে যাব?" তাঁর গলায় তখনই লাগে দুটি সরাসরি গুলি একটি গলার পাশে, আরেকটি একটু নিচে। একই সঙ্গে বুকে-পিঠে ছড়িয়ে পড়ে ছররা। রক্ত মাটিতে ঝরে পড়ে, সেই রক্তে ভেসে যায় অনেক স্বপ্ন ছোট ছেলের স্কুল ব্যাগ, স্ত্রীর জন্য

কেনা নতুন শাড়ির টাকা, মায়ের অসুস্থতার ওষুধের ফর্দ।

তিনি সেদিন রাস্তাতেই মারা যান, কোনো হাসপাতালে পৌঁছানোর সুযোগ পর্যন্ত পাননি। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে ছিল না কোনোরকম আতঙ্ক ছিল এক অসম্ভব শান্তি, যা আসে শুধু তখনই যখন কেউ সত্যের পাশে দাঁড়িয়ে মরতে প্রস্তুত থাকে। আমির হোসেনের মৃত্যু কেবল একটি গুলির পরিণাম নয়, এটি রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন সাধারণ মানুষের নীরব অভ্যুত্থান। তিনি পতাকা হাতে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর লাশই হয়ে উঠেছিল নতুন পতাকা যেটি রক্ত দিয়ে লেখা, নিঃশব্দে উড়ছিল কোটি বঞ্চিত মানুষের হৃদয়ের মাটিতে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা ও মৃত্যু পরবর্তী নীরবতা

যুদ্ধশেষে নীরবতা নামে প্রথমে কানে বাজে গুলির গর্জন, তারপর নিস্তব্ধতা এত গাঢ় হয় যে, মানুষ ভুলে যায় সে বেঁচে আছে কিনা। তেমনই এক গা ছমছমে নীরবতায় ঢাকার বিমানবন্দর সড়কে পড়ে থাকে এক লাশ না, লাশ নয়, ইতিহাসের এক অদৃশ্য খসড়া: আমির হোসেন। গলার নিচে দুটি গুলির ঘা, বুকজুড়ে ছড়ার ফেড়ে যাওয়া চামড়া, রক্তে ভেজা জামা এই নিথর দেহ তখনো বলে যাচ্ছিল, "আমি মরে যাচ্ছি না, আমি রক্ত দিয়ে জেগে থাকব।" লোকজন ছত্রভঙ্গ, কেউ ছবি তোলে, কেউ পালায়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখে শুধু এক 'সংঘর্ষে আহত', রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এক 'অজানা লাশ'। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সেই অ্যাম্বুলেন্সে, যার দরজা খোলা ছিল, বাতাস ভারী ছিল বারুদের গন্ধে সেখানে থেমে যায় আমিরের দেহের সমস্ত স্পন্দন। তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন নিঃশব্দে যেমনটি ছিলেন জীবনভর: উচ্চস্বরে নয়, কাজ দিয়ে কথা বলার মানুষ।

কিন্তু মৃত্যুর পর যা ঘটল, তা ছিল হত্যার দ্বিতীয় অধ্যায়। তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিন সেদিন বিকাল থেকে ফোন করছিলেন সংযোগ পাচ্ছিলেন না। রাত ১১টার দিকে স্থানীয় এক যুবক খবর নিয়ে আসে, গলায় হেঁচকি তুলে বলে, "আপার লোকটা নাকি গুলি খাইছে..." সে মুহূর্তে ইয়াসমিন কিছু বুঝে উঠতে পারেননি, বরং তীব্র অস্বস্তি আর আশঙ্কা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ততক্ষণে হাসপাতাল থেকে কেউ যোগাযোগ করেনি, মিডিয়াতে কোনো ফুটেজ নেই, সরকারের মুখে এক ফোঁটা শব্দ নেই। যেন এই মৃত্যু ঘটেনি, এই মানুষ ছিল না। পরে যখন গ্রামের বাড়িতে মরদেহ পৌঁছায়, তখন ছোট ইব্রাহিমের হাতে ছিল এক ভাঙা খেলনা গাড়ি বাবার গাড়ির মতই চার চাকা, মাথা নিচু। পাঁচ বছরের ইয়াসিন চুপচাপ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, সে জানত কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি এই চিরচেনা মানুষটা আর কখনো ফিরে আসবে না।

রাষ্ট্র তখন ব্যস্ত ছিল 'নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক' দেখানোর ভান করতে। কোনো কর্মকর্তা আসেনি, কোনো শহীদ সম্মান ঘোষণা হয়নি। অথচ এই মানুষটা রাস্তায় পড়ে থাকা গুলির খাদে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল কেবল সত্যের পক্ষ নিয়ে। তার মৃত্যু রাষ্ট্র স্বীকার করেনি, তবে ইতিহাস স্বীকার করে ফেলেছে। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের কবরস্থানে যখন তাঁকে মাটির নিচে শোয়ানো হয়, তখন আকাশ ছিল কালো, বাতাস নিস্তব্ধ, চারদিক কেবল নারীর কান্না আর শিশুর ফিসফিসে। তখন কেউ উচ্চারণ করেনি, "এই মানুষটা শহীদ।" তবে তার শোকে নুয়ে থাকা মানুষের মুখে মুখে রটে যায়, "আমির ভাই গুলিতে মরেনি, তিনি ইতিহাসের মুখ রক্ষা করতে গিয়ে পড়ে গেছেন।"

এভাবেই চুপচাপ রাষ্ট্র একটা ভবিষ্যৎ মেরে ফেলে। শুধু গুলি করে নয়, ভুলে গিয়ে, অস্বীকার করে। কিন্তু একদিন কেউ না কেউ সেই গুলির ছবি এঁকে দেবে দেয়ালে, বাচ্চারা তাকে চিনবে নাম ধরে, বইয়ে নয় রক্তের গল্পে। তখন বলা হবে, এই আমির হোসেন গাড়ি চালাতেন না তিনি একটি বিপ্লব চালিয়েছিলেন, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত।

আমির হোসেন আজ গাড়ি চালান না; তিনি আজ জাতির চাকা চালিয়ে দিয়েছেন রক্ত দিয়ে। শহীদ আমির হোসেনের নাম আমরা ভুললে, আমরা শুধু একজন মানুষ নয়–একটি বিপ্লবই হারিয়ে ফেলি।

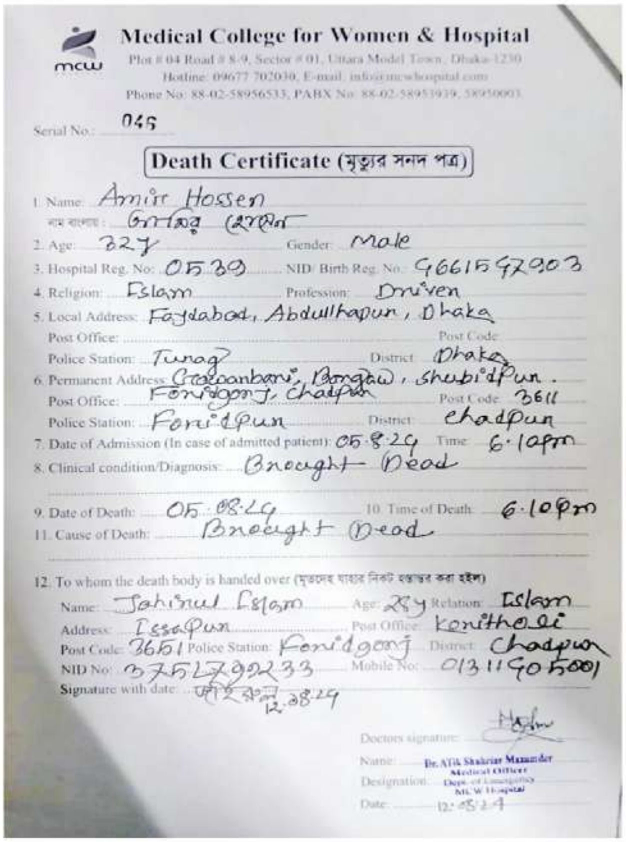

Medical College for Women & Hospital
Plot # 04 Road # 8-9, Sector # 01, Uttara Model Town, Dhaka-1230
Hotline: 09677 702030, E-mail: info@mcwhospital.com
Phone No: 88-02-58956533, PABX No: 88-02-58953939, 58950003

Serial No.: 045

Death Certificate (মৃত্যুর সনদ পত্র)

1. Name: Amir Hossen
নাম বাংলায়: আমির হোসেন
2. Age: 32Y Gender: Male
3. Hospital Reg. No: 0539 NID/ Birth Reg. No: 4661547903
4. Religion: Islam Profession: Driver
5. Local Address: Faydabad, Abdullahpur, Dhaka
Post Office: Post Code:
Police Station: Turag District: Dhaka
6. Permanent Address: Garoanbari, Borgaw, Shubidpur. Foridgonj, Chadpur
Post Office: Post Code: 3611
Police Station: Foridpur District: Chadpur
7. Date of Admission (In case of admitted patient): 05.8.24 Time: 6.10pm
8. Clinical condition/Diagnosis: Brought Dead
9. Date of Death: 05.08.24 10. Time of Death: 6.10pm
11. Cause of Death: Brought Dead
12. To whom the death body is handed over (মৃতদেহ যাহার নিকট হস্তান্তর করা হইল)
Name: Jahirul Islam Age: 28y Relation: Islam
Address: Issapur Post Office: Konitholi
Post Code: 3651 Police Station: Foridgonj District: Chadpur
NID No: 3751792233 Mobile No: 01311405001
Signature with date: জহিরুল 12.08.24

Doctors signature:
Name: Dr. Atik Shahriar Mazumder
Designation: Medical Officer, Dept. of Emergency, MCW Hospital
Date: 12.08.24

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
আমির হোসেন
Name
AMIR HOSSEN
পিতা
খোরশেদ আলম
মাতা
রাহিমা বেগম
Date of Birth 07 May 1992
NID No 466 154 7903

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: আমির হোসেন
জন্ম	: ৭ মে ১৯৯২
পেশা	: প্রাইভেট কার চালক
ঠিকানা	: বরগাঁও, সুবিদপুর, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
পিতা	: খোরশেদ আলম (৫৫ বছর, কৃষিকাজ করেন)
মাতা	: রহিমা বেগম (৫০ বছর, গৃহিণী)
স্ত্রী	: ইয়াসমিন বেগম (৩০ বছর, গৃহিণী)
সন্তান	: ইয়াসিন (৫ বছর), ইব্রাহিম (২.৫ বছর)
ঘটনার বিবরণ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, ঢাকা বিমানবন্দর এলাকায় শহীদ হন পুলিশের গুলিতে আনুমানিক : বিকাল ৪টার দিকে আঘাত পান
আঘাত	: গলার নিচে দুটি গুলি এবং বুকে ছড়াগুলি লাগে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান
দাফন	: নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে
বর্তমান অবস্থা	: পরিবার আর্থিক অনুদানের সহযোগিতায় কোনরকম দিন অতিবাহিত করছে
প্রস্তাবনা	: ১. দুই ছেলের পূর্ণ শিক্ষাব্যয় বহন ও বৃত্তি : ২. স্ত্রীর জন্য হস্তশিল্প বা ছোট উদ্যোগ সহায়তা : ৩. পারিবারিক জমিতে ঘর নির্মাণে সরকারি সহায়তা

নীরব শ্রমিকের গুলিবিদ্ধ মৃত্যুই হয়ে উঠল ফ্যাসিবাদের নির্মম প্রতীক

-শহীদ আলী হোসেন

শহীদ আলী হোসেন

ক্রমিক : ৭৬২

আইডি : ঢাকা সিটি ১২৭

শহীদ পরিচিতি

নাম মোঃ আলী হোসেন। জন্ম ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬ একটা ঝাঁঝালো শরৎকাল, রোদে ভেজা ধানের গন্ধে ভরপুর। সাত ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন তিনি, এক নীরব ছায়া যার হাসি ছিল আলো, কিন্তু জীবনটা ছিল পাহাড় ডিঙোনো ক্লান্তি। পিতা ইদ্রিস চৌকিদার, প্রতিদিন কারো দরজা পাহারা দিয়ে যেতেন ঘরে। মা, মোছাঃ রংমালা একজন নিঃশব্দ সংগ্রামী, রান্নার ধোঁয়ার আড়ালে বুক ভিজিয়ে ফেলা এক নারী। এই ঘরেই বড় হয়ে উঠেছিলেন আলী মাটির ঘ্রাণ, পয়সার হিসেব, আর খাঁটি ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে।

রাজনীতি তাঁর জীবনে কখনোই প্রবেশ করেনি। আন্দোলন তাঁর চায়ের কাপের গল্প ছিল না সেগুলো ছিল টিভির প্যাকেজ নিউজ, যেগুলো দেখা হতো শুধু "কি হইলো আবার রে ভাই" বলে। আলী হোসেন ছিলেন শ্রমিক একজন নিঃশব্দ, অনলস, অস্পষ্ট সৈনিক এই সমাজের। কামরাঙ্গীরচরের আশরাফাবাদের এমারত মিয়ার বাড়ির ছোট্ট এক কোণে, তাঁর সংসার চলতো স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে। ছেলেরা তাঁকে "আব্বু" ডেকে জড়িয়ে ধরত, আর তিনি ঘামমাখা গায়ে বলতেন, "আব্বু একটা ভালো বেতনওয়ালা চাকরি পাইলে তোদের জুতা কিনমু।" কিন্তু জীবন কখনোই তাকে এমন কিছু দেয়নি। শুধু দিয়েছিল রোদ, শ্রম, চুপচাপ বেঁচে থাকা।

তারপরে আসে সেই দিন ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবারের এক রক্তাক্ত সন্ধ্যা। ঢাকার বাতাসে টিয়ার গ্যাসের গন্ধ, রাস্তায় ছেঁড়া স্লোগান, গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে গলি। আলী হোসেন তখন কাজে যাচ্ছিলেন। কোনো মিছিলে ছিলেন না, কারো নেতৃত্বে নয়। তিনি শুধু যাচ্ছিলেন

তার প্রতিদিনের মতোই, সংসারের অন্ন জোগাতে। ঠিক তখনই পুলিশ এসে গুলি চালায়, সামনে-পেছনে না দেখে। গোলির শব্দ থেমে গেলে, দেখা গেল মাটিতে পড়ে আছেন আলী। গায়ে গুলির ছাপ, চোখে অবিশ্বাসের জল। তিনি চলে গেছেন একটা প্রশ্ন রেখে, "আমি কেন?" রাষ্ট্র জানত, তিনি গরিব, তিনি নেতা নন, তিনি শুধু একজন সংখ্যা। তাই গুলিটি ভয় পায়নি তাকে। কিন্তু সেই গুলি শুধু একজন মানুষকে হত্যা করেনি সে ভেঙে দিয়েছে দুই সন্তানের স্বপ্ন, স্ত্রীর নিরাপত্তা, মায়ের বুক। সেই গুলি ধ্বংস করেছে একটি ঘরের রাতের নিঃশ্বাস, চায়ের কাপে ভেসে থাকা শান্তি, ছেলেদের স্কুলে যাওয়ার সাহস।

ইতিহাস জানে আলী হোসেন ছিলেন এই বিপ্লবের নীরব প্রতীক। তাঁর রক্ত এই শহরের পিচে মিশে গেছে, এই দেশের বিবেকের ওপর নেমে এসেছে এক অশ্রুসিক্ত অভিশাপ হয়ে। আলী হোসেন ছিলেন না আগুনের মানুষ, তিনি ছিলেন জলের মতো নরম, সহজ, জীবনদায়ী। আর ঠিক সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন তুলে ধরে "এই রাষ্ট্র কি কেবল বুলেটের ভয় বুঝে, না মানুষের জীবনের মূল্যও বোঝে?"

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের ১ জুলাই সেই দিন যেন বাতাস বদলেছিল। শুরুটা ছিল মৃদু, যেন নদীর মতো ধীর প্রবাহ কিছু ছাত্র দাঁড়িয়েছিল হাতে প্ল্যাকার্ড, কণ্ঠে দাবি, চোখে জেদ। তারা বলেছিল, "কোটা সংস্কার চাই" কিন্তু আসলে তারা চাইছিল আর কিছু: ন্যায্যতা, সমতা, সম্মান। এই আন্দোলন ছিল শুধু কোটা নিয়ে নয়; এটি ছিল একটি প্রজন্মের ন্যায্য বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যেখানে শিক্ষা ছিল বিক্রি করা যায় এমন পণ্য, সেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল বলে, "আমরা ক্রেতা নই, আমরা নাগরিক।"

ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল যেন বাংলার শরীরজুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল। ছাত্রেরা স্লোগান দিচ্ছিল না শুধু, তারা নিজেদের চেতনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। নিউমার্কেট হয়ে উঠেছিল এক অস্থায়ী স্বাধীনতা চত্বর, যেখানে বটগাছের ছায়া পড়ে না, পড়ে কেবল লাঠির ভয়, পুলিশের হুংকার, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া। এই উত্তাল শহরের গর্ভেই ঘনিয়ে উঠছিল এক অশ্রুভেজা সন্ধ্যা, ১৯ জুলাই।

সেই রাতে, আলী হোসেন ছিলেন সেই এলাকাতেই। না, তিনি ছিলেন না কোনো মিছিলের নেতা, ব্যানারের পেছনে তাঁর মুখ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, যিনি দিনশেষে নিজের রক্ত-ঘামে উপার্জিত কড়ি হাতে বাড়ি ফিরছিলেন। হয়তো দাঁড়িয়েছিলেন একটু দেখতে, বুঝতে, বা কেবল কৌতূহলে। কিন্তু বুলেট প্রশ্ন করে না, সে শুধু বেছে নেয়, গরিবের বুককে নিশানা করে। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নিউমার্কেটের নাম্বারগেটের পাশে, একটি গুলি তাঁর ডান বুকে ঢুকে পড়ে নির্বাক, নির্দ্বিধায়। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। ততক্ষণে রক্তের নদী বইছে তাঁর শরীর থেকে। হাসপাতালের আইসিইউও তাঁর হৃদয়কে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। রাত সাড়ে দশটার দিকে, তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কেউ তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে আছে কিছু টাকা, একটা পুরনো ফোন, আর ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন।

এই মৃত্যু ছিলো অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। এটা ছিল এক দীর্ঘ পরিকল্পনার অবধারিত পরিণতি। রাষ্ট্র চেয়েছিল ভয়, ছাত্রেরা দিয়েছিল ত্যাগ। রাষ্ট্র চেয়েছিল নিয়ন্ত্রণ, ছাত্রেরা ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের বীজ। গুলিটা আলী হোসেনকে বিদ্ধ করলেও, সে বিদ্ধ করেছিল আমাদের বিবেক, আমাদের নীরবতা, আমাদের কাপুরুষতা। এই মৃত্যু ছিল রাষ্ট্রের চোখে "সহজ" কারণ সে দরিদ্র, সে অপরিচিত, তার নাম নেই কোনো পার্টির তালিকায়। কিন্তু বিপ্লব ইতিহাসের রক্ত দিয়ে লেখে এবং আলীর নাম সেই পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে।

আজ যারা বলে, "ও তো আন্দোলনের কেউ ছিল না" তারা ভুলে যায়, বিপ্লব শুধু পোস্টারে হয় না। বিপ্লব ঘটে, যখন এক খেটে খাওয়া মানুষ রক্তে ভেসে যায় রাষ্ট্রের নির্বিকার নিষ্ঠুরতায়। আলী হোসেন সেই বিপ্লবের এক নীরব সাক্ষ্য, এক অনিচ্ছাকৃত শহীদ, যাঁর মৃত্যু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় এই রাষ্ট্রে জীবনের মূল্য নেই, যদি না তুমি ক্ষমতার প্রিয়পাত্র হও।

এই আন্দোলন ছিল ছাত্রদের মুখে স্লোগান নয়, গরিবের কণ্ঠে চাপা কান্না, নিপীড়নের দীর্ঘশ্বাস, আর সহস্র নিঃস্ব জনতার অদৃশ্য পতাকা। আর সেই পতাকায় লেখা আছে "আলী হোসেন, আমরা ভুলিনি।"

যেভাবে শহীদ হন: এক অস্বীকৃত মৃত্যুর অনন্ত প্রহর

"কখনো কখনো রাষ্ট্র লাশকেও ভয় পায় কারণ মৃতেরা কথা বলে, জীবিতদের চেয়ে স্পষ্ট।"

সেই সন্ধ্যায়, নিউমার্কেটের নাম্বারগেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আলী হোসেন না কোনো স্লোগানে মুখর, না কোনো ব্যানারে বাঁধা। জীবন তাকে টেনেছিল শ্রমের পথে, কিন্তু মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছিল অন্য গলিতে। সন্ধ্যা ছয়টা, গুলির গর্জনে কেঁপে উঠছিল শহর। আর ঠিক তখনই, এক বুলেট এসে থেমেছিল তাঁর ডান বুকে এক নিঃশব্দ পতাকা উড়েছিল হাওয়া ছাড়াই।

তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে, আইসিইউতে, এক নিঃশ্বাস আরেক নিঃশ্বাসকে ডেকে আনতে পারেনি। হৃদপিণ্ডের শব্দ থেমে গিয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের

বিবেক ততক্ষণেও চুপ। রাত সাড়ে দশটায় ঘোষণা আসে আলী হোসেন আর নেই। আর সেই ঘোষণায় কোনো বাঁশি বাজে না, কোনো প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি আসে না, আসে না রাষ্ট্রীয় পতাকায় মোড়ানো শেষ বিদায়ের আয়োজন। তিনদিন, হ্যাঁ, পুরো তিনদিন লাশ আটকে রাখে হাসপাতাল। একটি মৃতদেহ, যার শরীরে রাষ্ট্রের রক্তলিপি লেখা, তাকেও ফিরিয়ে দিতে হয় কাগজপত্র আর নির্লজ্জ অনুমতির পরে। যেন গুলির পরেও তাদের দখল শেষ হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র

নাম
মোঃ আলী
Name
MD. ALI
পিতা
ইদ্রিস চকিদার
মাতা
মোসাঃ রং মালা
Date of Birth 15 Oct 1986
NID No 235 118 0860

পরিবার ততদিনে ভেঙে পড়েছে। ভাইয়ের চোখে লাল রক্তজল, স্ত্রীর মুখে স্তব্ধ আহাজারি, দুই ছেলের চোখে বোঝার অসম্পূর্ণতা। তাঁর ভাই বলেছিলেন, “আমরা যা দেখেছি, তা কোনো সিনেমা না এটা রক্তমাখা বাস্তবতা। গুলির শব্দে চারদিক কাঁপছিল, আর আমরা যেন সময়ের কাছে হেরে যাচ্ছিলাম। কেউ সাহায্য করেনি, শুধু চেয়ে ছিল।”

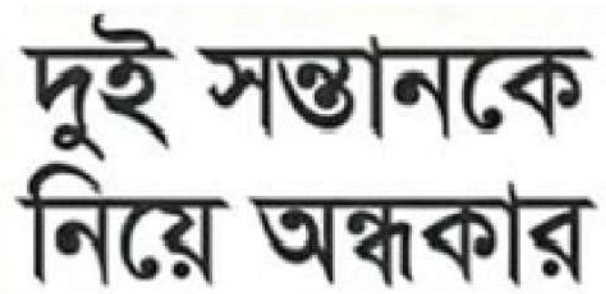
দুই সন্তানকে নিয়ে অন্ধকার দেখছেন রত্না

গুলিতে আলী হোসেনের মৃত্যু

ফাহিমা আক্তার সুমি: আলী হোসেন। জীবিকার জন্য কাজ করতেন একটি দোকানের কর্মচারী হিসেবে। ১৯শে জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন। গুলিটি বুকের ডান পাশে বিদ্ধ হয়। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ'তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওইদিন রাত সাড়ে দশটার দিকে মারা যান। সাত ভাইবোনের পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয় চুপচাপ, যেন একটি জীবনের শেষরেখা নয়, বরং মুছে দেওয়া কোনো অধ্যায়। রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। ছিল না একটি কালো ব্যাজ, একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি নীরব শ্রদ্ধার সুর। ছিল কেবল অল্প কিছু মানুষ, অল্প কিছু চোখ, আর পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী নীরবতা। তিনি রেখে গেছেন এক স্ত্রী যিনি প্রতিদিন বালিশে মুখ লুকিয়ে বোঝেন, এখন আর কেউ রাতে দরজা খুলে বলে না, “ঘুমাও, আমি এলাম।” রেখে গেছেন দুই ছেলে যাদের জীবনের প্রথম পাঠ হয়তো এই, যে গরিবদের বাবারা রাষ্ট্রে মরলেও "শহীদ" হয় না।

তিনি মাসে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা উপার্জন করতেন না, কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না, কোনো ছুটি ছিল না। তবু তিনি ছিলেন আলো। আজ সেই আলো নিভে গেছে। রয়েছে কেবল একটি ঘর অন্ধকার, নিঃশব্দ। কিছু শুকনো খাবারের প্যাকেট আর সময়, যা আর চলে না, কেবল থেমে থাকে।

আলী নামটা পোস্টারে নেই, ব্যানারে নেই, কিন্তু ইতিহাসের প্রতিটি খাঁজে তাঁর রক্ত গড়িয়ে আছে। তিনি শুধু মারা যাননি। আমাদের বিবেককেও তার সাথে কবর দিয়ে গেছেন।

প্রস্তাবনা

১) এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান

২) স্ত্রীর জন্য একটি স্বনির্ভর আয়ের ব্যবস্থা (সেলাই মেশিন দেওয়া যেতে পারে)

৩) দুই ছেলের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: আলী
জন্ম	: ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬
পেশা	: দোকানের কর্মচারী
পিতা	: ইদ্রিস চকিদার
মাতা	: মোসা: রং মালা
বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা	: এমারত মিয়ার বাড়ি, আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
পরিবার	: স্ত্রী রত্না (গৃহিণী), দুই পুত্র রাতুল(১৫) ও সায়েম(৭) হিফজখানায় পড়ছিল। : আর্থিক সংকুলানে রাতুলের পড়ালেখা বর্তমানে অনিশ্চিত। আলী সাত ভাই বোনের মধ্যে : সবার ছোট ছিলেন; (রহিমা(৬৫), শামসুন্নাহার(৬২), ইয়াসিন(৬০), : আলি আরশাদ(৫৭), আলি আকবর(৪৮) ও ময়না(৩৫)। : পারিবারিক অবস্থা অতি নাজুক।
ঘটনার বিবরণ	: ১৯ জুলাই ২০২৪ রাজধানীর নিউমার্কেট এক নাম্বারগেট এলাকায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে : বুকের ডান পাশে গুলিবিদ্ধ হন
মৃত্যু ও দাফন	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় : রাত ১০:৩০ মিনিটে মারা যান
মৃত্যুর তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে লাশ বের করা হয়, : ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়

সংবাদ

'মাইরা তো আমরা ফেলছি এখন কী করবা?'

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ২৪ জুলাই ২০২৪, ০৪:৫৯ পিএম

234 Shares

ভিডিওটি গত ১৭/১৮ই জুলাই ২০২৪, মিরপুর ১২ নম্বর সেকশন এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ধারণ করা। এতে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে বলতে দেখা যাচ্ছে- 'মাইরা তো আমরা ফেলছি এখন কী করবা?'

وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا،
ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার
শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

(সহীহ বুখারী)

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

একাদশ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী